পাহাড়ের কোলে দুটি রাস্তা। একটি রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে চীল গাছগুলোর ভেতর দিয়ে গেছে, অপরটি এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের পাদদেশে মাঠের ধারে ধারে। মাঠে ধানের ক্ষেত, ক্ষেতের ধারে ধারে গরু-ছাগল চরছে। রাস্তার ওপর তরনারি আর নীলধারীর ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে। রাস্তা দুটোর মাঝখানে পাহাড়, কিন্তু খুব একটা উঁচু নয়। তাই ওপরের রাস্তা থেকে নিচের রাস্তাটা পরিষ্কার চোখে পড়ে।

ওপরের রাস্তা ধরে হাঁটছে এক যুবক, নিচের রাস্তায় হাঁটছে এক তরুণী। দুটি রাস্তাতেই সামনে-পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত আর কেউ নেই।

যুবকটি কিছুক্ষণের জন্যে থামল। একটা বেয়াড়ের গাছে ঠেস দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, খাকী রঙের থলেটাকে ঠিক্‌ঠাক করে নিল, তারপর গলা বাড়িয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকাল। মেয়েটি না থেমে এক নাগাড়ে হেঁটেই চলেছে। আবদুল মৃদু হাসল। ওরা সাত ক্রোশ পথ হেঁটে আসছে এইভাবেই। যদিও ওদের পথ আলাদা আলাদা, মধ্যে পাহাড়ের ব্যবধান, একজন আর একজনকে চেনেও না, তবু আবদুলের মনে হলো, ওরা যেন দু'জন সহযাত্রী, সহযাত্রীদের পরস্পরের প্রতি যে রকম সহানুভূতি থাকা উচিত, ওদের দু'জনের মধ্যেও তেমনি সহানুভূতির সম্পর্ক।

কিন্তু মেয়েটি সম্ভবত একা-একা পথ চলতেই অভ্যস্ত, তাই এ রকম একটা সম্পর্কের মধ্যে যে-মাধুর্য আছে, সৌন্দর্য আছে, সেটা সে আদৌ বোঝে না। কথাটা ভাবতেই আবদুলের চওড়া কপাল কুঁচকে গেলো, চোয়াল দুটো বাইরে বেরিয়ে এল যেন, তারপর খানিকটা চিন্তিতভাবে কয়েকদিনের না-কামানো চিবুকের দাড়ি চুলকাতে লাগল। মুখে ম্লান হাসি। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার মেয়েটির দিকে তাকাল, ইতিমধ্যেই সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। গোরাহু গ্রামে এসেই আবদুল মেয়েটিকে প্রথম দেখতে পায়। নিচের রাস্তায় একটি বাড়ির সামনে এক মহিলা তাকে বিদায় জানাচ্ছিল। মেয়েটির রূপলাবণ্য দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বলতে

কি, রাস্তা দুটির মধ্যে ব্যবধানও কম নয়, তাছাড়া মাঝখানে উঁচু পাহাড়, আর পাহাড়ী অঞ্চল সাধারণত এবড়ো-খেবড়ো হয়েই থাকে, পথ দুটি এঁকে-বেঁকে কখনও বেশ কাছাকাছি চলে আসে, আবার কয়েক গজ গিয়েই পরস্পরের দূরত্ব বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে রাস্তা দুটি যখন কাছাকাছি হয়, তখন মাত্র কয়েক গজের তফাৎ, আবার কখনও দুটি রাস্তার মধ্যে হাজার গজের ব্যবধান —পাহাড়ী রাস্তার সঙ্গে যাদের জীবনের সম্পর্ক রয়েছে, জীবনের এমন ধারা গতি-প্রকৃতি তাদের অজানা নয়। এ সব রাস্তা দূর থেকে আসতে আসতে কাছাকাছি হয়, কাছাকাছি হয়ে পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে যায়, মিলেমিশে গিয়ে আবার এক সময় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবদুল ভাবে, জীবনটা সোজা সড়ক নয়, পাহাড়ী রাস্তা। গোরাহ্‌ গ্রামের কাছে আবদুলের পথটা মাঠ-সংলগ্ন ঐ পথটার এত কাছে চলে গিয়েছিল যে খুব কাছে থেকেই সে মেয়েটির অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখতে পেয়েছিল, আর তাই দেখে থতমতো খেয়ে সেখানেই থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। এখন তার যে-বয়স, সে-বয়সে যে-কোনো যুবতী মেয়েকেই সুন্দর বলে মনে হওয়ার কথা। যে পাহাড়ের ধারে তার বাড়ি, সে নকার প্রাকৃতিক শোভা . পৃথিবীতে বিখ্যাত, তবু মেয়েটির এমন রূপ-রঙ, এমন পারিপাট্য, এমন আক ক্ষমতা খুব কমই তার চোখে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, পা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, পথ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, আর আকাশে ভাসমান মেঘ যেন হঠাৎ স্থির অকম্প্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেন না, যখন সৌন্দর্য সামনে এসে প্রতিভাত হয়, তখন জীবন ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়, নত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়, তারপর আবার সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। আবদুলও সামনে পা বাড়িয়েছিল, একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চেয়েছিল। দেখেছিল, মহিল. তরুণীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, তার চোখে চক্‌চক করছে জল, আর তরুণী মুখখানি সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মতো দীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

তারপর আবদুল লক্ষ্য করেছিল, সে যে-দিকে হাঁটছে, মেয়েটিও নিচের রাস্তা ধরে সে-দিকেই হেঁটে আসছে। তবে বলতে কি, রাস্তা দুটি ক্রমশ দূরে সরে যাবে। পূবদিকে যেতে যেতে তার রাস্তাটা বেঁকে যাবে উত্তরে, মেয়েটির রাস্তা যাবে দক্ষিণে, কিন্তু সেটা তো ক্রোশ দশেক পরের কথা। আপাতত দশ ক্রোশ ওরা একসঙ্গে হাঁটবে। আলাদা আলাদাই হাঁটবে, কিন্তু একসঙ্গে। সামনে-পে অনেক দূর পর্যন্ত অন্য কোনো যাত্রী নেই, তাই দেখে আবদুল মনে মনে এ আশ্চর্য রোমাঞ্চ অনুভব করল। ভাবতে লাগল, এমন মধুর মনোরম তন্দ্রাচ্ছ মাঠে ওরা দু'জন একা, যেন প্রকৃতি ওদের দু'জনের জন্যেই এই পাহাড়ী অঞ্চলট তৈরী করেছে, ওদের দু'জনের ছাড়া আর কারোর যেন এখানে আসার অধিকা নেই। নিচের রাস্তাটা যেতে যেতে মাঝে মাঝে গ্রাম ছুঁয়ে যায় —ঘরবাড়ি, গরু মোষ-ছাগল-ভেড়ার পাল, পশুচারণের মাঠ, ক্ষেতে-খামারে কাজ করা চাষী আর

তাদের বাড়ির মেয়েরা —মেয়েটি কোথাও বা একটু দাঁড়ায়, কয়েক মুহূর্ত, হেসে হেসে কারোর কারোর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে, কিন্তু সে-সব লোক তো তাদের মতো রাস্তার মুসাফির নয়। তারা নিজেদের গ্রামে, নিজেদের বাড়িতে ক্ষেতে খামারে কাজ করা লোক, নিজ বাসভূমে রয়েছে তারা, মুসাফির নয় যে গন্তব্য-স্থানের সন্ধানে তাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে। আবদুলের প্রতি তাদের কোনো ঈর্ষার মনোভাব থাকার কথা নয়, সে-কথা ঠিক, তবে এইসব গ্রাম থেকে কেউ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুক, আর মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকুক, অন্তত আবদুল সেটা চায় না। সেটা তার পছন্দও নয়। মেয়েটির পথে কোনো গ্রাম এসে পড়লেই আবদুলের বুক টিপ্‌টিপ্ করে ওঠে, তারপর গ্রামটা পেছনে ফেলে রেখে মেয়েটি যখন আবার রাস্তায় একা-একা হাঁটতে থাকে, তখন সে মনে মনে খুশী হয়। গোরাহু থেকে তারা এ যাবৎ সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে, এবং এখনও তারা একা-একা নিজের নিজের পথে সামনে এগিয়ে চলেছে। তাতে আবদুল ভারি খুশী। শুধু মনের কোণে একটুখানি দুঃখ, এ যাবৎ মেয়েটির সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা হয়নি। কথাটা ভাবতেই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে সে। অবশ্য শহুরে ছেলে-ছোকরাদের মতো তার মনে কোনো দুরভিসন্ধি নেই। সে ছেলেবেলা থেকে গ্রামেই মানুষ, সেখানে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা বলে, কিন্তু কে জানে কেন, ঐ মেয়েটির সঙ্গে সে আলাপ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলেনি। সে জন্যে তার মনে বড় দুঃখ। প্রথম তিন-চার ক্রোশ বেশ অসুবিধে ছিল, কারণ গোরাহু থেকে সামান্য একটু এসেই, এত কাছাকাছি থাকা রাস্তা দুটো হঠাৎ দূরে সরে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ব্যবধান এতটা দাঁড়ায় যে, আবদুল প্রায় পাহাড়ের চুড়োর কাছে গিয়ে পৌঁছায়। অতদূর থেকে কি আর কথা হয়, তবে হ্যাঁ, বড় জোর চিৎকার করে এক-জন আর একজনের নাম জিজ্ঞেস করতে পারে। আবদুলও তাই করেছিল। জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওহু ঘেলে ঘেলে জুল্‌নে আলিয়ে খওয়াঁ জুলী (ও পথে পথে হেঁটে-যাওয়া মেয়ে, তুই কোথায় যাচ্ছিস) ?'

আবদুলের গলার আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে, প্রথমে কাছের পাহাড়গুলিতে, ক্রমশ আরও দূরের পাহাড়গুলিতে সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার তার কাছে ফিরে আসে। পাহাড়গুলো তাদের বিস্তৃত বুকের গমগমে আওয়াজ তুলে বারবার জিজ্ঞেস করে, 'ওহু ঘেলে ঘেলে জুল্‌নে আলিয়ে খওয়াঁ জুলী ?'

নিচে পাহাড়ী রাস্তাটায় হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি চমকে ওঠে। আওয়াজ শুনে সে চারদিকে তাকায়, কারণ চারদিক থেকেই প্রতিধ্বনি উঠছিল, যেন এই ছোট পাহাড়টি এবং তার দেবতা স্বয়ং মেয়েটিকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তারপর হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়ে পাহাড়ের চুড়োর দিকে, সেখানে সাদা সাদা

মেঘের নিচে এক দীর্ঘকায় যুবক দাঁড়িয়ে। আবদুল আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় মেয়েটিকে। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। কোথাকার এক অজানা অচেনা লোক, কে জানে কি রকম? খামোখা সে তার কথার জবাব দিতে যাবে কেন? এতক্ষণ সে তার নিজের পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। এ-বার তার পা দ্রুত হয়, তাই দেখে আবদুলও দ্রুত পা চালায়।

মেয়েটির জবাব না পেয়ে আবদুল চুপ করে যায়। তাকে অনেক দূর যেতে হবে, এত উঁচু থেকে বেকার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা খারাপ করার কোনো মানে হয় না। চুপচাপ সে হাঁটতে থাকে। সামনে ক্রোশ খানেক গিয়েই তার রাস্তাটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করে, অর্থাৎ রাস্তাটা এখন মেয়েটির রাস্তার কাছাকাছি হতে চলেছে। আবদুল ও রাস্তার এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে, সে মেয়েটির মুখের ওপর ঝুলে-পড়া চুলের গোছা দেখতে পায়। তার পরনের লাল সালোয়ার-কামিজের ওপর সাদা সাদা ফুলগুলো গুনতে পারে। তার বুকের চড়াই-উৎরাইয়ের ধমকানি উপলব্ধি করতে পারে। মেয়েটি জানে, এখন আবদুল তার খুব কাছেই ওপরের রাস্তায় হাঁটছে, তবু সে তার দিকে ফিরে তাকায় না। কেন তাকাতে যাবে ওর দিকে? অজানা অচেনা লোকের দিকে চেয়ে দেখারই বা কি আছে? কথা বলতে যাওয়ারই বা কি দরকার? মেয়েটি আরও জোরে হাঁটতে শুরু করে। আবদুল মৃদু হাসে, পায়ে একটা হাল্‌কা ঠোক্কর দিয়ে একটা ছোট মতো পাথর নিচে গড়িয়ে দেয়। পাথরটা ঘাসের ওপর গড়িয়ে গিয়ে চীল গাছের গোড়ায় গিয়ে লাগে, সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে নিচের রাস্তায় পড়ে ঠিক মেয়েটির সামনে। মেয়েটি থমকে দাঁড়ায়। ক্ষুব্ধ চোখে আবদুলের দিকে তাকায়। আবদুল হাসে। মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবদুল আর একটা পাথর গড়িয়ে দেয়। মেয়েটি লাফ মেরে এগিয়ে যায় একটু, তারপর দৌড়তে শুরু করে। আবদুল হাসতে থাকে। লাল সালোয়ার, লাল কামিজ, গোলাপের মতো মুখখানি। সে মুখে মুখে গান বেঁধে গাইতে শুরু করে—

সুহা ফুল গুলাব দা জুল্‌দা ঘেলে-ঘেলে,
রুসয়া-রুসয়া টুরদা জুল্‌দা ভেলে-ভেলে।
(পায়ে-হাঁটা পথ ধরে কে যায়, কে যায় রাঙা গোলাপ,
মুখখানি ভার-ভার দ্রুতপায়, দ্রুতপায় চলে চুপচাপ।)

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায় আবদুলের দিকে, রেগে গিয়ে একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে মারে তাকে। অমনি আবদুল একটা ঝোপে নিজেকে আড়াল করে। পাথরটা এসে একটা চীল গাছে ঠোক্কর খেয়ে আবার নিচে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে আবদুল, হা-হা করে হাসতে হাসতে গাইতে থাকে—

পথর মার কে চন্না রুস্ জানা—
(পাথর ছুঁড়ে আমার চাঁদের রাগ দেখো—)

তার গলার আওয়াজ ক্রমশ দূরে চলে যায়, কারণ তার রাস্তাটা আবার ওপরের দিকে চলেছে। আবদুল ভাবে, কি হাবাগোবা মেয়ে রে বাবা, না জানে গান গাইতে, না পারে কথা বলতে! পথ-চলার সময় মানুষ যদি কথা বলতে বলতে কিংবা সঙ্গীর গানের জবাব দিতে দিতে হাঁটে, তাহলে কি চমৎকার সময় কেটে যায়! হয়ত মেয়েটি এই প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যাচ্ছে, হয়ত দেমাকটাও কম নেই, অবশ্য দেমাকের কারণটা যে কি, তা তো দেখেই বোঝা যায়—আবদুল মনে মনে ভাবে। কিন্তু তাই বা কেন? সাত ক্রোশ পথ ওরা আগে-পিছে একসঙ্গে হেঁটে আসছে, অথচ ওর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরলো না, হাজার হলেও আমরা মানুষ, জন্তু-জানোয়ার তো আর নই! আবদুল নিজের থলেটাকে ঠিক্‌ঠাক করে নিয়ে দূরে চোখ মেলতেই দেখল, মেয়েটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটু, তাড়াতাড়ি আবার পথ ধরল।

সামনের ক্রোশ দুয়েক পথ আবদুল আর কোনো চেষ্টা করল না। চুপচাপ রাস্তা ধরে হেঁটে চলল। পথটা কয়েকবার নিচে নামল, কয়েকবার ওপরে উঠল। তারপর এক সময় আবার নিচে নেমে এল তার রাস্তাটা, কিন্তু সে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। একবার তো এমন হলো যে দুটি রাস্তার মধ্যে দূরত্ব মাত্র কয়েক গজ, তবুও আবদুল মেয়েটিকে দেখার কিংবা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল না। চুপচাপ নিজের রাস্তায় চলতে থাকল। আরও দু'ক্রোশ হাঁটল, এখন আর বাকী এক ক্রোশ। এই এক ক্রোশ পথ শেষ হলেই একসঙ্গে চলা পথ দুটি পরস্পরের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একটি যাবে উত্তরে, অপরটি দক্ষিণে। আবদুলের মনে এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা দেখা দিলো। তার মনে হলো, বছরের পর বছর ধরে পরিচিত এক সহযাত্রীর কাছ থেকে সে যেন দূরে চলে যাচ্ছে। তার বুক জোরে জোরে টিপ্‌টিপ করছিল যতই এগিয়ে আসছিল সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি, যেখানে দু'জনের রাস্তা দু'দিকে বেঁকে যাবে, ততই তার পায়ের জোর যেন কমে আসছিল।

পথ চলায় মেয়েটিরও আর সে তেজ নেই। খানিকটা পেছন থেকেই সে আবদুলকে আড়চোখে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে; ওকে বড় নিস্পৃহ বড় চুপচাপ দেখে সে মনে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খায়, যেন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ এসে তাকে হঠাৎ স্পর্শ করে, আর সেই উষ্ণ স্পর্শে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ শিহরিত হয়, শরীরের প্রতিটি রোম সচেতন হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় রক্তে ঝড় বইতে থাকে। ঢিমে-তালে চলতে চলতে তার সমস্ত উন্মত্ত উচ্ছ্বাস গভীর ক্লান্তি ও অবসন্নতায় ডুবে যায়। সে এই প্রথম এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে আবদুলের দিকে তাকায়।

আবদুল দাঁড়ায়।

মেয়েটিও দাঁড়িয়ে পড়ে।

দু'জন পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর মেয়েটির ঘন চক্ষুপল্লব তার গণ্ডদেশে নেমে আসে, ঠিক যেন নির্মল স্বচ্ছ সরোবরে মেঘের ছায়া পড়ে। হকচকিয়ে গিয়ে আবদুল চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর উত্তর দিকে মুখ করে হাঁটতে শুরু করে।

মেয়েটি সেখানেই একটি পাথরের ওপর বসে পড়ে।

আবদুলের রাস্তা চলেছে উত্তর দিকে। সেই উত্তর দিকে, যে দিকে আখরোটের গাছে গাছে মৌচাক ঝুলছে, ঝোপঝাড়ে লাল ফুল টক্‌টক করছে—সেই উত্তর দিকে, যে-দিকে বেয়াড়ের বিশাল গাছগুলো সান্ত্রীর মতো দিগন্ত পাহারা দিচ্ছে, আকাশে মেঘেরা বড় বড় দুর্গ তৈরী করছে—সেই উত্তর দিকে, যে-দিকে বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঝড়ের মতো ঝাপ্‌টা মেরে বেড়াচ্ছে। কাগানের ধারে ঐ যে চিনারের গাছটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজ থেকে কয়েক শো বছর আগে ওখানেই জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিল—

আবদুলের রাস্তা চলেছে উত্তর দিকে, সে দিকেই তার বাড়ি।

মেয়েটি একই জায়গায় সেই পাথরটাতেই বসে রয়েছে।

আবদুল উত্তর দিকে হাঁটছে, তার গলায় যেন একগাছি দড়ি বাঁধা রয়েছে, সেটা তাকে পেছন থেকে টেনে ধরছে। তার দুটি পায়েই যেন এক-একখণ্ড ভারি পাথর বাঁধা রয়েছে, আর মাটিতে রয়েছে চুম্বক, তাকে কিছুতেই এগোতে দিচ্ছে না, তবু আবদুল পাহাড়ে চড়ছে।

মেয়েটি অনেকক্ষণ পাথরটায় চুপচাপ বসে রইল, আবদুল ঘন গাছপালার আড়ালে চলে যেতেই সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, মন্থর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আর প্রায় ক্রোশ দুয়েক পথ হাঁটলেই সে তার আব্বার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। রঙ্গড়ের জঙ্গলে তার আব্বা কাঠ চেরাইয়ের কাজ করে। কত আনন্দ নিয়ে সে গোরাহু থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। মা তার স্বামীর জন্যে মেয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে গুড়, চা, নুন, সোডা আর একখানি নতুন জামা। জামাটা পরে আব্বা কত-না খুশী হবে! মেয়েটি তার চাদরের খুঁটে বাঁধা জিনিসগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করল। মৃদু হাসি দেখা দিলো ঠোঁটে, কিন্তু হাসিটা ভালো করে ফুটল না। তখনও তার মুখখানিতে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা ও ব্যথা অবশিষ্ট ছিল বলে হাসিটা তেমন আর উদ্ভাসিত হলো না। যুবকটিকে তার নিজের পথে চলে যেতে দেখে কেন সে এত মনমরা হয়ে পড়ছে, তার কারণ সঠিক বুঝতেও পারছিল না। সে যেমন তার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, তেমনি হয়ত যুবকটিও বাড়ি ফিরছে, তাতে তার এত মনমরা হয়ে পড়ার কারণ কি? কেন তার মনে হচ্ছে যে, তার সারা শরীরের প্রতি রোমকূপে ঘূর্ণিজল পাক খাচ্ছে? এ কি রকম ঘূর্ণাবর্ত, যেন তার শরীর ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে পড়ছে, হাত-পা এমন শিথিল হয়ে আসছে যে তার পক্ষে পথ চলাই দুষ্কর! যখন সে ছোট ছিল, তখন তো কখনও এমন হতো না ···আর এখন

…এখন সে নয় বছর কি …ছেলেটি তার পেছনে পেছন এল না কেন? মনে হচ্ছে যেন তার জীবনে, তার দেহে, তার আত্মার গভীরে কোথায় যেন কে একজন নেই!

আচমকা মেয়েটি পেছন ফিরে দেখল, দূরে আবদুল আসছে, সে যে-পথে হাঁটছে সেই পথেই, নিজের পথ ছেড়ে তার পথ ধরেই এগিয়ে আসছে। মেয়েটির বুক ধক্‌ধক করে উঠল। মনের মধ্যে ঘুমন্ত ভয় জেগে উঠল, ভয় এবং সেই সঙ্গে আনন্দও। আশার অজস্র মুকুল, আকাঙ্ক্ষার হাজার হাজার ফুল যেন হেসে উঠল। শ্যামল সবুজ পুষ্পবীথিকা কি তার মনের কোণেই লুকিয়ে ছিল? মেয়েটি বিস্ময়ে হতবাক, হঠাৎ তার মনে এক অজানা আশঙ্কা সাপের মতো ফণা তুলে নাচতে শুরু করল, সে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু আবদুল পেছনে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছিল। ইচ্ছে করলে সে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলতে পারত, কিন্তু সে গেলো না। যদিও তার পা দুটি সামনের দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যেতে চাইছে তাকে, তবু সে নিজেকে সংযত রেখে তার ও মেয়েটির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান বজায় রেখে হাঁটছিল। মেয়েটি তাকে উত্তর থেকে দক্ষিণে টেনে নিয়ে এসেছে—এখন তার কাছে বাড়ি ফেরাটা অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে, একেবারে অর্থহীন। যেন কেউ তার দিনের সূর্য ও রাতের তারা কেড়ে নিয়েছে। সে এই রকমই একটা কিছু অনুভব করছিল, তাই উত্তর থেকে দক্ষিণে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। সে দেখতে চায়, কোথায় গিয়ে তার এ যাত্রা শেষ হয়, ক্লান্ত পা দু'খানি কোথায় নিয়ে যেতে চায় তাকে, ঐ টুক্‌টুকে ফুল কোন বাগানে শোভা পায়!

আবদুল পেছনে পেছনে আসছে। মেয়েটি এগিয়ে চলেছে সামনে, কারণ পথটি তার চেনা। কিন্তু এটা কি সেই পরিচিত পথ? কোনো নতুন পথ নয় কি? মেয়েটির চোখে সব কিছুই নতুন মনে হচ্ছে, পথের দু'পাশে জংলাফুলগুলো এমন আশ্চর্য হয়ে তাকে কখনও চেয়ে দেখেনি। গাছের ডালপালাগুলো সস্নেহে তার মাথার ওপর এসে পড়ে, সুগন্ধী হাওয়ায় মিষ্টি-মধুর ফিস্‌ফিস আওয়াজ। ছোট ছোট নীল পাথর তার পায়ের তলায় এসে সুড়সুড়ি দিয়ে আবার সরে যায়—চঞ্চল পাথর! হঠাৎ তার নাচতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রেখে এগিয়ে যায় সে।

এখান থেকে রঙ্গড়ের জঙ্গল শুরু হয়েছে। এই জঙ্গলে তার আব্বা কাজ করে। এখানে এসে পথটা মাঠের কিনারা ছেড়ে ওপরে উঠেছে। রাস্তার এখানে ওখানে গাছ পড়ে রয়েছে, কাটা-গাছের লাললাল গোড়াগুলো চোখে পড়ে। কোথাও ছাল-ছাড়ানো গাছের গুঁড়ি, কোথাও বড় বড় কাঠের কুঁদো, কোথাও বা কড়ি-বরগার মতো চেরাই করা কাঠ। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে আবদুলকে দেখল, তারপরই সে পাহাড়ে উঠে গেলো। আবদুল নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে

রইল। মেয়েটি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলে সে নিজের জায়গা থেকে নড়ল। ওপরে চড়তে চড়তে মেয়েটি পাহাড়ের চূড়োর ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো, অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে একটা কষ্ট বোধ করল আবদুল, আর তারপরই মেয়েটি যে-দিকে গেছে সে-দিকে অগ্রসর হলো সে। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা উচিত।

পাহাড়ের ওপরে উঠে সে মেয়েটিকে কোথাও দেখতে পেল না। সামনেই ঘন জঙ্গলের মাঝখানে অনেক গাছ কেটে জায়গা সাফ করা হয়েছে। সেখানে মেটে রঙের চৌপল কাট পুঁতে একটা কুঁড়েঘর তৈরী করা হয়েছে। চারজন লোক একটা বড় করাত দিয়ে চীল গাছের গুঁড়ি চেরাই করছে। তাদের সামনে পুব-দিকে একটা ঢাল। সেই ঢালে চেরাই কাঠ একটার নিচে আর একটা দিয়ে কাঠের রাস্তা বানানো হয়েছে। রাস্তাটা তেরছা হয়ে পাহাড়ের আর একদিকে ঘুরে গিয়ে নিচে নদীতে নেমেছে। কাগানের নদী। তার স্বচ্ছ নির্মল নীল জল দেখে আকাশও লজ্জা বোধ করে।

কিন্তু মেয়েটিকে কোথাও চোখে পড়ল না।

আবদুল সামনে এগোলো। লোকগুলো করাত চালানো বন্ধ করে তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সে বাঁ পা দিয়ে ডান পা-টা চুলকে নিল একটু, তারপর মৃদু হেসে সামনে এগিয়ে গেলো।

একটা বেঁটে চেহারার গাট্টাগোট্টা লোক, বুকে লাললাল চুল, টাক মাথা, চোখ দুটো ঘন নীল, সে দু'পা এগিয়ে এল। কোমরে হাত দু'খানি রেখে আবদুলকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। জিজ্ঞেস করল, 'শহর থেকে আসা হচ্ছে বুঝি?'

আবদুল মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

'জ্ঞানচন্দ শাহ্ ঠিকেদার পাঠিয়েছে?'

আবদুল মাথা নেড়ে 'না' জানাল।

মোটা-তাজা-বেঁটে লোকটা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এ দিকের জঙ্গলে এসেছ কি করতে? জংলী ভালুকের মতো মৌচাক ভাঙতে না-কি?'

কথাটা বলেই লোকটা হাসল, সেই সঙ্গে তার তিন সঙ্গীও হেসে ফেলল। ওদের একজন খুব ঢ্যাঙা, মাথায় খয়েরী রঙের গোল টুপি। একজন লিক্‌লিকে পাতলা, হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, পরনে খাকী রঙের প্যাণ্ট আর গায়ে ছেঁড়া জামা। বাকী লোকটিকে দেখে মনে হয় গুজরাটী, শ্যামবর্ণ চেহারা, বড় বড় দাঁত, দাঁতের মাড়ির রঙ হাল্‌কা সবুজ। ঐ লোকটাই সব চেয়ে জোরে হাসছিল।

ওদের হাসি দেখে আবদুলও হেসে ফেলল। বলল যে, সে রাস্তা ভুল করেছে। আসলে কাগান যাচ্ছিল, রাস্তা ভুল করে এসে পড়েছে এ দিকে।

মজবুত গড়নের বেঁটে লোকটা আবার সশব্দে হেসে উঠল। বেশ চড়া গলায় বলল, 'বাগান তো ওদিকে!' ডান হাত দিয়ে উত্তর দিক দেখাল সে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'আর তুমি চলে এলে এ দিকে?'

'হ্যাঁ, এই ভুলই হয়েছে। চার বছর পরে শহর থেকে ফিরছি তো, তাই ভুল করে ফেলেছি রাস্তাটা।'

'তাহলে আজ এখানেই থেকে যাও। আজ আর ফিরে যেতে পারবে না। দুপুর গড়িয়ে গেছে, ফিরতে ফিরতে তোমার বেশ রাত হয়ে যাবে। চেষ্টা করলে বড় জোর সরকারী জঙ্গল পর্যন্ত পৌছাতে পারো। আর রাত-বিরেতে কোনো মানুষের বাচ্চা কি সহজে ও জঙ্গল পেরোতে পারে? চিতেবাঘ, ভালুক, নেকড়ে··· বুঝলে?'

'তা ঠিক।'

আর ঠিক তখনই আবদুল মেয়েটিকে কুঁড়েঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

* * *

সন্ধ্যের একটু আগে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো আবদুলের। সে ওখানেই কাঠগুঁড়োর গাদায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সুখের ঘুম ঘুমোচ্ছিল, যেন বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সূর্যের শেষ রশ্মি জঙ্গলের মাঝখানে খোলামেলা জায়গাটায় এসে পড়েছে। তখনও করাত চলছে। কাঠের দুটি মজবুত পাটাতন, একটা ওপরে, একটা নিচে। মাঝখানে একটা দেবদারুর শক্ত গুঁড়ি কাৎ করে লাগানো। করাতের এক প্রান্ত ওপরের দিকে, অপর প্রান্ত নিচের দিকে। ওপরের পাটাতনে বলিষ্ঠ দেহের কাশ্মীরী এবং তার সঙ্গে শ্যামবর্ণ গুজরাটী দাঁড়িয়ে। নিচের পাটাতনে রয়েছে ঢ্যাঙা গোল টুপিওয়ালা লোকটা আর তার সঙ্গে লিক্‌লিকে চেহারার লম্বা আঙুলওয়ালা মজদুর, তার পরনের জামাটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। 'হল্লা' বলার সঙ্গে সঙ্গে করাত ওপরে যায় আর 'হু' বলার সঙ্গে সঙ্গে নিচে আসে। 'হল্লা —হু' আওয়াজের ভেতর দিয়ে দেবদারুর গুঁড়িটা চেরাই হচ্ছে, মিহি-মিহি কাঠগুঁড়ো এসে পড়ছে মাটিতে। চারদিকে দেবদারু, বেয়াড়, চীল, রপাড্‌কাড় আর তুঙ্গ গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেষ সূর্যরশ্মি চীলের শুক্‌নো পাতা আর দেবদারুর শাখা-প্রশাখা ভেদ করে মাটিতে ছড়িয়ে, কাঠগুঁড়ো স্বর্ণরেণুর মতো চক্‌চক করছে। ঝক্‌মক করছে দ্রুত যাওয়া-আসা করাতটা, ঝক্‌মক করছে দেবদারুর গুঁড়িটা যার বুক থেকে সোনার মতো কাঠের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে, ঝক্‌মক করছে বিশেষ ছন্দে আন্দোলিত মজদুরদের হাতগুলো। তাদের বাহুতে ফুলে-ওঠা পেশীর ছন্দে, টান-টান হয়ে ওঠা পায়ের গোছার প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাদের বুকের ওঠা-নামার ভেতর দিয়ে এমন এক সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে, যেন তারা তাদের হাতে লোহার করাত নিয়ে নয়, শ্রমের নক্ষত্র নিয়ে গান গাইছে।

আবদুল অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখল। তারপর শেষ সূর্যরশ্মি যখন বেঁটে কাশ্মীরী লোকটার কপাল ছুঁয়ে ওপরের গাছের ডালপালার আড়ালে চলে গেলো, তখন লোকগুলো তাদের করাত চালানো বন্ধ করল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তারা কাঠগুঁড়োর গাদার কাছে এসে আবদুলের পাশে বসে পড়ল।

বেঁটে কাশ্মীরী লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শহরে কি করো?'

আবদুল জবাব দিলো, 'একটা স্কুলে পড়াই।'

'হুঁ! তোমার নাম?'

'আবদুল।'

'কদ্দুর পড়াশোনা করেছ?'

'আট ক্লাস পর্যন্ত।'

'আট ক্লাস? তাহলে তুমি তো ইংরেজি পড়তে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

মজদুরেরা একজন আর একজনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, চোখে চোখে কি যেন পরামর্শ করল তারা। তারপর ঢ্যাঙা লোকটা, পরে আবদুল জানতে পেরেছিল তার নাম ওয়ালীজু, বেঁটে লোকটাকে বলল, 'দেখা না কাদর, এতে আর ক্ষতি কি! কি করমদাদ, তোমার মতটা কি শুনি!'

করমদাদ অর্থাৎ শ্যামবর্ণের সেই গুজরাটী লোকটা বলল, 'ঠিকই তো, জানা যাবে ব্যাপারটা। নূরকেও শুধিয়ে নাও।'

করমদাদ লিক্‌লিকে চেহারার লম্বা আঙুলওয়ালা লোকটাকে দেখাল। সে তখন উবু হয়ে বসে চিবুকে লম্বা আঙুল বোলাচ্ছিল আর আবদুলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। কিছুটা সংশয় কিছুটা বিশ্বাসের গলায় সে বলল, 'বেশ তো, দেখাও না।'

নূর, করমদাদ ও ওয়ালীজু, তিনজনেই সম্মতি জানালে বেঁটে কাদর বট্ট তার তেলচিটে ময়লা জামার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল, কয়েক ভাঁজ করে সেটা পকেটে পুরে রেখেছিল সে। হয়ত এক সময় কাগজটার রঙ সাদাই ছিল, কিন্তু পকেটে ক্রমাগত থেকে থেকে এখন তার চেহারা খয়েরী, ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে যাওয়ার দশা।

কাদর বট্ট কাগজটা খুব সাবধানে পকেট থেকে বার করে আবদুলকে দিয়ে বলল, 'নাও, পড়ো।'

আবদুল খয়েরী রঙের কাগজটার ভাঁজ খুলতে লাগল। কাগজটা থেকে মানুষের শরীরের ঘাম ও কাঠগুঁড়োর গন্ধ বেরোচ্ছে। ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে শেষে বোঝা গেলো যে, দেশীয় রাজার কোনো এক মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর থেকে কাগজখানা পাঠানো হয়েছে জঙ্গলের ঠিকেদার লালা জ্ঞানশাহের নামে। তাতে

অন্যান্য কথার সঙ্গে এটাও লেখা আছে যে, যারা গাছ কাটে, করাত চালায় এবং কাঠের গোলায় কাজ করে, সেই সব শ্রমিকদের প্রতিদিন আট আনা করে মজুরি দেওয়া হবে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' কাদর জোরে চিৎকার করে উঠল। নিজের বুকে জোরে জোরে থাপ্পড় মারতে মারতে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চাটা এখানে এসে জ্যান্ত ফিরে গেলো!'

লিক্‌লিকে লোকটা অস্থিরভাবে তার লম্বা লম্বা আঙুলে চিবুক স্পর্শ করল।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কি!' ঢ্যাঙা ওয়ালীজু বলল। তাকে দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল। বলল, 'লালা জ্ঞানশাহ্ শালা আমাদের ছ'আনা করে মজুরি দেয়। আর এ দিকে সরকারী কাগজে লেখা আছে, আমাদের আট আনা করে মজুরি দিতে হবে।' কাগজখানা জোরে ফড়ফড় করে নেড়ে দিলো সে।

কাদর বউ চিৎকার করে আক্ষেপ জানাল, 'হায় হায়, শালা জ্ঞানশাহ্ আর তার লোকটা এখানে এল, আবার জ্যান্ত ফিরেও গেলো!'

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'কাগজখানা কবে পেয়েছ তোমরা?'

'আরে, আমাদের আবার কে দিতে যাবে!' নূর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিলো। বিড়ালের চোখের মতো তার চোখ দুটো সবুজ দেখাচ্ছিল। বলল, 'কাগজটা তো লালার লোক ধর্মচন্দের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।' কথাটা বলেই নূর দারুণ রাগে কাগজখানায় থপ্‌থপ করে কয়েকটা চাপড় মারল।

কাদর বলল, 'ইস, করছ কি? ওটা ছিঁড়ে যাবে যে!'

সে আবদুলের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে বড় সাবধানে ভাঁজ করতে শুরু করল।

করমদাদ বলল, 'এখন ওটা আর কি কাজে লাগবে? লালা তো তিন মাসের মজুরি মিটিয়ে দিয়ে গেছে, রসিদও নিয়ে গেছে।'

কাদর বলল, 'আরও মাস তিনেকের কাজ তো বাকি আছে! এ যা সরকারী কাগজ আছে না, ওর বাপও মজুরি না দিয়ে পারবে না।' কথাটা বলে কাদর বড় তৃপ্তির সঙ্গে কাগজখানা পকেটে রেখে দিলো।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা রসিদ দেখেছ? যদি সে তাতে আট আনা হিসেবে মজুরি লিখে নিয়ে থাকে, তাহলে?'

ওয়ালীজু বলে উঠল, 'তা যদি বেইমানী করে, তো কি করব? যার যেমন কপাল! আমরা তো বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে ফেলেছি। তোমার মতো দু'চারটে অক্ষরও জানি না-কি আমরা?'

করমদাদ নিজের বুকে চাপড় মারল, 'কাঁদছিস কেন? সব ঠিক করে দিচ্ছি আমি। একবার শুধু লালাকে আসতে দে না!'

ওরা সবাই চুপ হয়ে গেলো।

করমদাদ আবার বলল, 'কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি তো রয়ে গেছে এখনো, ওগুলো পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে দে।'

নূর বিরক্তি প্রকাশ করল, 'এখনই মাথা কোটার কি আছে, সকাল হোক।'

কাদর কিন্তু করমদাদকেই সমর্থন জানাল, 'না, করমদাদ ঠিকই বলেছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তো এখনো দেরি আছে, একটু চা খেয়ে নিয়ে গুঁড়িগুলো নিচে ফেলে দেবো। এতে আর ভাবনা-চিন্তার কি আছে!' এ কথা বলেই সে গলা তুলে ডাকল, 'বানো! বানো!'

আবদুল দেখল, মেয়েটি কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জবাব দিলো, 'জী আব্বা!'

'চা!'

'হ্যাঁ আব্বা, নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।'

কাদর খুশী হয়ে হাত কচলালো, তারপর চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, 'মা আমার গাঁ থেকে খুব ভালো চা এনেছে —কাশ্মীরী চা, সেই সঙ্গে নুন আর গুড়ও এনেছে —আঃ, এক যুগ পরে চা খাওয়ার মজাটা পাওয়া যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে বানো ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে চা নিয়ে আসে। প্রথমে চা দেওয়া হয় অতিথিকে, তারপর তার আব্বা কাদরকে, শেষে অন্যান্যদের। আবদুল এক ঢোক খেয়েই বুঝতে পারে যে চা ভারি চমৎকার, কাশ্মীরী চা, তাতে আবার নুন, গুড় আর সোডা পড়েছে, কফির মতো গরম গরম আর গোলাপের মতো লাল, এর স্বাদই আলাদা। কাদর বড় মজা করে চুমুক দিয়ে দিয়ে চা খেতে থাকে, প্রত্যেক ঢোক খাওয়ার পরই সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

চা খাওয়ার পর তারা পাহাড়ের ঢালে চলে যায়। আবদুলও যায় সঙ্গে সঙ্গে। কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখে, উনুনের ধারে বসে বানো ভুট্টার রুটি সেঁকছে। উনুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বানো তাকে কয়েক পলক আড়চোখে চেয়ে দেখে। গোলাপের মতো তার গাল দুটো আগুনের শিখার মতো রাঙা দেখায়, বিন্দু বিন্দু ঘাম চক্‌চক করে। আবদুল সামনে পা বাড়ায়।

ঢালটা বহুদূর বিস্তৃত। যেখানে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই পাহাড়ের চুড়ো থেকে, নিচে কাগানের নদীর তীর পর্যন্ত, পাহাড়ের ঢালের ওপর কাঠের রাস্তা বানিয়ে রাখা হয়েছে। শত শত ছোট ছোট কাঠ, একটার সঙ্গে আর একটা, ওপরে-নিচে ও পাশাপাশি রেখে রাস্তাটা তৈরী। ঢালের দু'ধারে বড় বড় গাছের গুঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে রাস্তাটার ওপর দিয়ে চেরাই কাঠ নিচে গড়ানোর সময় রাস্তার এদিকে ওদিকে ছিটকে না পড়ে।

'হল্লা-হু-শেরা', কাদর জোরে চিৎকার করে এবং তৎক্ষণাৎ একটি বড় কাঠ সে ঢাল দিয়ে নিচে গড়িয়ে দেয়। কাঠটা গড়াতে গড়াতে সবেগে নিচে গিয়ে

পড়ে। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে যখন এক-একটা বাঁকে গিয়ে নিচের ঢালে আছড়ে পড়ে, তখন একটা ভীষণ শব্দ সৃষ্টি হয়, ঠিক যেন গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ কিংবা ওপর থেকে শত শত মণ ওজনের পাথর সজোরে আছড়ে পড়ার আওয়াজ। কাঠ ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখান থেকে ছিটকে ঝপাং করে নদীর জলে পড়ে, চারদিকে জল ছিটকে যায়, সেই সঙ্গে জলে দারুণ ঢেউ উঠে চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

'হল্লা-হু-শেরা' বলে চিৎকার করতে করতে লোকগুলো গাছের গুঁড়ি, কাঠ, তক্তা সব গড়িয়ে দিতে শুরু করে। আবদুলও সে-কাজে হাত লাগায় ওদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে এমন ছেয়ে যায় যে, ঢাল কিংবা নদীর জল কিছুই আর চোখে পড়ে না, কেবল চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলে কাঠগুলোর ঢাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে যাওয়া আর ঝপাং করে জলে আছড়ে পড়ার শব্দই কানে আসে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ গুঁড়িটাও গড়িয়ে দেয় তারা, তারপর কুঁড়েঘরে ফিরে আসে।

পেঁয়াজের চাটনি সহযোগে ভুট্টার রুটি আর ঠাণ্ডা জল খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো সবাই। নূর আর করমদাদ জঙ্গলের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে কাঠ ছড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো, যাতে বুনো জন্তুরা এ দিকে না আসতে পারে। তারপর ওরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসল। সকলের খাওয়া শেষ হওয়ার পর বানো এখন কুঁড়েঘরে খেতে বসেছে।

কাদর একটা প্রকাণ্ড হাই তুলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ভেতরে ঘুমোতে চললাম।' বলেই সে উঠে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সবাই।

তারপর এক সময় করমদাদ জিজ্ঞেস করল, 'আবদুল, তোমরা ক'টি ভাই-বোন?'

'আমরা দু'ভাই, এক বোন।' আবদুল জবাব দিলো।

নূর জিজ্ঞেস করল, 'আর, তোমার বিয়ে?'

'না, এখনও করিনি।'

ওয়ালীজু বড় আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আরে, এত বড় হয়ে গেলে, এখনো বিয়ে করনি? আমাদের গাঁয়ে তো খুব অল্প বয়েসেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।'

করমদাদ নূরের দিকে ইশারা করে বলল, 'নূরকে শুধাও না!'

নুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কি যে বলো ইয়ার! দিনরাত বউয়ের কথা মনে পড়ে, তিন-তিনটে মাস এই জঙ্গলে একা পড়ে রয়েছি।'

কারোর মুখে কথা নেই।

অনেকক্ষণ পর ওয়ালীজু বলল, 'আমিও ঘুমোতে চললাম—তুমি করমদাদ?'

করমদাদ বলল, 'আমি তো চাঁদ না-ওঠা পর্যন্ত এখানে বসব।'

'আমিও !' নূর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

আবদুল মৃদু হেসে বলল, 'আমিও থাকব না-কি ?'

'হ্যা হ্যা। কাল আর কতটুকু হাঁটতে হবে তোমায়! এই তো কাগানে যাবে!'

নূর চোখ বুঁজে মৃদুকণ্ঠে গান গাইতে শুরু করল। জঙ্গলের জংলী ভালোবাসার গান—

এক যে ছিল কাঠবিড়ালী, এক যে ছিল সাপ,
এক যে ছিল বনফশা ফুল।
এক কাঠচেরাইওয়ালা ছিল আর ছিল তার হৃদয়-পাটের রাণী,
ভালোবাসায় রাত ছিল মশগুল।
ভালোবাসায় রাত ছিল, চাঁদ ছিল আকাশে—
চাঁদ হলো প্রেমের সংলাপ।
কাঠাচেরাইওয়ালার নখ কেটে নেয় দুষ্ট কাঠবিড়ালী,
রাণীকেও কাটে কাল সাপ;
বনফশা ফুল তার চক্ষু বুঁজে নেয় চুপচাপ।
কাঠচেরাইওয়ালা ছোটে পাগলের মতো —আঃ! আঃ!! আঃ!!!
কাঠচেরাইওয়ালা ছোটে পাগলের মতো —আঃ! আঃ!! আঃ!!!
কাঠবিড়ালী কবর খোঁড়ে, সাপ তার ফণা তুলে নাচায়,
বনফশা ফুলের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে রাণী,
বনফশা ফুলের কোলে—
চাঁদ ডুবে যায়॥

আস্তে আস্তে এক সময় নূরের গলার আওয়াজ একেবারে ডুবে গেলো। একটু পরেই তার নাক ডাকতে লাগল। আবদুল দেখল, তার পাশে করমদাদও ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল দু'জনেই, কিন্তু তার আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, সুদূর গ্রামে ওদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তাদের সোনালী কল্পনায় বিভোর হয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা ঘুমিয়ে গেলে চাঁদ উঠে এল খোলা জায়গাটার ওপরে; তাঁবু, কুঁড়েঘর আর কাঠগুঁড়োর গাদার ওপরে দুধের মতো নির্মল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল।

কুঁড়েঘরের সামনে শুয়ে রয়েছে বানো। রূপোর পিণ্ড থেকে ছড়িয়ে-পড়া হাল্‌কা আলোয় আবদুল ধীরে ধীরে উঠে সেখানে গেলো। বানোর দুরদুর করে কাঁপতে থাকা বুকে হাত রাখল।

বানো কিছু বলল না।

আবদুল যখন তাকে নিজের শক্ত সুঠাম দু'বাহুতে তুলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বুকে চেপে ধরল, তখনও সে কিছু বলল না। তারপর আবদুল যখন তাকে নিয়ে গিয়ে

কাঠগুঁড়োর গাদায় শুইয়ে দিলো, তখনও সে কিছু বলল না। আবদুল নিজেও যখন তার কাছে বসে পড়ল, তখনও সে কিছু বলল না। সে আবদুলের গরম নিশ্বাসে মনের গোপন কথা শুনছিল আর ধীরে ধীরে হাতের মুঠোয় কাঠগুঁড়ো নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ছিল।

আবদুল বানোর মুখখানি নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল, হাত দিয়ে তার চিবুকটাকে তুলে ধরতেই তার চোখের তারায় চাঁদ ঝিকমিক করে উঠল, তার আনত কমনীয় গ্রীবা ধারালো করাতের মতো ঝক্‌ঝক করে উঠল। আবদুল তার দু'কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমার আব্বা ঠিকই বলেছে। আমি এখানে মধু চাখতে এসেছি।' কথাটা বলেই আবদুল বানোর ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে দিলো। সেই সঙ্গে তার বাহুবেষ্টনী দৃঢ় হয়ে উঠল। বানো অস্থিরভাবে আঙুলের নখ বসিয়ে দিলো আবদুলের কাঁধে। দু'জনের শরীর কাঠগুঁড়োর গাদায় যেমন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল, ঠিক তেমনি আবদুলের তৃষ্ণার্ত আগুন বানোর দেহের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল।

হঠাৎ একটা জোর ঝট্‌কা দিয়ে বানো আবদুলের বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। চুল থেকে কাঠগুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে মুখে একটা আলতো ফুঁ দিয়ে বলল, 'ইস, কাঠগুঁড়ো আর কাঠগুঁড়ো!'

আবদুল হেসে উঠল।

'চুপ!' বানো তার পাতলা পাতলা ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'এখন যদি আব্বা জেগে যায়, তাহলে…'

'তাহলে মেরে ফেলবে আমায়, এই তো!'

'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ আছে না-কি!' বানো ঘাড় নেড়ে বলল।

'কিন্তু ওরা এমন খাটাখাটনি করে ঘুমিয়েছে যে সকালের আগে চোখ খুলতেই পারবে না।'

বানো খুশী হয়ে মৃদু হাসল। বলল, 'তা ঠিক—কিন্তু—তোমার নাম কি?'

আবদুল মৃদু হেসে বলল, 'আমার নাম আবদুল। তোমার নাম বানো তো!'

বানো জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি করো?'

'পুঞ্চের একটা স্কুলে পড়াই।'

'পড়াও?' কথাটা বলেই বানো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'যার সঙ্গে আমার মাঁগনি (বিয়ের কথা) হয়েছে, সে-ও শহরে থাকে। পুলিশের চাকরি। শুনেছি লোকটা খুব বদমাস।'

'কি নাম ওর?'

'আল্লাদাদ। মাঁগনিতে ও আব্বাকে সাড়ে সাত শো টাকা দিয়েছে, বিয়েতে আরও পাঁচ শো দেবে—আমাদের যখন বিয়ে হবে।'

'কখন হবে?'

'ও তো বলছে সামনের বোশেখেই; কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।'

'কেন?'

'দেখতে ভালো না। তার ওপর লোক ভালো নয় শুনেছি।'

'আমি দেখতে কেমন?' আবদুল জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ!' বলে বানো হাসল। সঙ্গে সঙ্গে একমুঠো কাঠগুঁড়ো তুলে নিয়ে সে আবদুলের মুখে ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু আবদুল আগেই চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

মুখ থেকে কাঠগুঁড়ো সাফ করতে করতে আবদুল বলল, 'তোমার বিয়েটা তো আমার সঙ্গেই হবে। কিন্তু আমার কাছে মাঁগনির সাড়ে সাত শো-ও নেই, বিয়ের পাঁচ শো-ও নেই।'

'তোমার বাপ-মা কি খুব গরীব?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি এত পড়লে কি করে?'

'নিজেই মেহনত করে পড়েছি।'

'আট ক্লাস পর্যন্ত?' বানো খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আবদুল মাথা নেড়ে বলল, 'স্কুলে পড়াতে পড়াতে আরও দু'ক্লাস পড়েছি। এখন বাড়ি যাচ্ছি, মা-আব্বার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে শহরে ফিরব। তারপর ওখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যাব দশ ক্লাসের পরীক্ষা দিতে।'

'তাহলে কি হবে তুমি?'

'তাহলে আরও বড় মাস্টার হব। কিংবা কে জানে, হয়ত তহশিলদারও হয়ে যেতে পারি!'

'তহশিলদার?' বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বানো আবদুলের দিকে তাকাল। তারপর একটু সরে গিয়ে বসে পড়ল সে।

আবদুল হাত বাড়িয়ে আবার ওর কোমর জড়িয়ে ধরল, কিন্তু বানো তেমনি নিস্পৃহ হয়ে বসে রইল।

আবদুল বলল, 'আমার কাছে সাড়ে সাত শো-ও নেই, পাঁচ শো-ও নেই। তবু আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।'

বানো বলল, 'তা কি করে হবে! আব্বা শুনবে না। ওরা তো সাড়ে সাত শো টাকা দিয়ে ধানের জমি কিনেছে—কোনো চাষার বেটা জমি ছাড়ে?' তারপর একটু থেমে সে বলল, 'চলো, কোথাও পালিয়ে যাই আমরা।'

আবদুল বলল, 'যাব কোথায়? আমায় তো আবার রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হবে, দশ ক্লাসের পরীক্ষা দিতে।'

'আরে রাখো তোমার দশ ক্লাস। অনেক পড়েছ।'

'না-না।' আবদুলের কণ্ঠস্বর অনমনীয়।

বানো স্তব্ধ হয়ে গেলো।

আবদুল আবার বলল, 'আমি যখন তহশিলদার হব...'

'কবে হবে?'

'দু' বছর কিংবা তিন বছর...'

বানো ঝাঁজাল গলায় বলল, 'হুঁ! এ দিকে সামনের বোশেখেই আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।'

আবদুল বলল, 'দুটি বছর তুমি কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারবে না? যারা একবার ভালোবাসে, তারা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যায়।'

বানো আবদুলকে জড়িয়ে ধরল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'চলো না, কোথাও পালিয়ে যাই! পুলিশের লোকটাকে আমার বড় ভয়—এর আগে ওর দুটো বউ মরেছে।'

আবদুল বানোকে বুকে জড়িয়ে ধরল, 'তুমি মরবে না। আমি বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার সময় এখান থেকে শহরে নিয়ে যাব তোমায়।'

বানোর বিমর্ষ মুখখানি আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে আবদুলের অমসৃণ গালের ওপর কোমল হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গুনগুন করে গাইতে লাগল—

এক কাঠচেরাইওয়ালা ছিল
আর ছিল তার হৃদয়-পাটের রাণী,
ভালোবাসায় রাত ছিল মশগুল।

* * *

তারপর সে পরম সুখে আবদুলের বাহুবেষ্টনীর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর আবদুল অনেকক্ষণ তার হাত দুটি নিজের বুকের কাছে চেপে ধরে ভাবতে লাগল, এখন সে কি করবে!

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল, বানোকে তুলে নিয়ে বড় সতর্ক পায়ে তাঁবুগুলো পেরিয়ে গেলো সে, কুঁড়েঘরের ভেতরে গিয়ে বানোকে শুইয়ে দিলো। আর তারপর সে করাতের নিচে এসে বসল।

কাছেই অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, কাছেই করমদাদ ও নূর ঘুমোচ্ছে। উন্মুক্ত স্থানটার চারদিকে কাঠের আগুন চমকাচ্ছে। দূরে দূরে জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে কোথাও কোথাও আগুনের মতো ধক্‌ধকে চোখ নজরে পড়ে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকে, অমনি দু'চারটে নেকড়ে একসঙ্গে চিৎকার করে, তারপর আবার চারদিক গভীর স্তব্ধতায় ডুবে যায়। জাফরানের গন্ধ-মদির হাওয়া। আবদুল বহুক্ষণ বিনিদ্র অবস্থায় শুধু ভাবতে থাকে। সে চাঁদটাকে কাঠের পাটাতন দুটি অতিক্রম করে দক্ষিণে ঢলে পড়তে দেখে; এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সপ্তর্ষিকে। আর তারপর দুগ্ধফেননিভ জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে এলে কাগানের কল্‌কল ছল্‌ছল শব্দ, সেইসঙ্গে ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠা বায়ুপ্রবাহের ফিস্‌ফিস আওয়াজ শুনতে শুনতে সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুই

আবদুল যে-রাত রঙ্গড়ের জঙ্গলে কাটাল, সে রাতেই টিকরী শাহমুরাদে মকাইয়ের ফসল কাটা সারা হয়েছে, গাদায় তোলা হয়েছে, সব কাজ সামলে নিয়ে সেই ফসল আগলাবার জন্যে জায়গায় জায়গায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকরী শাহমুরাদে বছরে একটাই ফসল ফলে, তা-ও শুধু মকাই। সে জন্যে সে ফসলের এক-একটি দানা সোনার মতোই দামী। ফসলের সবটাই যদি হাতে থাকে, তাহলে কষ্টেসৃষ্টে কোনো রকমে বছরটা কাটে। আর সে কাটানোটা কি রকম? না, সকালে ভুট্টার রুটি, সন্ধ্যেয় ভুট্টার রুটি, আর দিনভর কাগানের জল খেয়ে আল্লার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো। সামনে আর এক জগতের চিন্তা, হয় স্বর্গ, না-হয় নরক। এ জগতে কেবল ভুট্টার রুটি, তা-ও সব সময় জোটে না। কারণ রুটি হলো মানুষের মেহনত, আর মানুষের সেই মেহনতে শাসকগোষ্ঠীরও অংশ রয়েছে। পঙ্গপাল যেমন ক্ষেতের ফসল আর আমগাছের কচি পাতা খেয়ে বিনাশ করে দেয়, তেমনি মানুষ মেহনত করে আর শাসকগোষ্ঠী তার মেহনত আত্মসাৎ করে—হাজার হাজার বছর ধরে এই চলে আসছে। পঙ্গপালের ফসল খেয়ে ফেলাটাই কাজ, সে কি জানে কি করে ফসল জন্মায়, এক-এক দানা ভুট্টা কিভাবে ফলে? টিকরী শাহমুরাদের মাঠে উঁচু-নিচু গর্তগুলোতে তখনও বরফ জমে থাকে, ক্ষেতের চারধারে বরফ জমে জমে চৌখুপী সাদা পাড় তৈরী হয়, সেই সময় চাষীরা ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলদ নিয়ে মাঠে যায়, ভুরভুরে মাটিতে লাঙল চালায়, ক্ষেত থেকে ঝড়-ঝাপটায় এসে-পড়া পাথর আর বরফ সাফ করে, আলে আলে পাথরের টুক্‌রো জড়ো করে। তারপর কয়েক মাস বাদে যখন প্রথম সূর্য ওঠে, তখন তারা চষা জমির সারিতে সারিতে লালা মীরা-শাহের কাছ থেকে ধার-নেওয়া মকাইয়ের বীজ ছড়ায়। চাষীদের হাত থেকে বীজগুলো এক-এক দানা করে মাটিতে এমনভাবে ঝর্‌ঝর করে পড়তে থাকে, যেন মনে হয়, পাতা-ঝরা ঋতুতে তরনারির ডালপালা থেকে ফুল ঝরে পড়ছে। তারপর মানুষের মেহনতের সেই সোনালী ফুল মাটির মধ্যে লুকিয়ে কোমল সবুজ অঙ্কুরে রূপান্তরিত হয়, কৃষকের আকাঙ্ক্ষার শস্য-শ্যামল ক্ষেত হিল্লোলিত হয়, ঢলঢলে সবুজ চারাগুলোতে তারা স্বপ্ন দেখে, পুরনো ঘরবাড়ির নতুন চাল, স্ত্রীর কানে সোনার কর্ণাভরণ, ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ, জোয়ান ছেলের বউ ···চারা-গাছগুলো বড় হতে থাকে, ঝাঁকড়া হতে থাকে, তাদের চারপাশে লম্বা লম্বা ঘাস গজায়। ক্ষেতে শশা আর শফতালুর লতা বেড়ে ওঠে। কোথাও কোথাও বুনো করলা, চাষীরা সেগুলো শুকিয়ে রাখে শীতকালের জন্যে। তারপর চারাগুলো বড় হয়ে তাদের বুক সমান হয়, তখন চাষী বারবার গাছগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর দিয়ে সেগুলো মেপে দেখে আর খুশী হয়ে ওঠে। এক সময় গাছ-গুলোর পাতার কোলে সবুজ মকাই উঁকি দেয়, তাদের ডগায় রেশমের মতো

কোমল ঝুঁটি তুলতে থাকে, তখন গাছগুলো চাষীর মাথা ছাড়িয়ে গেছে ; তার মনে পড়ে যায় সেই মধুর জ্যোৎস্না রাতগুলির কথা, যখন সে উঁচু-উঁচু মকাই গাছের আড়লে প্রথম প্রথম তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করত, সেই প্রেমিকা আজ তার বউ। মনে পড়ে মকাইয়ের উষ্ণ সুরভি-স্নাত এক দুপুরের কথা, যখন সে তার মেহনত দিয়ে তৈরী অবারিত উদ্যানে প্রথম ভালোবাসার মুখ চুম্বন করেছিল, প্রেমিকাকে উপহার দিয়েছিল গাছের প্রথম ভুট্টা —তার মেহনতের পবিত্র ফল। সেই প্রথম ভুট্টার পরত খুলতে খুলতে, কাঁপা-কাঁপা আঙুলে একটির পর একটি পরত খুলতে খুলতে সে ভুট্টার সোনালী দানার মুখ দেখেছিল, ফুলশয্যার রাতে যেমন কোনো অধৈর্য প্রেমিক পর্দা তুলে, ঘোমটা তুলে তার নববধূর মুখ দেখে। এভাবেই চাষী কয়েক মাস ধরে অবিরত প্রয়াস আর প্রতীক্ষায় সোনালী দানাগুলো তৈরী করে, নিজের পুত্রের মতোই সেগুলি তার একান্ত আপন, নিজের স্ত্রীর মতোই একান্ত আপন —নিজের ঘরবাড়ি, দুধলো গরু, ক্ষেতে লাঙল-বওয়া বলদের মতোই একান্ত আপন। তারপর সেই শস্য পরিপক্ক হয়, নরম উষ্ণ দুধের ভুট্টা পেকে শক্ত হয়, ভুট্টার দানা আচ্ছাদন করে থাকা সবুজ পরতগুলো হলুদ হয়ে আসে, সবুজ ঝুঁটিগুলোর রঙ খয়েরী হয়, চাষী তখন তার ফসল কেটে নিয়ে গিয়ে গাদায় তোলে। জ্যোৎস্না রাতে নাড়া-ভর্তি ক্ষেতে সেই ফসলের গাদাগুলোকে ছোট ছোট মিছরীর ডেলার মতো দেখায়।

কিন্তু সেই মকাইয়ের দানা, যার সমগ্রটাই তার যাবতীয় মেহনতের ফল, তা কখনোই তার নিজস্ব হয়ে থাকে না। স্ত্রী থেকে যায়, পুত্রও থেকে যায়, কিন্তু দানাগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয় তার কাছ থেকে। মাঠ থেকে তুলে এনে যখন গাদায় সমস্ত শস্য জড়ো করা হয়, সোনালী গাদাগুলো বেশ বড়সড় হয়ে ওঠে, তখন গাঁয়ের নম্বরদার ইলমদীন এসে হাজির হয়। বলে —দানাগুলোকে চার ভাগ করো। এক ভাগ আমায় দাও, যেহেতু জমি আমার ; এক ভাগ সরকারকে দাও, যেহেতু তার হাতে তলোয়ার। এক ভাগ লালা মীরাশাহ নেয়, কারণ বীজ তার, তাছাড়া গাঁয়ের নুন-চা-কাপড় সব আসে তার কাছ থেকেই, ধারের ওপর ধার। দানার এক চতুর্থাংশ বাকি থাকে, তাতে আবার জোলার ভাগ রয়েছে, সে কম্বল বোনে ; মুচি কুমোরের ভাগ রয়েছে, তারা জুতো তৈরী করে, হাঁড়ি-কুড়ি বানায় ; কলুর ভাগ ···আর তারপর ···আর তারপর, চাষীর চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ে শুধু বরফ, সুন্দর স্বপ্নগুলো জমে যেতে থাকে, প্রিয়তমার কান থেকে ঝুমকো ঝরে পড়ে, ছেলেমেয়ের নগ্ন পা থেকে খুন ঝরতে থাকে, আর চাষী দেখে, যেগুলি তার সাধের চারাগাছ ছিল, তাদের ডালপালা থেকে তার সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা, আনন্দ তৃপ্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা পচে নষ্ট হয়ে গেছে, শরৎকালে বাড়ির বাইরে সফেদার গাছ যেমন নিঃস্ব রিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি সেই মকাইয়ের গাছগুলি নগ্ন নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন চাষী সজোরে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে।

আজ টিকরী শাহমুরাদে সে রকমই এক রাত্রি। ফসল সামলানো হয়েছে, চাষীরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাতের মুঠি পাকাচ্ছে। এই নিধনের রাত্রিটি সহজে কাটে না। কাল সকালে নম্বরদার আসবে, সঙ্গে মহারাজের কর্মচারী নিয়ে আসবে। জায়গীরদার, নম্বরদার, বেনে —সকলেই আসবে একে একে। তাদের মেহনতের বাগানটা তছনছ করে দিয়ে চলে যাবে। হাজার হাজার বছর ধরে ওরা এই করে আসছে, তবু কেন জানি না, নিধনের রাত্রিটিতে চাষীরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে! ভুট্টার পুরুষ্ট দানার মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে, সেই প্রাণই কি তাদের বিরোধিতা করতে বাধ্য করে —এ শস্যদানা তোর —এ শস্যদানা তোর —এ শস্যদানা তোর! বারবার সেই আওয়াজ আসে, ক্রমশ সে আওয়াজ বাড়তে থাকে, কাগানের বন্যার জলরাশির মতো। মেঘমন্দ্র আর বিদ্যুৎ চমকের মতো —সে আওয়াজ চারদিকে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, তখন চাষীরা তাদের হাত এমন জোরে মুষ্টিবদ্ধ করে যে, নখগুলো করতলের মাংসের গভীরে ঢুকে যায়, যন্ত্রণাকাতর চোখে অশ্রু উদ্গত হয়।

এই উৎকণ্ঠা, এই দুঃখ থেকে কি পরিত্রাণের কোনো পথ নেই!

চিনার-সদৃশ পীর সাহেব আল্লার কাছে দোয়া (করুণা প্রার্থনা) করার পথ বাৎলেছেন, মৌলবী সাহেব ধর্মোপদেশ দিয়েছেন আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধৈর্য অবলম্বন করতে। নম্বরদার ইলমদীন খুব সেয়ানা, সে তাদের শীতকালে গ্রাম ছেড়ে, বড় শহর ছাড়িয়ে আরও দূরে পাঞ্জাবে গিয়ে মেহনত-মজদুরী করার কথা বলেছে। তারা সমস্ত উপদেশ পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পীর সাহেব তো নিধনের হাত থেকে ভুট্টার দানাগুলিকে রক্ষা করতে পারেননি। ক্ষুধার্ত জঠরে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা বড় কঠিন। আর যারা বাইরে মজদুরী করতে গিয়ে গ্রীষ্মকালে যখন ফেরে, তাদের তখন এমন শীর্ণ আর নিষ্প্রাণ দেখায় যেন বিদেশে কেউ তাদের শরীরে ছুঁচ ফুটিয়ে প্রচুর রক্ত বার করে নিয়েছে। প্রতি বছর শীতকালে এই একই ঘটনা ঘটে। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে কয়েক বছরেই গাঁয়ের তাগড়া জোয়ান ছেলে হাড়ের কঙ্কাল হয়ে ফিরে আসে, অনেকে আবার ফিরেই আসে না। কোনোদিন হয়ত বহুদূর পর্যটন-করে-আসা এক আগন্তুক কিংবা ডাকপিয়ন খবর নিয়ে আসে —একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কার্ডে কালি দিয়ে লেখা দুটি লাইন, মেহনতের কবরের অন্তিম প্রণাম —যেন মাটির গভীরে হারিয়ে যাওয়া ভুট্টার দানা, যা আর কখনও অঙ্কুরিত হবে না…

আজ মিটমিটে জ্যোৎস্নায় চাষীরা জেগে আছে। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, কারণ আজ নিধনের রাত্রি। সকালেই বীজ, শ্রম আর সেই শ্রমের ফল নিহত হবে। এই হত্যা কি কোনোভাবেই বন্ধ করা যায় না? বন্ধ করার জন্যে কত বছর ধরে প্রয়াস চলছে —প্রথমে শতাব্দীর স্বপ্ন ছিল, সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে; তারপর আশা, সে আশা ঝরে গেছে; তারপর ছিল প্রার্থনা, তা-ও এখন মরে

গেছে। সব কিছু অর্থহীন হয়ে গেলে চাষীরা ভাবে, অস্বীকার করে দাও। কাউকে দানা দেবে না, একদানাও না —না ভূমিলুণ্ঠনকারীকে, না তলোয়ার ধরে থাকা হাতকে, না সুদের ওপর সুদ খাওয়া থল্‌থলে চর্বি-চিকন হাসিমুখকে —এ শস্য কাউকে দেওয়া হবে না। যার শস্য তারই থাকবে। টিকরী শাহমুরাদের কৃষকেরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। বিনা আলাপ-আলোচনায়, কারোর বিনা প্ররোচনায়, ঝাণ্ডা-ফেস্টুন না উড়িয়ে, স্লোগান না দিয়ে, তারা নিজেরাই প্রথমবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কারণ এ বছর ফসল এত কম হয়েছে যে, এ-বার শীতকালে ঘরে ঘরে উপোষ আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সিদ্ধান্তের পর ফসলের গাদা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে তারা নিজের নিজের বাড়িতে চলে যায়। তারা জানত না যে, এ রকম সিদ্ধান্ত শুধু টিকরী শাহমুরাদের চাষীরাই নেয়নি, রাহু গাঁয়েও ফসল কম হয়েছে, ফসল কম হয়েছে জানৌরা গাঁয়েও। বটরদারা গাঁয়ে ফসল এত কম হয়েছে যে, লোকেরা এক নজরে ক্ষেতে মকাইয়ের ক'টা গাছ আছে, গুনে বলে দিতে পারে। তাই ঐ সব জায়গার কৃষকদেরও দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। তারা যে পথ গ্রহণ করেছে, সে পথ দোয়া-র নয়, দাওয়াইয়েরও নয়, পলায়ন কিংবা অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকার নয়, অদৃষ্ট কিংবা আত্মসন্তুষ্টিরও নয়। সে এক অদ্ভুত রকমের পথ, বহুদূর থেকে সময়ের হাওয়ায় ভেসে আসা —ঠিক যেমন জ্যোৎস্না রাতে সারা জঙ্গল মৌ-গন্ধে ম-ম করে, তেমনি এক নামহীন পথ চাষীদের খুঁজতে খুঁজতে, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলে যেতে যেতে এক অজানা অদ্ভুত উপায়ে কৃষকদের সচেতন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। অজানা শ্বাস-প্রশ্বাস, অজানা বাতাস, অজানা শব্দ, অজানা গন্ধে চারদিক ভরপুর করে সে যেন বলছে —এ বীজ তোমার, এ ক্ষেত তোমার, এ শস্য তোমার, এই সারা দেশ তোমার —সেই কণ্ঠস্বর শুনে কৃষকদের বুক ঢিপ্‌ঢিপ করে, বাহুর শিরা-উপশিরায় রক্তের উষ্ণ স্রোত অনুভব করে আর তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ে আলো।

আবদুলের বাবা নূরা জোলা তার গাদায় ঠেস দিয়ে বসে আছে, কাছেই বসে রয়েছে আবদুলের বোন রজ্জি —অস্থির, চঞ্চল, কারণ তার বাবা একটু ঘুমিয়ে পড়লেই সে এখান থেকে উঠে ফজলের গাদায় যাবে, সেখানে ফজল অর্থাৎ তার প্রেমাস্পদ অনেকক্ষণ থেকে 'চন্না' গাইছে। সত্যিই রজ্জি দেখতে-শুনতে এমন যে মানুষের প্রাণ চায়, কেউ তাকে নিয়ে গান রচনা করুক, তাকে নিয়ে গান গাইতে থাকুক, বলিষ্ঠ হাতে মেহনত করুক, তার জন্যে ঘরবাড়ি তৈরী করুক, আর সেই সংসারে যদি চঞ্চলমতি সুখ কিছুক্ষণের জন্যেও থিতু হয়, তাহলে রজ্জিকে নিয়ে মেঘে মেঘে উড়ে বেড়াক। তাকে দেখলে সব সময়েই এমনি একটা কিছু মনে হয়, ঠিক যেন খিল্‌খিল করে হেসে-ওঠা ফুল, সরোবরের নীল, জল পাতায় পাতায় ঝল্‌মল করতে থাকা শিশির, ঢেউয়ের ফেনায় ছোঁ মেরে যাওয়া

পায়রা। রজ্জি নিজেই নিজের রূপ দেখে বিস্মিত হয়। কখনো কখনো সে তার নিজের দেহ ও মনের অনির্বচনীয় কাব্যসুষমা দেখে বড় ভয় পায়, কারণ সে এক স্বাস্থ্যবতী মেহনতী মেয়ে। বাবার সঙ্গে ক্ষেতে চাষাবাদের কাজ করে; তার সঙ্গে কম্বল-র‍্যাপার-ধোসা বোনে। মা বৃদ্ধা, ছোট ভাই আবতুল শহরে চাকরি করে। দাদা গুলাম মহম্মদ কবে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে, কয়েক বছর থেকে তার কোনো সন্ধান নেই। রজ্জিকে প্রায়ই পুরুষের মতো কাজ করতে হয়, তাই মাঝে মাঝে নিজের এই রূপ ও নারী-স্বভাব দেখে নিজেই জ্বলে ওঠে, মাঝে মাঝে এ সবকে সে অগ্রাহ্য করারই চেষ্টা করে। নূরা জোলা মেয়েকে সোমত্ত হয়ে উঠতে দেখে, তার অতুলনীয় রূপরাশি দেখে চিন্তিত হয়। মেয়ের বিয়ের কথা ভাবে। এখন আবতুল এসে পড়লে সে এ ব্যাপারে হয়ত একটা মনস্থির করতে পারে। সে তো নিজেও বুড়ো হতে চলল, আর কতদিন জীবনের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পুইয়ে, জোয়ান লোকের মতো দিনরাত খেটে সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরী করবে, ভুট্টা ফলাবে? এখন প্রায়ই হাত পা তার বশে থাকে না। রজ্জি না থাকলে তার পক্ষে সংসার সামলানো দায় হয়ে উঠত। যদি আবতুল শহরেই থেকে যায়, এ দিকে বড় ছেলেটাও ফিরে না আসে, তাহলে রজ্জির বিয়ের পর এই বুড়োবুড়ির শেষ দিনগুলো কি করে কাটবে! সেটাও কম দুশ্চিন্তা নয়।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই নূরা ফসলের গাদায় ঠেস দিয়ে ক্রমশ আরও চিন্তিত হয়ে ওঠে, চোখে ঘুম আসে না। সে চোখ মেলে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঝক্‌ঝক করতে থাকা অন্য গাদাগুলোর দিকে তাকায়। টিকরীর ক্ষেতে ক্ষেতে কিছুটা দূরে দূরে গাদাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঐটে ফজলের গাদা, কিন্তু সে গাদাটাকে তার নিজের গাদার তুলনায় অর্ধেক দেখাচ্ছে। নূরা ভাবে, ফজলের জমিগুলো ভালো নয়, যেটুকু জমিজমা, সেটুকুও চাষাবাদের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। বেশীর ভাগটাই হয় পাথুরে, না-হয় শুধু বালি আর বালি। সে জন্যে ফজল খৈল দিয়েছিল জমিতে, কিন্তু তাতে আর কতটুকু ফায়দা উঠবে? নূরা জানে, রজ্জি মনেপ্রাণে ফজলকে চায়, কিন্তু সে এ ব্যাপারে চুপচাপ আছে। ফজলের এমনিতেই চলে না, বড় কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটে। রজ্জিকে নিয়ে সে কি করে সংসার চালাবে? তাছাড়া রজ্জির জন্যে কত ভালো ভালো বর হা-পিত্যেশ করে চেয়ে আছে! জাতে জোলা তো কি হয়েছে! যেখানে যেখানে নূরার চমৎকার কম্বল-র‍্যাপার-ধোসা গিয়ে পৌঁছায়, সেখানেই তার মেয়ের রূপ-লাবণ্যের গল্পও ছড়িয়ে পড়ে। উঁচু বংশের পাঠান-সেখ-সৈয়দরাও রজ্জির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। সমবেদনার মন নিয়ে এ রকম কল্পনা করতে ভালো লাগে তার —যেন চাঁদ মর্তে নেমে এসেছে, দুগ্ধফেননিভ আলোকবর্তিকা নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকায় উপত্যকায় সে তার প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভালোবাসায় থৈ-থৈ নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা নূরার মনে পড়ে, আর সে রজ্জির ডাগর ডাগর কালো

চোখের সকাতর চাউনি দেখে মুচকি মুচকি হাসে। তারপর এক সময় চোখ বন্ধ করে সে। হাসিটা তখনও ঠোঁটে লেগে থাকে, কিন্তু মৃদু-মৃদু টানা-টানা শ্বাসপ্রশ্বাস বইতে শুরু করে, যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

* * *

কিছুক্ষণ পর রজ্জি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, কম্বলটাকে দু'ভাঁজ করে নূরার গায়ে চাপিয়ে দেয়, বুক পর্যন্ত টেনে দেয় কম্বলটা। নিচের ঠোঁট কামড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ ঘুরে, যে-দিক থেকে চন্নার আওয়াজ আসছিল। সে দিকে হাঁটতে শুরু করে। বাবা এক চোখে পিট্‌পিট করে রজ্জিকে যেতে দেখে হাসে। ঠিক তখনই রজ্জি আবার পেছন ফিরে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে নূরা চোখ বুঁজিয়ে ফেলে। রজ্জি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে এক পায়ে ভর দিয়ে, তারপর দৌড়তে দৌড়তে ফজলের গাদায় গিয়ে হাজির হয়। ফজল গান গাইছিল। রজ্জি আস্তে আস্তে, কোনো রকম সাড়া-শব্দ না করে ফজলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নিশ্বাস বন্ধ করে দু'হাতে ফজলের চোখ টিপে ধরে।

ফজল চন্না গাইতে গাইতে থেমে যায়। তার বড় বড় মজবুত হাত দু'খানা চোখের কাছে আপনা থেকেই উঠে আসে, আঙুল দিয়ে আঙুলগুলোকে চিনে ফেলতে অসুবিধে হয় না, একটি স্পর্শ আর এক স্পর্শে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ভালোবাসার সঙ্গীত নাচতে নাচতে দুটি হৃদয়ে আলোড়নের মধ্যে হারিয়ে যায়। অমর প্রেমের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটির সৃষ্টি হয়, যখন সময়ের ডানা স্তব্ধ হয়, ভূত-ভবিষ্যতের সীমারেখা মিলিয়ে যায়, আর মানুষের প্রেমের অলৌকিক অজেয় বিশ্বকেও নিজেদের হাতের মুঠোয় বন্দী করে ফেলে।

কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ফজল, পরমুহূর্তেই সে তড়িৎ-বেগে নিজের চোখ থেকে রজ্জির আঙুলগুলো সরিয়ে দেয়, আর তারপরই পেছন ফিরে শক্ত দু' বাহুর আলিঙ্গনে রজ্জিকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে।

'উঃ, মরে গেলাম।' রজ্জি চিৎকার করে ওঠে।

ফজল তাকে আরও জোরে চেপে ধরে।

রজ্জি বলে, 'এই, সরো, কি করছ! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

ফজল হাসতে হাসতে তাকে এমন জোরে চেপে ধরে যে সত্যি-সত্যিই তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, কান পর্যন্ত তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল, তারপর হঠাৎ ফজল তাকে ছেড়ে দিতেই সে ছিটকে ঘাসের ওপর গিয়ে পড়ে। ফজল হাসতে হাসতে বলে, 'তোকে আমার এত ভালো লাগে না, ইচ্ছে করে, তোর সব তেলটুকু বের করে নিই।'

রজ্জি বলে, 'তা ইচ্ছে তো করবেই। জাতে তেলী তো, মেয়েমানুষকে খৈল ছাড়া আর কি ভাববে! হুঁঃ!' রজ্জি বেশ ক্ষুব্ধ।

ফজল ঘাবড়ে যায়, 'রেগে গেলি? সত্যিই লেগেছে না-কি? খুব জোরে

চেপে ধরেছিলাম ?' ফজল অনুনয় করতে থাকে, 'ত্যাখ, আমি তোর জন্যে কি এনেছি !'

রঞ্জি তার দিকে তাকায় না।

'আসলি মিসরী মকাই ! এক্ষুনি আগুনে পুড়িয়ে তোকে খাওয়াচ্ছি ত্যাখ না !'

রঞ্জি এক ঝাপটায় তার হাত থেকে ভুট্টা কেড়ে নেয়। বলে, 'কোত্থেকে আনলে —আবার চুরি করেছ ? তোমার ক্ষেতে তো মিসরী মকাই হয় না !'

ফজল হেসে বলে, 'না রঞ্জি, চুরি করা নয়। হারামী ইলমদীন হতচ্ছাড়াটা উচ্ছন্নে যাক, এক পোয়া তেল নিয়ে তবে এই মকাই দিয়েছে —তোর জন্যেই নিয়ে এলাম। তুই একবার বলেছিলি না, মিসরী মকাই খেতে ইচ্ছে করছে !'

রঞ্জি ভুট্টার পরতগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে ফজলের দিকে তাকায়। তারপর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে ছোট ছোট আঙরার ওপর রেখে দেয়, যাতে হাল্‌কা-হাল্‌কা আঁচে ভুট্টা ঠিক মতো পোড়ে। তারপর আস্তে আস্তে পেছন ফিরে ফজলের প্রশস্ত বুকে নিজেকে সমর্পণ করে, তার বুকের চুলে গাল ঘষতে শুরু করে সে।

ফজল খুশী হয়ে বলে, 'কি করছিস ? আমার সুড়সুড়ি লাগে না !'

রঞ্জি বলে, 'তাহলে হাসো।'

দু'জনেই হাসতে শুরু করে।

হাসতে হাসতে ফজল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। বলল, 'ও দিকে চেয়ে ত্যাখ।'

ফজল যে-দিকে ইশারা করল, সে দিকে তাকাল রঞ্জি। ও দিকটায় ইলমদীন নম্বরদারের তিনটি গাদা, পাশাপাশি। সেখানে হঠাৎ অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিভিয়ে দিয়ে কে যেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে জোরে জোরে দোলাচ্ছে।

রঞ্জি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার ?'

ফজল চাপা গলায় জবাব দিলো, 'বুঝতে পারছিনে। তবে ইলমদীনের গাদায় কখনও ভালো কিছু হবে, আশা করা যায় না।'

'গিয়ে আব্বাকে জাগিয়ে দিই ?'

ফজল তার হাত চেপে ধরে বলল, 'না, দাঁড়া। আগে দেখা যাক, কি হয় !'

* * *

ইলমদীনের গাদার চারদিকটা অন্ধকার। অগ্নিকুণ্ড নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় গাদাগুলোর অন্ধকার ছায়ায় ইলমদীন পুলিশের পাঁচজন সেপাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। টিকরীর দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে মশালের আলো উঁচুতে উঠে ঘনঘন কয়েকবার নড়াচড়া করে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বার তিনেক মশালের আলো চম্‌কে উঠে একেবারে হারিয়ে গেলো।

ইলমদীন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেপাইকে বলল, 'আল্লাদাদ! মনে হচ্ছে, রাজাসাহেব, জমাদার ঠাকুর কাহনসিং আর অন্যান্যরা ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁছেছেন।'

আল্লাদাদ কোনো জবাব দিলো না। সে আস্তে আস্তে লণ্ঠনের টিম্‌টিমে আলোটা বাড়িয়ে দিলো। তারপর গাদার কাছ থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে লণ্ঠনটা দোলাতে লাগল। ইলমদীন সতর্ক করে দিলো, 'একটু সাবধানে, কেউ যেন জানতে না পারে।'

আল্লাদাদ গাদার আড়ালে গিয়ে লণ্ঠন দোলাতে লাগল।

কিছুক্ষণ চারদিক একেবারে স্তব্ধ, তারপর জঙ্গলের দিক থেকে আবার মশালের আলো চম্‌কে উঠল।

'ওরাই —ঠিক ওরাই।' ইলমদীন খুশী হয়ে বলল। লালা মীরাশাহ তার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, ইলমদীন তার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'লালা, তোমার প্রাণ বেঁচে গেলো, তোমার হিস্‌সেও তুমি পেতে চলেছ। নইলে কাল না-জানি কি ঘটে যেত। এখন তো রাজাজী এসে পড়লেন।'

আর তখনই জঙ্গলে মশালের আগুন আবার চম্‌কে উঠল, শেষবারের মতো।

শেষবারের মতো আল্লাদাদ লণ্ঠন দুলিয়ে দিলো।

অন্ধকারে আবার ছেয়ে গেলো চারদিক।

ইলমদীন খুশীতে নাচতে শুরু করল।

লালা মীরাশাহের সারা শরীর কাঁপছিল। ভয়ে তার দীর্ঘ নাকে ঘাম জমছিল, তার বাঁকা নাকের ডগাটা ঘনঘন ফুলে উঠছিল। ইলমদীন তার অবস্থা দেখে বলল, 'লালা, ভয়ে কাঠ হয়ে গেলে যে! বাড়িতে গিয়ে আরামে ঘুমোও।'

মীরাশাহ যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে আল্লাদাদ জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিক দিয়ে যাবে?'

মীরাশাহ বলল, 'পশ্চিম দিক হয়ে যাব। ও দিকে কোনো গাদা নেই।'

'রাস্তায় যদি ওদের কারোর সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে বলবে, সব ঠিক আছে, বুঝলে!'

মীরাশাহ মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল। তারপর পা বাড়াল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে গাদা ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হঠাৎ তার পা পিছলে গেলো, অমনি ছোট ছোট পাথরের ওপর গড়াতে গড়াতে কয়েক ফুট নিচে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ও দিকটায় রহমানের ফসলের গাদা। রহমান চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

ইলমদীনের গলায় দম আটকে গেলো যেন। সে সজোরে আল্লাদাদের হাত চেপে ধরল। হিস্‌হিস করে বলল, 'এই শালা বেজন্মার বাচ্চা লালাটাই সব মাটি করে দিলে!'

আল্লাদাদ বলল, 'দেখো না, কি হয়!'

রহমান আবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

কিন্তু মীরাশাহ বেশ চালাকির সঙ্গেই ব্যাপারটা সামলে নিল। সে যেখানে পড়ে গিয়েছিল, সেখানেই নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। এমন নিষ্প্রভ জ্যোৎস্না যে, সব কিছু যেন মিলেমিশে একাকার দেখাচ্ছে। মীরাশাহ দম বন্ধ করে পাথরের ওপর শুয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারছিল, যদি সে না নড়ে, তাহলে তাকে একটা পাথর ছাড়া রহমানের আর কিছুই মনে হবে না।

রহমানের ছেলে বরকত মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মনে হয় কোনো জানোয়ার —পালিয়ে গেছে।'

রহমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'গেছে শুয়োরটা, যাক গে।' বলেই বাপ-বেটা দু'জনেই আবার গাদায় ঠেস দিয়ে বসল। কপাল ভালো যে ওরা মীরাশাহের দিকে পেছন ফিরে বসেছে।

মীরাশাহ কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে খুব সাবধানে হাঁটতে লাগল। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে জানোয়ারের মতো পা টিপে-টিপে। তারপর ঢালের নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রহমানের চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বলল, 'খুব ঘুম আসছে। আজকের রাতটা যদি কোনো রকমে কেটে যায়!'

বরকত বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আব্বা।'

রহমান সমানে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'গাঁয়ের পঞ্চায়েত কি বিপদে ফেললে ত্যাখ তো। রাজাজীকে ফসল দেবো না, নম্বরদারকে ফসল দেবো না, সরকারকে দেবো না, লালা মীরাশাহকে দেবো না —তো কি করে কাজ চলবে, বল দেখি!'

বরকত চুপ করে রইল।

রহমান বলল, 'পাঁচজনের সঙ্গে মদত দিতে হয়। নইলে ইমানদারির কথা বলতে গেলে, সবাইকে দিয়ে থুয়েও নিজের হিস্‌সা ভালোই থাকে।'

বরকত বলল, 'আব্বা, তোমার জমি একটু বেশী, তাই। নইলে আমাদের অবস্থাও গাঁয়ের আর সব চাষীর মতোই হতো।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাঁচজনের সঙ্গে রয়েছি বলেই। কিন্তু বাবা, সরকারের সঙ্গে লড়াই করলে ভালো হয় না, সরকারের জায়গা হলো খোদার জায়গা। আল্লা যা করে, তাই হয়। যার কপালে যেটুকু ফসল লিখে দিয়েছে, হাজার চেষ্টা করলেও তার চেয়ে বেশী এক দানাও পাবে না।'

'এটা কি তুমি ঠিক বলছ আব্বা?'

'ঠিকই বলছি। কিন্তু তোমার মতো একটাও বুদ্ধু আছে না-কি গাঁয়ে! নইলে অমন সরেস মেয়েটা তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়!'

'রজ্জির কথা বলছ ?' ক্ষুব্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল বরকত।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, না তো কি কোনো ফজ্জি-গজ্জির কথা বলছি !'

'ও রাজী হবে না আব্বা। ও ফজলকে চায়।'

'রেখে দে ও সব কথা, মেয়েমানুষ আবার কাউকে চায় না! যে ডাণ্ডার জোর দেখাতে পারে, মেয়েমানুষ তাকেই চায়। ওরা ভালোবাসে তাকৎকে, ধনদৌলতকে, ইজ্জৎকে —আর তোর কোনটা নেই বল তো ?'

'আমার তাকৎ নেই আব্বা। ও আমার চেয়ে অনেক তাগড়া। একদিন ঝরনায় পানি আনতে গিয়েছিল, আমি ওর হাত ধরেছিলাম। তা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সত্যি বলছি, আব্বা ও বেজায় মারকুটে ঘোড়ী।'

'যা বে যা!' রহমান জোরে এক ঘুষি কষাল বরকতকে। বরকত হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। রহমান বলল, 'তুই হারামজাদা কোন দুবলা ঘোড়ার পয়দা কে জানে! যদি তুই রজ্জিকে রাজী করাতে পারতিস, তাহলে নূরার সব জমিজমা আমাদেরই হয়ে যেত।'

'তা কি করে হতো আব্বা ?'

'কি করে হতো আব্বা!' রহমান মুখ ভেঙচিয়ে বলল, 'কানা, গোবর গণেশ এটুকুও বুদ্ধি নেই ঘটে! তুই যদি রজ্জিকে বশে আনতে পারতিস, তাহলে নূরার জামাই হতিস তুই। ওর বড় ছেলে গুলাম মহম্মদ খাঁ তো কোথায় পালিয়ে গেছে, আর আবদুল শহরেই থাকে, স্কুলে চাকরি করে। সে কি আর কোনোদিন এখানে চাষবাস করতে আসবে! বল, তাহলে ঐ জমি কার হতো? সব ছেড়ে দিলেও, ঐ জোলা বুড়োবুড়ী না-মরা পর্যন্ত ওদের ভাত-কাপড় তো চাই !'

বরকত তার গোল গোল চোখ দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ওঃ —এই ব্যাপার ! তা আমি আবার চেষ্টা করব আব্বা !'

'যাঃ শুয়োর, এখন আর তুই কি চেষ্টা করবি? ও তো ফজলের হয়েই গেছে! কি আর বলব তোকে; তোর মতো যদি আমার বয়স থাকত, তাহলে দেখিয়ে দিতাম, মারকুটে ঘোড়ীকে কি করে বশে আনতে হয়। এখনো কোনো চ্যাংড়ার চেয়ে কম যাইনে, হুঁ —কিন্তু কি আর বলি, ছেলেপিলের বাবা, দাড়িও পেকে ঝুনঝুনে হয়ে গেছে··· আরে, ও কে ···কে ··· আরে··· !'

কিন্তু সে আর বেশী কিছু বলতে পারল না। একটা লোক জোরে তার মুখ চেপে ধরল। অন্য একজন তার ছেলেকেও কাবু করে ফেলল। মাটিতে ফেলে তাদের মুখে কাপড় ঠুসে দিলো। তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল তাদের।

ঠাকুর কাহনসিং তার সেপাইদের বলল, 'এ-বার আগে চলো। হ্যাঁ, একদম যেন পায়ের শব্দ না হয়। লালা, তুমি রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

লালা মীরাশাহ আগে আগে হাঁটতে লাগল। জমাদার কাহনসিং তিরিশজন

সেপাই নিয়ে রাজা করম আলির চাপরাসীদের সঙ্গে হেঁটে চলেছে। সেপাইদের হাতে মশাল, কিন্তু গাঁয়ের কাছে এসে তারা সেগুলো নিভিয়ে দিয়েছে যাতে গাঁয়ের লোকেরা সাবধান হতে না পারে।

লালা মীরাশাহ যখন তার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছিল, তখনই সে দক্ষিণের ঢাল ধরে দলটিকে ওপরে আসতে দেখে। ওরা ঠিক লালার পথটা ধরেই এগিয়ে আসছিল। লালার ইচ্ছে করছিল, রাস্তা ছেড়ে সে অন্য দিকে সরে পড়ে। কিন্তু দলটা ততক্ষণে একেবারে তার কাছে এসে পড়েছে। একজন সেপাই তো আর একটু হলে তাকে সাবাড় করেই ফেলেছিল, কিন্তু ঠাকুর কাহনসিং তাকে চিনতে পারে বলে বেঁচে যায় সে। তখন লালা মীরাশাহ দেখল, আর কোনো উপায় নেই, বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝুট-ঝামেলা চুকিয়ে বাড়ি যেতে পারলেই বাঁচে, বাড়িতে দুশ্চিন্তায় নিশ্চয়ই তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার কারবারটাই এমন যে গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা বজায় রেখে চলতে হয়। এখন যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে তার অবস্থা সঙিন হয়ে দাঁড়াবে। রাজা করম আলি তো নিজের হিস্‌সা আদায় করে নিয়ে কেটে পড়বেন, আর তারপর এ দিকে তার গায়ের ছাল-চামড়া আস্ত থাকবে না। কিন্তু কি করা যায়, জায়গীরদারের কাজে সহায়তা না করলে আপদে-বিপদে কে তার পাশে এসে দাঁড়াবে? তার বীজের হিস্‌সা, সেই ধারের ওপর ধার—কাছারি থেকে কে এসে তাকে আদায় করিয়ে দেবে? সেইসব কথা ভেবেই রাজাকে সাহায্য করার জন্যে লালা মীরাশাহকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হয়েছে। ইলমদীনের গাদার কাছে পৌঁছে মীরাশাহ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, দলটাকে ইলমদীনের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে প্রস্থান করল সে।

ইতিমধ্যে ফজল সাড়া পেয়েছিল! ইলমদীনের গাদা থেকে দক্ষিণে লণ্ঠনের ইসারা করাটা লক্ষ্য করেছিল। সে জোরে রজ্জির হাত চেপে ধরে বলল, 'কেউ নিশ্চয়ই গণ্ডগোল পাকাচ্ছে রজ্জি।'

রজ্জি বলল, 'তাহলে চলো, গাঁয়ের লোককে জাগিয়ে দিই।'

'এখন জাগিয়ে দিয়ে কি হবে! কি করতে যাচ্ছে ওরা, আগে জেনে নিই। তুই এখানেই থাক। আমি দক্ষিণের ঢালে গিয়ে দেখে আসি।'

'আমি তোমায় একা যেতে দেবো না।'

ফজল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর সে রজ্জির হাত ধরে বলল, 'তবে আয়, দেখে আসি।'

নূরার গাদা দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা তাকে জাগিয়ে দিলো। তারপর দু'জনে নিচে নেমে গেলো। এগিয়ে যাওয়ার পথে বালকরাম ব্রাহ্মণকেও সাবধান করে দিলো তারা। সেখান থেকে ওরা দু'জন আরও নিচে নেমে গেলো যেখানে সফেদার তিনটি গাছের পাশ দিয়ে দক্ষিণের রাস্তাটা ঘুরে গাঁয়ের ভেতরে গেছে।

রঙ্জির পায়ে লেগে একটা পাথর নিচে গড়িয়ে পড়ল। পাথরটা সশব্দে একটা ঝোপের দিকে চলে গেলো। সে দিক থেকে একটা ঘোড়ার চিঁ-হি-হি ডাক এল। অমনি ফজল আর রঙ্জি দ্রুত বালকরামের ক্ষেতে মকাইয়ের ডাঁটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কারণ দলটা তখন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তে দলের মধ্যে কে যেন বন্দুক তুলল, সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা চওড়া লোক, ঐ লোকটাই সম্ভবত জমাদার ঠাকুর কাহনসিং, হাত তুলে তাকে গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করল। তারপর দলটা সামনে এগিয়ে যেতে লাগল।

রঙ্জি জিজ্ঞেস করল, 'ঐ আগে দুব্‌লা-পাতলা লম্বা মতো লোকটা কে?'

ফজল তার মা-র উদ্দেশে খিস্তি দিয়ে বলল, 'আমাদের গাঁয়ের সাহুকার (বেনে) মনে হচ্ছে রঙ্জি। সব পণ্ড হয়ে গেছে।'

'আর ঐ ঘোড়ায় চড়ে আছে যে লোকটা, ও কে?' রঙ্জি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কে জানে কে, এত দূর থেকে মুখখানা ঠিক চিনতে পারছিনে। কিন্তু এ দিকে আমাদের লোকজনও দেখছিনে। আয়, গাদায় গিয়ে ওদের একটু খবর দিয়ে দিই, গাঁয়ের আর সব লোকজনকে ডেকে আনবে।'

কিন্তু যখন ফজল আর রঙ্জি হাঁপাতে হাঁপাতে নিজেদের গাদায় এসে পৌছাল, ততক্ষণে দলটা ইলমদীনের গাদায় এসে পৌছে গেছে, তার অন্ধকার গাদায় মশালের আলো জ্বলছে। তিরিশ-চল্লিশজন লোক ভুট্টা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে আশ-পাশের গাদায় চাষীদের বন্দুক দেখিয়ে তাদের দড়ি দিয়ে বাঁধছে। ফজল হাঁক ছেড়ে গাঁয়ের লোকদের ডাকতে শুরু করল, কিন্তু যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে তখন। তার গাদাটাও চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। এ দিকে বালকরাম, নূরা, ফজল, দিলদার, নবীবক্স ও অন্যান্য দু'একজন চাষী আত্মরক্ষার জন্যে আশপাশের গাদা থেকে এসে একজোট হয়ে দাঁড়াল। সেপাইদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল তারা। কিন্তু তখন সেপাইরা বন্দুক নিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

ফজল একটা পাথর তুলে ছুঁড়তে যাচ্ছিল, অমনি জমাদার ঠাকুর কাহনসিংয়ের গলার আওয়াজ শোনা গেলো, 'খবরদার, যদি কেউ পাথর ছোড়ে, তাহলে গুলিতে তার বুক ঝাঁজরা করে দেবো।'

রঙ্জি ফজলের হাতে চেপে ধরে তাকে থামাল। সেপাইরা মশাল নিয়ে আরও কাছে চলে এল। ঘোড়ার পিঠে বসে ছিল একজন মাঝবয়সী লোক, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, চওড়া চোয়াল, থ্যাবড়া নাকের ডগা, গালের হাড়গুলো যেন ভেতরে ঢুকে গেছে, ছোট্ট কপালে মোটা ভুরু জোড়া যেন ধনুকের মতো বাঁকানো। লোকটার পরনে যোধপুরী কোট আর খাকী রঙের বিরজস। কোটের ওপর চামড়ার বেল্টে রিভলবার আর কার্তুজ। জমাদার ঠাকুর কাহনসিং চিৎকার করে বলল, 'রাজাসাহেব এসেছেন। হারামজাদারা, সালাম কর।'

ফজলের হাতে পাথর ছিল, রাজাসাহেবের নাম শুনেই সে সেই অবস্থাতেই মাটির দিকে মাথা নোয়ালো, যেমন শত শত বছর ধরে তার বাবা, বাবার থেকে শুরু করে প্র-প্র-প্রপিতামহেরা চিরকাল মাথা নুইয়ে আসছে। এই সালাম কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। ফজল বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও সেই ধারা তার রক্তের মধ্যে বহমান।

জমাদ্বার ঠাকুর কাহনসিং তাকে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ওঃ, তুই সেপাইদের ওপর পাথর ছুঁড়ছিলি!'

ফজলের ভীষণ রাগ হলো। সে জমাদারের মুখের ওপর এক জোর ঘুষি চালাল। ঘুষি খেয়ে ঠাকুর কাহনসিং পাক খেয়ে তিন গজ দূরে ছিটকে পড়ল।

আল্লাদাদ রিভলবারে হাত দিলো, ঠিক সেই সময় রজ্জি, এতক্ষণ পেছনে তার বাবার পিঠের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরে ফজলের সামনে এসে দাঁড়াল। মশালের তীব্র আলোয় তার মুখখানা ডালিম ফুলের মতো দেখাচ্ছিল।

'আহা, ওটা কে?' রাজা করম আলির পাতলা দীঘল ঠোঁট দুটোয় ভোগ-বিলাসের বাসনা ফুটে উঠল। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রজ্জির সামনে এগিয়ে এলেন। সেপাইরা সবাই পেছনে সরে দাঁড়াল।

'তোমার নাম কি সুন্দরী?'

ফজল রজ্জিকে সামনে থেকে পেছনে ঠেলে দিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল।

নূরা এগিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বলল, 'সরকার! হুজুর মা-বাপ! ও আমার মেয়ে, ওর নাম রজ্জি।'

'রজ্জিকে একটু সামনে নিয়ে এস না!'

ফজল রজ্জির সামনে দাঁড়িয়ে!

সেপাইরা ফজলকে ধরে দূরে ঠেলে দিলো। ফজল সেপাইদের সঙ্গে লড়াই শুরু করল, কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক, আর সে একা। দু' একজনের চোয়াল ভেঙে যাওয়ার পর অবশেষে ওরা ফজলকে কাবু করে ফেলল। এ-বারে তাকে আর ছেড়ে দিলো না।

রজ্জি এখন রাজা করম আলির সামনে। তার চোখে যেন আগুন ধক্‌ধক করছে।

রাজাজী হেসে বললেন, 'বাঃ বাঃ, এ যে গোলাপ ফুল! এমন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে কেন ও?'

জমাদার ঠাকুর কাহনসিং সামনে এগিয়ে এসে মাথা হেঁট করে বলল, 'হুজুরের কৃপা হলে…'

নূরা চিৎকার করে উঠল, 'না না …হুজুর, ও আমার মেয়ে।'

বালকরাম জোরে চিৎকার করে বলল, 'না …না …নিষ্পাপ কুমারী ও, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে।'

'না ···না ···হারামজাদা ···শুয়োরের বাচ্চা ···আমি বেঁচে থাকতে তুমি আমার রজ্জিকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

রাজা করম আলি সেপাইদের চোখে ইশারা করলেন। তারা রজ্জিকে ধরে ফেলল। রজ্জি চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। ঘুষি চালাল, সেপাইদের চোখ-মুখ খামচে দিলো, তাদের হাত থেকে বারবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, কিন্তু কতদূর কি করতে পারে সে! সেপাইরা তাকে কাঁধে তুলে নিল।

রাজা করম আলি মুচকি হেসে বলল, 'এমন খুবসুরৎ ফুল আমার শোবার ঘরে ফুলদানীর শোভা বাড়াবে। ঠাকুরজী, চলো তাঁবুতে ফিরে যাই।'

নূরা রাজাজীর পা জড়িয়ে ধরল, 'হুজুর মা-বাপ, আমার সরকার! ও আমার মেয়ে, ওর ইজ্জৎ নষ্ট করবেন না হুজুর। আমার সাদা দাড়ি দেখুন, আমি বেঁচে থেকেও মরে যাব। কোরানের কসম আপনাকে, পীর শাহমুরাদের কসম··· রাজাজী···'

রাজাজী পা ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে এমন জাপটে ধরেছে যে এতটুকু আল্‌গা হওয়ার নাম করছে না, সমানে চিৎকার করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত যখন সে কোরানের দোহাই পাড়ল, তখন তিনি আর রাগ সামলাতে পারলেন না। রিভলবার বার করে নূরার বুকে দু'তিনটি গুলি ছুঁড়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিলেন তাকে।

ফজল জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'খুন! খুন! খুন! পুলিশ! পুলিশ!'

আল্লাদাদ ও পুলিশের অন্যান্য সেপাইরা সচকিত হয়ে উঠল। একজন সেপাই ফজলের মাথায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করতেই সে বেহুঁশ হয়ে নূরার লাশের পাশেই পড়ে গেলো।

রাজা করম আলি বেল্টে রিভলবার রাখতে রাখতে বললেন, 'আহাম্মুক চাষা কোথাকার, জংলী ভূত, কোরান নিয়ে আসে মাঝখানে!'

ঠাকুর কাহনসিং বলল, 'হুজুর, তাঁবুতে পদধূলি দিন, আরাম করুন। রাত অনেক হয়ে গেছে। বাকি সব ব্যবস্থা কাল সকালেই হয়ে যাবে।'

ফজল অগ্নিকুণ্ডের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। মিসরী ভুট্টা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিভে গেছে, কিন্তু রাত্রি এখনও তরুণ··· কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি রাত্রি তরুণ? এখান থেকে এমন দেশ খুব কাছেই, যেখানে সত্যি-সত্যিই রাত্রি তরুণ, কারণ তাদের নিজেদের জমি রয়েছে, নিজেদের কারখানা রয়েছে, নিজেদের শাসন রয়েছে, আর পুলিশ-ফৌজ —ঘাসকুটো থেকে লোহার একটা পেরেক পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু তাদের নিজেদের —ওরা এখান থেকে কত কাছে রয়েছে, যেন এক বাড়িতেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে তারা···

কিন্তু টিকরী শাহমুরাদে রাত্রি তরুণ নয়। এখানকার রাত্রি বৃদ্ধা, শত শত বছরের পুরনো, জীর্ণ —ধনুকের মতো বেঁকে-যাওয়া শোকার্ত মুখ যেন এই দীর্ঘ

রাত্রি। কিন্তু এই রাতের বুকেও মায়া-মমতার ব্যথা, সস্নেহ অবসন্নতা। এই অন্ধকার রাত্রি অরণ্যের লক্ষ লক্ষ পাতার বিষণ্ণ সঙ্গীত এবং বড় বড় পাথর ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর বিদ্যুতের ভয় নিয়ে ফজলের শিয়রে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

ফজল অজ্ঞান। রাত্রি গভীর, বৃদ্ধা, অবসন্ন, পুরনো। নক্ষত্রেরা হাঁপাচ্ছে। আর চারদিকে এমন এক অন্তহীন স্তব্ধতা যেন আকাশ পর্যন্ত ভয়ে আশঙ্কায় হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকেছে···

*　　　*　　　*

লালা মীরাশাহ যখন দলটাকে ইলমদীন নম্বরদারের গাদায় পৌঁছিয়ে দিয়ে নির্জন রাত্রিতে একা বিদায় নিল, তখন তার বুকটা ভীষণ দুরদুর করছিল। এমনিতে সে বেজায় ভীতু। জায়গীরদারের লোককে সে যে সহায়তা করতে চায় না —ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। মনেপ্রাণে সে রাজা করম আলি, ঠাকুর কাহনসিং ও সরকারী কর্মচারীদের পক্ষেই। বাস্তবিক, মূর্খ অসভ্য চাষীদের এত বড় এলাকায় ওরাই তার যথার্থ বন্ধু। ওদেরই কাছারীতে গিয়ে সে নিজের পাই-পয়সা সুদ আদায় করে, ঋণগ্রস্ত চাষীর জমি ক্রোক করিয়ে নেয়। ওরা এসে পাশে না দাঁড়ালে ওর পক্ষে এখানে দু'দিনও টিঁকে থাকা দুষ্কর।

কিন্তু এই সব চাষীদের সঙ্গেই তো আমার দিনরাত কাজ-কারবার —লালা মীরাশাহ মনে মনে বলে। চাষীদের গাদাগুলো ছাড়িয়ে দক্ষিণের টিবিটার ঢাল বেয়ে নিচে নামতে থাকে সে। সামনে একটা ছোট নালা বইছে, সেটা পার হওয়ার জন্যে সে তার মেটে রঙের গুরগাবী জুতো খুলে বগলে নিয়ে নেয়। গোড়ালি পর্যন্ত জল, কনকনে ঠাণ্ডা। বিশেষ করে, এই মাঝরাত্তিরে ছুঁচের মতো পায়ে বিঁধছে যেন।

কেমন বেজন্মার জীবন কাটাতে হচ্ছে আমায়! —লালা মীরাশাহ সাবধানে জলে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গ না দিলে কারবারের নামে হাত ধুতে হয়, আবার এ দিকে চাষীরা জানতে পারলে গায়ের ছাল-চামড়া খুলে নেবে। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ —জুতো মারো মহাজনী কারবারের মুখে!'

নালা পার হয়ে সে আবার মেটে রঙের গুরগাবী জোড়া পরে নিল। তার সেই দিনটির কথা মনে পড়ল, যে দিন সে চকওয়ালের ভোনৃগাঁ থেকে প্রথম কাশ্মীরের সীমান্ত পেরিয়ে আসে। গাধার পিঠে নুনের বস্তা চাপিয়ে বিক্রি করে বেড়াত প্রথমে। বেশ ভালো দামেই নুন বিক্রি হয়ে যেত, গাধার পিঠ খালি হয়ে যেত একেবারে। পথে যেখানে সন্ধ্যে নামত, সেখানেই আস্তানা গাড়ত সে। গাধার গদি-পালান মাথায় দিয়ে গাধার পাশেই শুয়ে পড়ত, খুব শীত পড়লে সেই গদি-পালানই গায়ে দিয়ে ঘুমোত। সকালে উঠে আবার ডেরার দিকে রওনা হতো। কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার জীবন ছিল! সপ্তাহে ছ'দিন স্নান করত না, আর জামা-কাপড় না ছিঁড়ে গেলে পাল্টানোর প্রশ্নই উঠত না। মাঝে মাঝে এমন

হতো যে, প্রথমে জামাটা ছিঁড়ত, জামা ছিঁড়লে নতুন জামা কিনে পরত। দু'তিন মাস পরে হয়ত পায়জামাটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়ল হাঁটু থেকে। তখন নতুন পায়জামার ওপরে সেই পুরনো জামা গায়ে দিয়েই খোশ মেজাজে চম্না গাইতে গাইতে গাধা হাঁকাত আর মাথা থেকে উকুন বেছে বেছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলত।

লালা মীরাশাহ তার বিগত যৌবনের ভবঘুরে দিনগুলির কথা ভেবে হাসল। হ্যাঁ, সত্যিই সে জীবনে খুব উন্নতি করেছে। এখন সে হর-হামেশাই সাফ-সুতরো জামা-কাপড় পরে। থান কাপড়ের জামা-পায়জামা, মাথায় পাগড়ি। এখানকার সবচেয়ে বড় মহাজন সে। টিকরী শাহমুরাদ, রঙ্গপুর, ঝঙ্গড় আর বরিয়ানীর বহু চাষীই তার খাতক। সর্বত্র তার জমিজমা ছড়িয়ে আছে। টিকরীর দক্ষিণের চড়াইয়ে ঢিবিটার ওপর তার বাড়ি। অন্যদের বাড়িঘর থেকে একটু দূরে। পাথরের দেওয়াল, টিনের চাল, আট ক্রোশ দূর থেকেও ঝকঝকে দেখায়। একদিন সে নুন বিক্রি করতে করতে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। কে যেন বলেছিল, এখানে নস্যির খুব চাহিদা। পরের বারে সে নুনের সঙ্গে এক কৌটো নস্যিও নিয়ে এসেছিল। টিনের দাম নিয়েছিল বারো টাকা, তাতে লাভ হয়েছিল পঁচাত্তর টাকা। তারপর থেকে সে নুন কম আনে, নস্যি আনে বেশী করে। পরের বছর সে সুতী কাপড় আনল, চুড়ি আনল। ইলমদীন নম্বরদার তাকে দক্ষিণের এই ঢিবিটায় —যেখানে এখন তার ঘরবাড়ি, বিশ দামে দোকান করতে দিলো। এখানে সে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বানিয়ে নিল। তারপর বানাল মাটির বাড়ি। পোঠোহার থেকে গোমতীকে বিয়ে করে আনল। আজ গোমতীর চার ছেলে, নীল পাথর দিয়ে তৈরী বাড়ি, বাড়ির চারপাশে বাগান, গাঁয়ে গাঁয়ে কত চাষী তার খাতক। তার জমিতেই আজকাল শত শত জনমজুর চাষাবাদ করে। এখন সে আর মীরু গাধাওয়ালা নয়, লালা মীরাশাহ সাহুকার, টিকরী শাহমুরাদের ধনকুবের, কেতাদুরস্ত, জায়গীরদার সাহেবের অমাত্য। মুখে মধু পেটে বিষ, এটাই তার স্বভাব। চেহারাটা দেখতে গোখরো সাপের মতো! দুবলা-পাতলা, লম্বা সিড়িঙ্গে, মাথায় একটা ইয়া বড় পাগড়ি, গোখরো ফণা তুলে আছে বলে মনে হয়। কিন্তু মুখে কি মধুর মধুর বাক্যি, আর তেমনি তোষামুদে। ওর নিয়ম হচ্ছে, খাতককে চার খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখো, প্রাণে মেরো না, খাবারটা আস্তে আস্তে কমাতে থাকো, এ দিকে তোমার জাল মজবুত করো, ক্রমশ ফণা ওপরে তোলো, ফসলে নিজের অংশ বাড়াতে বাড়াতে, সুদের ওপর সুদ কষতে কষতে এগিয়ে চলো। তারপর চাষীটা একদিন নিজেই এসে বলবে, 'লালা, আমার জমিটা নিয়ে নাও, নইলে বিষ খেয়ে মরতে হবে আমায়।'

আর লালা তো ঋণ দিয়ে বছরের পর বছর ধরে এরই প্রতীক্ষা করতে থাকে। মুচকি হেসে বলে, 'আরে, জমি তো তোর —ফজ্‌লা, করিমা কিংবা সৈফা— আমি জমি নিয়ে কি করব, আমার পাওনাটা আগে। যদি পারিস, আমার পাওনা-

গণ্ডা মিটিয়ে দে বাপু, ও জমি নিয়ে আমার কি হবে? এ-বার জমিতে ফসলটাই বা কি হয়েছে, কত আর দাম হবে তার —জানিনে বাপু, জমির যে কি হাল হচ্ছে, দিন দিন দাম পড়ে যাচ্ছে। এই সাত বছরে তুই একা আড়াই শো টাকার বীজ নিয়েছিস, পঞ্চাশ টাকার নস্যি, রাম তোর ভালো করুক, দু'আড়াই শো টাকার কাপড়-চোপড়ও হবে, তোর আব্বার কাফন-দাফনের জন্যে পঞ্চাশ টাকার ওপর নিয়েছিলি —যদি বলিস, পুরো হিসেবটাই দেখিয়ে দিচ্ছি।'

আর বেচারা ফজল কিংবা করিমবক্স কিংবা সৈফুদ্দিন দারুণ ভয় পেয়ে বলে, 'না লালা, এখন আর হিসেব করে কি হবে, বলো কোথায় বুড়ো আঙুলের ছাপ দেবো। তোমার বাক্যি কি আর অবিশ্বাস করতে পারি!'

আর, 'বাক্যি' ভারি ভালো জিনিস। চাষীর জীবন এই বাক্য অবলম্বন করেই টিঁকে আছে, যা বলে তা করে, মুখ দিয়ে যে-কথা বেরোয়, প্রাণপণে তা রক্ষা করে। এ সব চাষী মূর্খ গোঁয়ার, কিন্তু তাদের জীবনের ধর্ম হলো ইমানদারী। লালা মীরাশাহের কথাকেও তারা বেদবাক্য বলে মনে করে, আর এই দোষেই তারা মরে। বাক্যই যে ভগবান, দেবতা, পুণ্য, সৌন্দর্য, সাধনা ও মানবতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাক্যই ভালোবাসার প্রথম চুম্বন, সূর্যের সোনা আর সরোবরের নীলিমা। বাক্যই বিশ্বাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর দেবতার মতো পবিত্র। বাক্যই জীবন, ভালোবাসা, সাহচর্য। বাক্যই হ্যামলেটের শ্বাস-প্রশ্বাস, বিটোফেনের সঙ্গীত, শকুন্তলার কটাক্ষ। বাক্যই শক্তি, শান্তি, কর্ম, সমুদ্রতরঙ্গ ও ঐতিহাসিক বিপ্লব।

কিন্তু বাক্য শুধু শান্তি নয়, যুদ্ধও; শুধু পুণ্য নয়, পাপ, বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা, ঈর্ষা ও অন্ধ প্রতিশোধস্পৃহাও। বাক্য কাছারি ও মিথ্যাভাষণ। বাক্য কালিমা, মৃত্যু ও অন্তহীন অন্ধকার। বাক্য পুঁজিপতির হাসি, অনাথ শিশুর কান্না এবং ঐতিহাসিক বিদ্রোহ। সে কাহিনীর শবদেহ সঙ্গীতের শবাচ্ছাদন, কবিতার কবর। বাক্য শুধু শ্রম নয়, শোষণও; শুধু কৃষক নয় মীরাশাহও।

কিন্তু প্রাচীন ও দাসত্বের যুগের চাষীরা বাক্যকে পরম শ্রদ্ধেয় বলে মনে করে। লালা মীরাশাহ সেই শ্রদ্ধা থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। সে চাষীকে দিয়ে তার কলম ছুঁইয়ে নেয়, তারপর খাতায় চাষীর কর্জ লেখে। নিজের খেয়ালখুশী মতোই লেখে। আর একবার যা খাতায় লেখা হয়ে যায়, তাই বাক্য, অতএব সেটাই ধর্ম —আর সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া চাষীর পক্ষে গর্হিত অপরাধ। যদি কোনো চাষী সেই বাক্য লঙ্ঘন করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তার মুক্তির কোনো আশা নেই। এ সংসারে চাষী তার নিজের জীবন ছারখার করতে পারে, কিন্তু নিজের মোক্ষ সে জলাঞ্জলি দেয় কি করে! তাই জমি তো মীরাশাহের হাতে আসেই, সেইসঙ্গে ভালো জাতের মোষটাও, দু'জোড়া ছাগলও। তারপর ভগবান যা করবেন! ইজ্জৎ তো বেঁচে গেলো, সেটাই কি কম কথা!

এই ইজ্জৎ কি বস্তু, কে জানে। লালা মীরাশাহ টিবির চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ভাবে। চাষী তার জমিজমা, বলদ-গরু, ছাগল-ভেড়া এমন কি স্ত্রীর নাকের নোলক পর্যন্ত বন্ধক রাখে ইজ্জতের জন্যে, ইজ্জৎ সে রক্ষা করবেই। এই ইজ্জৎ নিশ্চয়ই এক আজব বস্তু, তাই এর জন্যে মানুষ এত কিছু বিসর্জন দেয়! এ কথা ভাবতে ভাবতেই স্ত্রী গোমতীর কথা মনে পড়ে তার —চার ছেলের মা হয়েও গোমতী বেশ সুন্দরী, সব সময় সেজেগুজে থাকে, হর-হামেশা তার ওপর চোটপাট করে। আগে তো সে এমন ছিল না, কেমন লাজুক লাজুক কনে-বউটি! কেমন মিষ্টি-মিষ্টি চোখে তার দিকে তাকাত, কি চমৎকার দিন ছিল সে সব! মীরাশাহ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে শুরু করে —ভাবতে ভাবতে সেই দিনটির কথা মনে পড়ে তার, যে-দিন তহশিলদার সাহেব রঙপুরের জমির মামলার রায় দিলেন তার পক্ষেই। তহশিলদার সাহেব গ্রাম পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং তার বাড়িতেই উঠেছিলেন। তারপর থেকে বড় অফিসার যিনিই আসেন, তার বাড়িতেই ওঠেন। এখন গোমতীর চার ছেলে, কিন্তু মীরাশাহ জানে না, কেন সে এত নির্ভয় আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সব সময় সকলের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করে, অফিসারদের সঙ্গে হেসে হেসে কথাবার্তা বলে। দারোগা হসমত আল্লাবেগকে তো দশ-পনেরো দিন অন্তর কোনো-না-কোনো ব্যাপারে টিকরী শাহমুরাদে আসতেই হয়। হসমত আল্লাবেগ সৈয়দপুর থানা থেকে বিশ ক্রোশ রাস্তার মাঠ-ঘাট ভেঙে এখানে আসেন। কখনো কখনো হাসতে হাসতে বলেন, 'লালা, তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো বড় বদমাশ। মাসে অন্তত দু'একবার এখানে টেনে এনে আমাকে তোমার অতিথি না করে ছাড়ে না।'

লালা হাত জোড় করে বলে, 'হুজুর, আপনারই তো বাড়ি!'

গোমতী হেসে কুটিকুটি হয়। মীরাশাহকে বলে, 'আচ্ছা, এখন গিয়ে কোনো আসামীর ঘর থেকে মুরগি নিয়ে এস। দারোগা সাহেব এসেছেন, ওনার খাতির-যত্ন ভালো করে করতে হবে তো —দৌড়ে যাও, এখানে পেঁচার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখে দেখছ কি?'

মীরাশাহ গোমতীর ধানী রঙের মিহি দোপাট্টার আঁচলের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চলে যায় সেখান থেকে। যেতে যেতে সে হসমত ও গোমতীর যৌথ হাসি শুনতে পায়। ভাবে, এ রকম যৌথ হাসি না হলেই ভালো হতো! কিন্তু হায়… এ জগতে কার ভাগ্যে সব কিছু জোটে!

লালা মীরাশাহ এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দরজার কাছে এসে পৌছাল। কাঠের ফটক খুলে ভেতরে ঢুকতেই খোবানির গাছে বাঁধা ঘোড়ার চিঁ-হি-হি ডাক কানে এল। ওহো, হসমতটা আবার এসেছে! লালা মীরাশাহ ভুরু কোঁচকালো। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বারান্দার সিঁড়িতে হোঁচট খেলো। পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল কোনো রকমে।

কে একজন জোরে হাঁক দিলো, 'কে ?'

লালা মীরাশাহ গর্জে উঠল, 'তুই কে ?'

'আরে, দেখতে পাচ্ছিসনে আমি দারোগা সাহেবের সেপাই —কে তুই ?'

'আমি লালা।'

'ওহো ! লালা, তুমি ! —লালা !' সেপাইটা হাসতে লাগল, 'মাফ করবেন লালাজী মহারাজ ! আমি আগে কখনও আপনাকে দেখিনি কি-না। নাম শুনেছি খুব। আচ্ছা, তাহলে আপনিই লালা মীরাশাহ —লালা মীরাশাহ —ও ভাই, দেখো' —সেপাইটা গলা তুলে অন্য সেপাইদের ডেকে বলল, 'একটু দেখো ভাই, লালা মীরাশাহ যাচ্ছেন।'

অন্ধকারে তার চারদিকে অনেকগুলি মুখ এসে জড়ো হলো। ওদের গরম নিশ্বাস, সশব্দ হাসি, হাসির মধ্যে লুকানো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ আঁচড় অনুভব করছিল লালা। ওরা তাকে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে খুব হাসছে —ইচ্ছে করেই তাকে ভেতরে যেতে দিচ্ছে না, একনাগাড়ে শুধু জোরে জোরে হেসেই চলেছে।

লালা মীরাশাহ বলল, 'আচ্ছা, এখন আমায় ভেতরে যেতে দাও তো।'

'ভেতরে গিয়ে কি করবেন শাহজী ! আপনার শাহনী তো এতক্ষণ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে !'

কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা লালাজী, গাদায় চাষীদের খবর কি ? গুলি চলার আওয়াজ শুনলাম যেন !'

লালা মীরাশাহ বলল, 'আমিও শুনেছি। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম যে !'

'রাজা সাহেব আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন —সাহায্য দরকার। হয়ত কাল সকালেই চাষীরা দাঙ্গা বাধাতে পারে ! এ-বার একটু ডাণ্ডা ঘোরানোর মজা পাওয়া যাবে। ক'মাস ধরে কারোর মুণ্ডু ওড়ানোর সুযোগই ঘটেনি —বেকার পড়ে পড়ে শুধু সরকারের অন্ন ধ্বংস করছি।'

এমন সময় একজন সেপাই বলল, 'আরে ভাই, লালাকে ভেতরে যেতে দাও। বেচারা গরিব বাইরে থেকে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, রাতও অর্ধেকের ওপর হয়ে গেলো, এখন একটু আরাম করতে দাও ওকে।'

'আসসালামো আলায়কুম, শাহজী !' বাইরের বৈঠকখানার দরজাতেই হসমতের সঙ্গে লালা মীরাশাহের দেখা হলো।

দু'হাত জোড় করল সে।

হসমত বলল, 'শাহনী কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে আছে। আজকের হাঙ্গামার ভয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে আমি বেচারীকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। যাও যাও, ভেতরে যাও —বেচারিকে মুখখানা দেখাও অন্তত।'

ভেতরের ঘরে পা দিতেই লালা মীরাশাহ দেখল, চার ছেলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে,

আর খাটের ওপর গোমতী আপাদমস্তক সেজেগুজে অবসন্ন দেহে পড়ে আছে। মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে।

লালা মীরাশাহকে খাটের কাছে এগিয়ে আসতে দেখেই গোমতী বলল, 'মাথায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।' কথাটা বলেই সে লালার দিকে পিঠ করে পাশ ফিরে শুলো।

লালা মীরাশাহ আর এক পা এগোল। একটা শক্ত জিনিসে পায়ে ঠোকা লাগল যেন। জিনিসটা তুলে দেখল, হসমতের রিভলবার। সে অনেকক্ষণ রিভলবারটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। বাইরের বৈঠকখানায় হসমত তখনও ঘুমোয়নি। লালা মীরাশাহ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কত ভাবাবেগের আলোড়ন খেলে গেলো তার মনে। শেষে নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধু বলল, 'এই যে, আপনার রিভলবার!'

* * *

বিছানায় শুয়ে শুয়ে লালা মীরাশাহ ভাবে, ঐ রিভলবারটা —হ্যাঁ, ওটা বড় কাজের জিনিস —ওটা দিয়ে নিজের কানের কাছে তাক করে দিব্যি মাথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায়। ওটার এক গুলিতে গোমতীর বুকটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেওয়া যায়। ওটা দিয়ে হসমতের মত্তপ হাসি চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। অথচ আজ সেই রিভলবারটায় তার কোনো কাজ হলো না, কখনও হয়নি—হাজারটা উপায় থাকা সত্ত্বেও। ঐ তো তার স্ত্রী শুয়ে রয়েছে ···দারোগাটা মাসে দু'বার এখানে আসে ···সব কিছুই ঘটতে পারে —তা সত্ত্বেও কিচ্ছু ঘটে না—জমিজমা, ঘোড়া, মুরগি, ছাগল-ভেড়া, জনমুনিষ, মামলা-মোকদ্দমা, টাকা সব কিছু বেড়েই চলেছে, অথচ মনের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটে চলেছে যে একদিন সে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। শুধু গোমতী আর এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত মত্তপ হাসি থাকবে। লালা মীরাশাহের কানের ভেতর ব্যথা করতে থাকে, কান ভোঁ-ভোঁ করছে, মাথায় যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে ক্রমশ, ভেতরটা কি রকম পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে, আর সে চোখের সামনে দেখতে পায়, সে আবার 'মীরু গাধাওয়ালা' হয়ে গেছে, নুন বোঝাই গাধা নিয়ে 'চন্না' গাইতে গাইতে একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে। তার জামা-কাপড় ময়লা, মাথায় উকুন আর ঠোঁটে মেহনতের চিরন্তন হাসি।

লালা মীরাশাহ হঠাৎ হকচকিয়ে বলে ওঠে, 'না···না ···সে মরে গেছে। এখন আমি লালা মীরাশাহ, সে আর কখনও চকওয়ালের ভোন্‌গাঁয়ে ফিরে যাবে না। এখন আমি এখানকার সমস্ত জমি ক্রোক করে নেব। জায়গীরদারকেও আমার খাতক বানিয়ে ছাড়ব। আর, তারপর ···তারপর ···তারপর ···একদিন হসমতকে জুতো মারব।

বাইরে সেপাইরা কে জানে কি কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে। লালা মীরাশাহ তার শোবার ঘরের জানালা বন্ধ করে দেয়। গোমতী রাগে চিৎকার

করে ওঠে, 'দেখতে পাচ্ছ না, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে —তার ওপর তুমি আবার খুটখাট শুরু করেছে ! ঘুমোতে হয় ঘুমোও, নইলে বারান্দায় গিয়ে পড়ে থাকো —আমায় বিরক্ত কোরো না।'

লালা রাগে জ্বলতে জ্বলতে বিছানায় উঠে বসে। তারপর খাট থেকে বিছানাপত্তর তুলে নিয়ে বারান্দায় চলে যায়। তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেই সেপাইরা হা-হা করে হেসে ওঠে।

রওনক জিজ্ঞেস করে, 'শাহনীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেলো না-কি ইয়ার ?'

গুলাম সাবর বলে, 'আরে ভাই, লালা তো একটা গরু।'

সওকত বলে, 'তা নয় তো কি ! আর কেউ হলে কবে তাকে খাস-তালুক থেকে মেরে-ধরে বার করে দিত। কিন্তু ব্যাপারটা তো বোঝো, শাহনীর ফন্দী-ফিকিরে ওর ভাগ্যের তারা ডগ্‌মগ করছে। আর জানো তো, শাহনী কি রকম চালাক-চতুর ! খোদা যেমন রূপ দিয়েছে, তেমনি গুণও দিয়েছে। আরে ব্যস, দেখলেই লোকের মাথা ঘুরে যায়, কথা শুনলেই আক্কেল উড়ে যায়। লালা, খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাও। তোমার ভাগ্যে এমন স্ত্রী জুটেছে, এলাকার সব অফিসারকে যে সামলাচ্ছে। মন দিয়ে সব্বার অতিথিসেবা করে যাচ্ছে। তা না হলে, কোনো বুদ্ধু মেয়েমানুষ হতো যদি, তোমার খোজা ঘোড়া কবে বসে পড়ত।'

সওকত রামপুরের পাঠান। সেখানে খুন করে পালিয়ে আসে। এখানে এসে জায়গীরদারের খাস সেনাদলে ভর্তি হয়। ব্যাপারটা যেমন গোপনীয় তেমনি বিপজ্জনকও। কিন্তু ওর মধ্যে একটা বিশেষ গুণ আছে, তাই জায়গীরদার সাহেব এখনও পর্যন্ত তাকে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেয়নি। খুন-জখমে সওকতের ভীষণ শখ। এমন হাত-সাফাইয়ের সঙ্গে নাড়িভুঁড়ি বার করে দেয় যে, পাকা চাকুমারের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়। তেমনি সে মানুষের মাথা উড়িয়ে দিতেও সিদ্ধহস্ত। কুড়ুল কিংবা বর্শার এক কোপেই মাথাটা এমন উড়িয়ে দেয়, ঠিক যেন এক থাপ্পড়ে ভুট্টার বোঁটা খসে যায় গাছ থেকে। ও সব কাজ সে হাসতে হাসতেই করে, আর তারপরই বিছানায় আরাম করে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। মীরাশাহ সওকতকে বরাবরই বড় ভয় পায়, কিন্তু কি করা যায় ! সওকত হসমত আল্লাবেগের প্রিয় সেপাই, সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

নিচে গ্রামের মধ্যে ভীষণ গোলমাল। এখানে এই টিলার ওপর থেকে দেখে মনে হয়, এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। জ্বলছে, আবার নিভে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ গোলমালটা বেশ তীব্র হয়ে ওঠে, তারপর স্তব্ধ হয়ে যায় সব কিছু। একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে গোলমালটা। আবার চিৎকার চেঁচামেচি, স্লোগানের আওয়াজ, তারপর সেপাইদের হাঁকডাকে সব আওয়াজ ডুবে যায়। চারদিকে মশাল ঘুরে বেড়ায়। সেগুলিকে একটা ফসলের গাদা থেকে আর একটা ফসলের গাদায় যেতে দেখা যায়।

দক্ষিণ ঢালের দিকে মশাল শেষবারের মতো জ্বলে ওঠে, তারপরই অন্ধকারে ডুবে যায় চারদিক।

সওকত হেসে বলে, 'মনে হয় ওটা ফতেহ্‌দীনের গাদা। চলো, এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যাক। রাতের কাজ খতম। কাল সকালে আবার জায়গীরদার সাহেবকে সালাম জানাতে যেতে হবে।'

* * *

ফজলের জ্ঞান ফিরতেই দেখল, সে দড়িতে বাঁধা রয়েছে। তার সঙ্গীসাথী তিরিশ চল্লিশজন চাষীও তার মতোই বাঁধা অবস্থায় ইলমদীনের গাদার কাছে পড়ে রয়েছে। সকাল হয়ে গেছে, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলের ঘন কুয়াশায় টিকরীর চারদিক তখনও ঢেকে আছে। বাঁধা অবস্থাতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাদের সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা যেন বরফের মতো গলে গলে নাক ও কানকে স্পর্শ করছে, শ্বাসনালীর ভেতরে ঢুকে সারা শরীরটাকে অবশ করে দিচ্ছে, রক্তে মিশে গিয়ে মাংসপেশীকে নিঃসাড় করে দিয়ে অস্থিকে পর্যন্ত স্পর্শ করছে। ঠাণ্ডায় কাতরাচ্ছে অনেকে, কারণ তাদের কম্বল কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। ফজল ভাবে, এখনো সূর্য উঠতে যথেষ্ট দেরী, যদি কোথাও একটু আগুন না পাওয়া যায়, তাহলে ততক্ষণে তাদের নাক কান ও হাত-পা জমতে শুরু করবে। কিন্তু সে কিছুতেই আর্তনাদ করবে না, আগুনও চাইবে না কারোর কাছে। সে জোরে দাঁতে দাঁত চেপে কাঁধ ফুলিয়ে দড়িটাকে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে। তার বাহুপেশী ফুলে ফুলে ওঠে, বুক প্রশস্ত হয়, ঘাড়ের শিরাগুলো কাঁধ থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে। আর একটা চিৎকার —আর একটা চিৎকার —আর একটা চিৎকার —আর ফজলের সারা শরীর ঘামে ভিজে জব্‌জবে হয়ে ওঠে, তবু দড়ি ছেঁড়ে না। খুব মজবুত করে বাঁধা হয়েছে তাকে। ফজলের বাহুপেশী শিথিল হয়ে আসে, টান-টান শিরাগুলো বসে যায়, প্রশস্ত বুক ক্লান্তিতে ভারি হয়ে চুপসে যেতে থাকে। সে নিচের ঠোঁট তখনও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছিল, আস্তে আস্তে দাঁত আল্‌গা হয়ে ঠোঁট বেরিয়ে আসে। ঘাড়টা একদিকে কাৎ হয়ে যায়।

আল্লাদাদ হা-হা করে হেসে ওঠে, 'ফজল, আমি নিজের হাতে তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছি।'

ফজল চোখ বন্ধ করে ছিল। সে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকিয়ে আল্লাদাদকে দেখে। লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট, যেমন মজবুত গড়ন, তেমনি একরোখা। নিষ্ঠুরতার জন্যে গোটা এলাকায় নাম-ডাক। তাগড়া চেহারা, সত্যিই বেশ তাগড়া —ফজল মনে মনে বলে। আল্লাদাদের শরীরটা ভালো করে দেখে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সে। একবার ওর সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার —ফজল মনে মনে ভাবে —দেখতে চাই, কি রকম তাগড়া? কতটা তাগড়া!

রহমান কাতরাচ্ছে। বালকরাম, বরকতও…

'একটু আগুন পোয়াতে দাও। আর না-হয় কম্বল দাও আমাদের।'

'আর তোমাদের বাঁধনটাও খুলে দিই, কি বলো! হা-হা-হা!' আল্লাদাদ হাসতে থাকে। তার সঙ্গের অন্যান্য সেপাইরাও জোরে জোরে হাসতে শুরু করে। গাদার আর এক দিক থেকে ইলমদীন একটা কম্বল হাতে করে নিয়ে আসে —ঠাণ্ডায় সুড়ুৎ সুড়ুৎ করছে, দুশ্চিন্তায় ঘাড় নাড়ছে। চাষীদের দেখে তার এক ক্রুর হাসি খেলে যায়, কিন্তু মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় সে হাসি। মাথা নাড়তে নাড়তে কাতর কণ্ঠে বলে, 'সেপাইজী, ওরা আমার গাঁয়েরই চাষী। ওদের ওপর এত জুলুম কোরো না। কম-সে-কম ওদের বাঁধনটা খুলে দাও।'

আল্লাদাদ বলে, 'খুলে দিই কি করে? ওরা তো সরকারের হিস্‌সা দিতে চায় না।'

ইলমদীন কৃত্রিম ভালোমানুষী গলায় বলে, 'কে বলছে ও কথা? কে বলেছে সেপাইজী? কোনো দুশমন এ সব রটিয়েছে। আমরা মহারাজের বিশ্বাসী প্রজা। শত শত বছর ধরে আমরা তাঁর হক মিটিয়ে আসছি। মহারাজের উপকারে আমাদের এক-এক গাছা চুলও ঋণী হয়ে আছে —কি রহমান, ঠিক বলিনি?'

রহমান কারোর দিকে না চেয়ে অশ্রুরুদ্ধ গলায় জবাব দেয়, 'একটু আগুন পোয়াতে দাও, নইলে মরে যাব।'

ইলমদীন বলে, 'আরে ভাই, আগুন তো এখুনি পেয়ে যাবে, আগে আমার কথার জবাব দাও শীগ্‌গীর। বলো না, তুমি-আমি কখনও সরকারের হিস্‌সা দিতে অমত করেছি?'

রহমান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'আমি তখনই বলেছিলাম, এর ফল ভালো হবে না। আমি তো সব সময় আমার হিস্‌সা দেওয়ার জন্যে তৈরী, কিন্তু আমার...'

রহমানকে আর কিছু বলতে দেয় না ইলমদীন। চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'দেখো দেখো, বলছিলাম না, আমি রহমানকে ভালো করেই চিনি! ওর ছেলে বরকতকেও চিনি। —আরে, এরা দু'জন তো —সত্যি কথা বলতে গেলে— কি আর বলব...!' ইলমদীন আল্লাদাদের দিকে চেয়ে চোখ টেপে, 'ওদের দড়ি খুলে দাও। আমি বলছি, ওদের দড়ি খুলে দাও আল্লাদাদজী —ও তো আমার নিজেরই ভাই।' আল্লাদাদ আর তার সেপাইরা এগিয়ে গিয়ে রহমান ও বরকতের দড়ি খুলে দেয়। ইলমদীন ওদের তাড়াতাড়ি গাদার কাছে নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালে, ওদের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দেয়।

দূরের অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখায় দড়ি দিয়ে বাঁধা আর সব চাষীদের চোখ চক্‌চক করতে থাকে। ঠাণ্ডায় ওদের শরীর বরফের ডেলা হতে চলেছে, আর ও দিকে অগ্নিকুণ্ড, ওখানে জীবন —ওদের দিকে পেছন ফিরে রহমান ও বরকত বসে বসে আগুন পোয়াচ্ছে।

'আরে বালকরাম, তুমি কি বলো ?' ইলমদীন ওর কাছে এসে মিষ্টি-মিষ্টি গলায় বলতে শুরু করে, 'তুমি বাঁধা-ছাঁদার যোগ্য ব্রাহ্মণ, অ্যা! এ সব ঝগড়া ঝাঁটিতে তোমার কাজ কি ? এ গাঁয়ে তুমি একজনই ব্রাহ্মণ রয়ে গেছ তাছাড়া তোমার মেয়েটাও তো প্রায় সোমত্ত হয়ে এল —বলো, কি বলছ ?'

বালকরাম মুমূর্ষু কণ্ঠে বলে, 'আমার দড়িটাও খুলে দাও।'

'আল্লা ভালো করুক তোমার, আমার দড়িটাও খুলে দাও।' বৃদ্ধ গুলাম নবী চিৎকার করে বলে।

এভাবে প্রায় পনেরোজন চাষী তাদের বাঁধন খুলিয়ে নিল। তারা গিয়ে আগুনের চারপাশে বসে আগুন পোয়াতে লাগল। ইলমদীন নিজের গাদা থেকে মিসরী ভুট্টা টেনে টেনে বার করে তাদের খেতে দিলো। তারপর ওদের কাছে বসে বোঝাতে শুরু করল, 'ঝগড়া-বিবাদ করার কোনো মানে হয় না। মহারাজের রাজত্বি খুব মজবুত। বড় রাজাসাহেব ছোট রাজাসাহেবকে পাঠিয়েছেন এই এলাকা থেকে সরকারী হিস্সা আদায় করে নিয়ে যেতে। একদল ফৌজও এসে পৌঁছে গেছে এখানে। কাছের ফাঁড়ি থেকেও পুলিশ এসেছে সাহায্য করতে। এখন একমাত্র বাঁচার উপায়, ফসল থেকে ওঁদের হিস্সা দিয়ে দেওয়া…'

অনেক চাষীই ব্যাপারটা মেনে নিল, কিন্তু কয়েকজন তখনও বেপরোয়া। আস্তে আস্তে ওদের মধ্যেও আবার কয়েকজন মত পরিবর্তন করল। একটু বেলা চড়লে দারোগা হসমত আল্লাবেগ জনা দশেক সেপাই নিয়ে এসে পৌঁছাল, ওদের সঙ্গে মীরাশাহ লালাও রয়েছে, হাতে হাতকড়া। চাষীরা লালা মীরাশাহকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। ইলমদীনও প্রথমে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তে মীরাশাহের চোখে তার চোখ পড়তেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলল সে। মনে মনে লালার বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল।

সওকত হাসতে হাসতে বলল, 'এই যে লালাকে দেখছ, অন্য চাষীদের মতো ওরও দেমাগ খারাপ হয়েছে —গাঁয়ের পাঁচজনে যা বলবে, তাই করবে! সরকারী লগান দেবে না বলেছে।' কথাটা বলেই সওকত লালার গায়ে একটা আলতো থাপ্পড় দিলো। লালা যেন অনেকক্ষণ থেকে এরই অপেক্ষায় ছিল। গায়ে থাপ্পড় পড়তে না-পড়তেই সে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেলো।

ইলমদীন ঝট করে এগিয়ে গিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল। বলল, 'আরে …রে …রে, করেন কি! হুজুর, লালার ইজ্জৎ আমাদের গোটা এলাকার ইজ্জৎ। একটু ভেবেচিন্তে…'

সওকত বলল, 'আমি তো এক মামুলী সেপাই, দারোগা সাহেবের হুকুম, ওকে হাতকড়া দিয়ে রাখো।'

হসমত আল্লাবেগ লালাকে দু'চারটে আলতো ঘুষি মেরে বলল, 'আমি আজ এই পোকাটাকে শেষ করে দেবো! ওর এত হিম্মত যে, সরকারী লগান

আটকাবে! সরকারের সঙ্গে যে গদ্দারী করবে, জান-সুদ্ধ খতম করে দেবো তার —সে লালাই হোক আর লালার বাপই হোক! বল বে লালার বাচ্চা…'

হসমত লালাকে আর এক ঘুষি মারল।

ফতেহ্দীন দড়িতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল, সে আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। লালা মীরাশাহ তাকে কয়েকবার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। চাষীটার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হলো। সে তার আশপাশে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা অন্যান্য চাষীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'হুজুর, লালাকে মারবেন না, আমরা সবাই লগান দেবো।'

'এতক্ষণে তোমরা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছ!' ইলমদীন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে নিজেই তাদের দড়ি খুলে দিতে লাগল।

হসমত আল্লাবেগ বলল, 'লালা মীরাশাহ, খোদার নাম নে, এইসব চাষীরাই আজ তোর প্রাণ বাঁচালে। নইলে আজ তুই আমার হাতেই মরতিস।'

সওকত বলল, 'হুজুর, যতক্ষণ আপনার এই গোলাম বেঁচে আছে, ততক্ষণ আপনার হাত নাড়ারও দরকার নেই।' কথাটা বলেই সে লালা মীরাশাহকে চোখ টিপল। তারপর যে সব চাষীরা তখনও লগান দিতে রাজী হয়নি, দড়িতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তাদের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

'কি মতলব —অ্যাঁ?' সওকত এক-একজন চাষীর পাঁজরে জুতোর ঠোক্কর মেরে মেরে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

'লগান দেবো না, আবার কি?'

'তুমি কি বলছ?' সওকত ধূসর দাড়িওয়ালা সুলতানকে জিজ্ঞেস করল।

সুলতান বলল, 'একবার তো মরতেই হবে, প্রতি বছর এ রকম আর মরতে পারিনে। আমি ও দুনিয়াতেই লগান দেবো।'

সওকত তার ভারি বুট দিয়ে তাকে দু'তিনবার বেশ করে মাড়িয়ে দিলো। সুলতান রক্তবমি করতে লাগল। তখন সওকত দারোগাকে বলল, 'হুকুম করুন হুজুর, দু'একটা ভুট্টা উড়িয়ে দিই!' সে সুলতানের মাথার দিকে ইশারা করে কথাটা বলল।

হসমত বলল, 'না না সওকত, তা কেন, ওরা ঠিক রাজী হয়ে যাবে।'

লালা মীরাশাহ এগিয়ে গিয়ে জোড়হাত করে সুলতান, ফজল ও তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের বলল, 'মেনে নাও ভাই, পরমেশ্বরের নামে মেনে নাও। আমি বলছি, এ সময় ঝগড়া করা বেকার। এখন আর কি হবে —উনি এত বেশী সেপাই আর ফৌজ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, না দিলে জবরদস্তি করে ফসল তুলে নিয়ে যাবেন।'

'নিয়ে যাব কোথায়? এখানেই সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাব।'

গলাটা ঠাকুর কাহনসিংয়ের। সে আসতেই টিকরীর মাথায় সূর্যটাকে দেখা

গেলো —হলুদ রঙের সূর্যটা সাদা কুয়াশার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটাকে দেখার চেষ্টা করছে যেন। সূর্যরশ্মি সুলতানের শরীর স্পর্শ করতেই তার সারা মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বেশ আত্মতৃপ্তির সুরেই সে বলল, 'জানে মারতে চাও, মেরে ফেলো, তবু বেঁচে থাকতে লগান দেবো না। ফসল পুড়িয়ে ফেলতে চাও, পুড়িয়ে ফেলো, কিন্তু যতক্ষণ আমার গাদা দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ কাউকে এক দানা দেবো না —এক দানাও না।'

লালা মীরাশাহ বলল, 'তুমি কাউকে না দিতে চাও, দিয় না, তোমার অংশ আমি নিজের থেকে দিয়ে দিচ্ছি —বলো, রাজী তুমি?' লালা মীরাশাহ কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত চাষীর দিকে চেয়ে বলল, 'বলো, তোমরা রাজী? বলো, কি বলবে··· '

চাষীরা চুপ করে রইল। এই প্রস্তাবের সামনে যেন তাদের সংগ্রাম, তাদের বাঁচার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে।

ফজল মৃদুকণ্ঠে বলল, 'লালা, একটু এ দিকে এস।'

লালা তার কাছে গেলো।

'আর একটু কাছে এস।'

লালা ফজলের দিকে ঝুঁকে মাটিতে বসে পড়ল, 'বলো, কি বলছ?'

ফজল প্রচণ্ড ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, তারপর চোখ বন্ধ করে সজোরে লালা মীরাশাহের মুখে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সওকত চাকু বার করল, কিন্তু ঠাকুর কাহনসিং তার হাত ধরে ফেলে বলল, 'ছেড়ে দাও, দরকার নেই —ওদের অন্য শাস্তি দেওয়া হবে!'

'কি শাস্তি?'

'এখুনি রাজা ঘুম থেকে উঠবেন, তারপর কাগান পেরিয়ে ওপারে যাবেন। তোমরা তো জানো, কাগানের নালায় কোনো সাঁকো নেই। সে জন্য কাঠ চাই, আর মানুষও···' —ঠাকুর জোরে হেসে উঠলেন।

সওকত বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালো কথা। সে জন্য কাঠ চাই, মানুষও চাই!'

ইলমদীন বলল, 'হাতজোড় করছি হুজুর। সে বড় কঠিন শাস্তি —গত পাঁচ বছরে এ গাঁয়ে কখনও ও-শাস্তি দেওয়া হয়নি।'

ঠাকুর বলল, 'গত পাঁচ বছরে এমন অবস্থাও তো কখনও হয়নি যে তোমরা লগান দেওয়া বন্ধ করেছ!'

'না, সে কথা আমি কখনও ভাবতেই পারিনি —কি রহমান, তাই না?' —ইলমদীন রহমানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল।

রহমান জোড়হাত করে বলল, 'না হুজুর, আমরা তো বরাবর লগান দিয়ে আসছি। এখনও বলছি, সরকারের সঙ্গে লড়াই করে আমরা কিভাবে···'

ইলমদীন তাড়াতাড়ি তার কথায় বাধা দিয়ে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন হুজুর, আমরা সবাই এক কথা বলছি। এমন আর কখনও হবে না হুজুর। ঐ কিছু লোক, খোদা জানে কার খপ্পরে পড়েছিল, ওদের মাফ করে দিন হুজুর!'

ঠাকুর কাহনসিং বলল, 'এখন সাঁকো তো বানাতেই হবে। রাজাসাহেব কি জলে নেমে হাঁটবেন… !' তারপর হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বেশ কড়া গলায় হসমত ইলমদীন এবং অন্যান্য সেপাই ও ফৌজকে উদ্দেশ করে বলল, 'আচ্ছা, ফসলের হিস্‌সা উসুল করে নাও। ইলমদীনকেও ওর পাওনা আদায় করে দাও। লালা মীরাশাহকেও!'

'আমি আমার অংশ নেব না।' লালা মাথা নিচু করে নিতান্ত অপরাধীর গলায় বলল।

'কি বললে?' ঠাকুর গর্জন করে উঠল, 'তোমার অংশ নেবে না? তাহলে ওর হাতে ফের হাতকড়া লাগাও।'

'ছেড়ে দিন —ছেড়ে দিন।' ইলমদীন তোষামোদের সুরে বলল, 'লালা, তুমি বাচ্চা ছেলের মতো কি কথা বলছ! আরে, তোমার কাছে ফসল থাকলে আমরাই আবার কাল খাওয়ার জন্যে হোক, বীজের জন্যে হোক, তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসব। আর তোমার কাছেই যদি কিছু না থাকে, আমরা আবার কোন মুলুকে যাব বীজ আনতে —কি রহমান, তাই না?'

রহমান মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

'আচ্ছা ভাই, তোমাদের যা মর্জি।' —লালা মাথা নেড়ে বলল।

তৎক্ষণাৎ ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলো। গাদার ফসল ভাগাভাগি হলো। ফসল তৈরী করতে সময় লাগে, ভাগ-বন্টন করতে সময় লাগে না। লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা, বীজ বোনা, বীজ থেকে চারা বেরোনো, সেই চারাকে মানুষ করা, তারপর তাতে ফল আসতে সময় লাগে বৈ-কি! কিন্তু ফল ভাগ-বন্টন করতে আর কতটুকু দেরি! এক ভাগ সরকারের, এক ভাগ জায়গীরদারের, এক ভাগ নম্বরদারের, আর এক ভাগ লালার। প্রত্যেকটি ভাগের পর গাদা ক্রমশ ছোট হতে থাকে, শ্রম গলে যেতে থাকে, ভুট্টা অদৃশ্য হয়, শেষে বাকী থাকে শুধু ক্ষুধা আর মনের মধ্যে এক দুঃসহ ভার —শূন্যতা চোখের জলকে বরফের চাঙড়ে পরিণত করে, চতুর্দিকে ঠাণ্ডা শীতলতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চতুর্দিকে বরফ! চতুর্দিকে অন্ধকার! চতুর্দিকে মৃত্যু! যে সজীবতা, প্রাণময়তা, আলো, সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষণ, তার চিহ্ন থাকে না কোথাও। চতুর্দিকে স্তূপীকৃত অনুর্বর পতিত পাথরের রাশিতে শত শতাব্দীর বরফ জমে থাকে, আর তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ মাথা নত করে।

কাগানের নালায় সাঁকো তৈরী হচ্ছে।

টিকরী শাহমুরাদ থেকে চমনকোট যাওয়ার রাস্তাটায় নালার দু'পাড় বেশ উঁচু।

সেখানে দেবদারু ও ডুমুর গাছের জঙ্গল খুব ঘন, নালার জলও সেখানে গভীর। এই রকম গভীর হয়েই প্রায় দুশো গজ বরাবর নালাটা বয়ে গেছে, তারপর একটা ঢাল বেয়ে তুমুল কল্লোলে রঙ্গড়ের মাঠের দিকে ঘুরে গেছে।

সেই উঁচু পাড়ের ওপর সাঁকো বানানো হচ্ছে। কত শত বছর ধরে এইভাবে সাঁকো তৈরী হয়ে আসছে। যখন ডোগরা সরকার ছিল না, তখনও এভাবে সাঁকো তৈরী হতো; যখন ইংরেজ রাজত্ব ছিল না, তখনও এভাবে সাঁকো তৈরী হতো। এখানকার চাষীরাই সে সাঁকো তৈরী করে। নালার ওপর দুটি গাছ লম্বা করে পাশাপাশি রাখা হয়, সমান্তরাল দুটি গাছের মাঝখানে যে পনেরো-বিশ ফুট ফাঁকা জায়গা, তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয় কাঠের তক্তা। সরকার যখন গ্রামবাসীদের ওপর খুশী থাকেন, কেবল তখনই কাঠের তক্তা বিছানো হয়। আর সরকার ক্ষুণ্ণ হলে কাঠের তক্তার বদলে বিছানো হয় মানুষের শরীর। একজন আর একজনকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, আর নিজের মাথাটা গলিয়ে দেয় অন্য একজনের পায়ের ফাঁকে, তেমনি নিজের পা দু'খানি দিয়েও সে আর একজনের মাথাটা চেপে ধরে। এমনি করে দুটি গাছের মাঝখানের পনেরো-বিশ ফুট ফাঁকা জায়গা বরাবর মানুষের সাঁকো তৈরী হয়। নিচে কাগানের নীল জল বয়ে যায় তুমুল আলোড়ন করতে করতে, আর এ দিকে মানুষের শরীরের ওপর পা ফেলে ফেলে সরকার নদী পার হন। মানুষের বুক আর দেবতাদের পা। চাষীদের বুক আর দেবতাদের পা। শ্রমজীবীদের বুক আর শ্রমশোষণকারীদের পা। এই বুক আর পা ইতিহাসের এক যুগ থেকে অন্য এক যুগের মাঝখানে সাঁকো তৈরী করতে করতে আজ এই বিংশ শতাব্দীর মোড়ে এসে পৌঁছেছে।

* * *

আজও মানুষের সাঁকো তৈরী হচ্ছে, কারণ এশিয়ার বিংশ শতাব্দী পশ্চিমের অষ্টাদশ শতাব্দীরও পেছনে পড়ে রয়েছে। আজও মানুষের শরীর দিয়ে সাঁকো তৈরী হচ্ছে, কারণ চাষীদের ব্যবহারে সরকার সন্তুষ্ট নন। সরকার তাঁর ফসল আদায় করে নিয়েছেন, রূপ-যৌবনের উপঢৌকন লাভ করেছেন, রক্তের উন্মাদনা চরিতার্থ করেছেন, কিন্তু তবুও সরকার খুশী নন, কেন না বুকগুলি পায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, কেন না যে বুকগুলি শুধু পদদলিত নিষ্পেষিত হওয়ার জন্যেই, দেখতে দেখতে সেই বুকগুলিই বিদ্রোহের আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে উঠছে। সেই প্রাচীরকে ভূপাতিত করতে হবে, কারণ বুকগুলি যদি বিদ্রোহ করে, তাহলে পা কোথায় থাকবে! তাই সরকার খুশী নন —সে জন্যে আজও তক্তার সাঁকোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকুতে মানুষের সাঁকো তৈরী হচ্ছে।

পুলিশের পাহারায় বিদ্রোহী কৃষকদের একপাশে দাঁড় করানো হয়েছে।

সওকত ক্রুদ্ধ চোখে চারদিকে তাকাল। তারপর সে সুলতানের ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ডুমুর গাছে বেঁধে ফেলল। আর এক পাশের গাছের সঙ্গে ফতেহ্‌দীনকে

বাঁধা হলো। মাঝখানে তিনজন লোকের জায়গা ফাঁকা, সেখানে দু'জনকে লাগিয়ে দেওয়া হলো —বরকত ও গুলাম নবীকে।

মাঝখানে একটি মানুষের মতো যে-জায়গাটুকু ফাঁকা রইল, সেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক। তার জন্যে একজন মজবুত চাষী দরকার। সওকতের নজর পড়ল ফজলের ওপর। ফজল সবচেয়ে তাগড়া, আর বলতে গেলে, সবচেয়ে বেশী শাস্তি তারই প্রাপ্য।

সওকত হেসে ফজলকে বলল, 'এস দোস্ত, শীগ্‌গীর মাঝখানে চলে এস।'

ফজল, বরকত ও গুলাম নবীর মাঝখানে চলে গেলো। যেতে যেতে সে বরকতের কানে ফিস্‌ফিস করে কি যেন বলল। সওকত তাকে এক জোর ঘুষি মেরে বলল, 'এখানে কথা বলা নিষেধ।'

ফজলের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে তার চোখের পাতা কাঁপল, তারপরই চোখ নামিয়ে নিল সে। সাঁকো তৈরী হয়ে গেলে ঠাকুর কাহনসিং, সওকত, আল্লাদাদ নিজেরা হেঁটে আগে সেটা পরীক্ষা করে দেখে নিল।

আল্লাদাদ খুশীতে চিৎকার করে উঠল, 'বাঃ বাঃ! আরে ইয়ার, এ যে বিলকুল ঠাণ্ডা সড়ক —একেবারে মাল-বওয়া রোড!'

তারপর সড়কের ওপর দলবল রওনা হলো।

চাষীরা তাদের দাসত্ব প্রকাশ করার জন্যে মাথা নুইয়ে নুইয়ে ফারসী সালাম জানাতে লাগল।

সকলের আগে আটজন সেপাইয়ের একটা দল গেলো ওপারে —একজন একজন করে…

ফৌজী জুতো-পরা পাগুলো কাঠের তক্তা পেরিয়ে, মানুষের শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে, আবার কাঠের তক্তা পেরিয়ে ওপারে পৌছাল।

রজ্জি রাজা করামত আলির পাশে দাঁড়িয়ে। তার চোখ-মুখ সাদা, ফ্যাকাশে। আনত চোখের দৃষ্টি। পরনে বাদামী রঙের মূল্যবান কাশ্মীরী পোশাক, তাতে সোনালী ফুল তোলা। রজ্জি চোখ তুলে দু'একবার ফজলের দিকে তাকাল।

এখন ঠাকুর কাহনসিংয়ের সঙ্গে কয়েকজন সাঁকো পেরোচ্ছে। রজ্জি চোখ নামাতেই তার নজর গিয়ে পড়ল তাদের হেঁটে-যাওয়া পাগুলির দিকে। ওটা সুলতানের শরীর —ওটা ফজলের —ওটা গুলাম নবীর —ওটা ফতেহ্‌দীনের— তারপর কাঠের তক্তা… রজ্জির সারা শরীর কেঁপে উঠল।

'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না-কি পিয়ারী?' রাজা করামত আলি রজ্জির কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

রজ্জি কোনো জবাব দিলো না। তার পাতলা শুক্‌নো ঠোঁট দুটো পরস্পর চেপে বসল। চোখ তুলে চারদিকে তাকাল সে। কোনো দিকে পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই। চারদিকে ফৌজ, পুলিশের লোক আর শোক-সন্তপ্ত কৃষকেরা…

রঞ্জি ধীরে ধীরে তার পা থেকে রেশমী জুতো খুলে ফেলল, মাটির ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

রাজা করামত আলি তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। মৃদু হেসে বললেন, 'প্রাণেশ্বরী, জুতো পরে নাও, ফুলের মতো নরম পা তোমার…'

রঞ্জি বলল, 'না, আমি খালি পায়ে যাব।'

দারোগা হুসমত আল্লাবেগ এগিয়ে এসে ফারসী সালাম জানিয়ে বলল, 'হুজুর, পদধূলি দিন, আপনার বান্দা পেছন পেছন যাচ্ছে।'

রাজা করামত আলি রঞ্জির হাত ধরে বললেন, 'এস।'

রাজা ও রঞ্জি হাঁটতে লাগলেন —ধীরে ধীরে। রাজা করামত আলি আগে আগে, রঞ্জি পেছনে পেছনে —শূন্যে চোখ তুলে। হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জি অনুভব করছিল, এটা লালচে মাটি, এটা সবুজ ঘাস, এটা ডুমুর গাছের গাঁটওয়ালা গুঁড়ি …এটা, সুলতানের শরীর, যে তাকে কোলে নিয়ে তার মুখে কত খাবার তুলে দিয়েছে। এটা …এটা বরকতের শরীর, যে একদিন ভালোবেসে তার হাত ধরেছিল …এটা …এটা …রঞ্জির নগ্ন পা দু'খানি কেঁপে উঠল। এটা কার মুখ? এটা কার ঠোঁট, তার পদতলের নিচে, তার পায়ে চুমো খেয়ে যেন বলছে —তুমি কোথায় চলেছ রঞ্জি? এটা কার অশ্রুসিক্ত গণ্ডদেশ —প্রিয়তমা রঞ্জি! জীবন ও মৃত্যুর সাঁকোর ওপর আজ তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছ? এটা কার গ্রীবাদেশ, যার আড়ালে তার কুমারী ভালোবাসার প্রথম লজ্জা নিজের মুখ লুকিয়েছিল? চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ আকাশ ও চতুর্দিক বেষ্টিত পৃথিবীতে আজ কি কোথাও রঞ্জির মরার এতটুকু জায়গা নেই? …এই চওড়া বুক আর তার অবিন্যস্ত চুল —রঞ্জির পা টলতে লাগল।

ফজলের ভরাট বুকের ওপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে যাচ্ছে সবাই। ফৌজ আর সেপাইদের পায়ের তলায় তার বুক পিচের রাস্তার মতো কঠিন ও নির্মম হয়ে ওঠে —এমন কঠিন পাথরের মতো যে তাতে এতটুকু কাঁপুনিও দেখা দেয় না —যেন সে তাদের কোনোদিকে পথ ছেড়ে দিতে রাজী নয়। গায়ের ওপর দিয়ে পাগুলো চলে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে সে কিন্তু ঠিক রয়েছে। সে তার শরীরের মাংসপেশীকে কংক্রিট ও লোহার মতো শক্ত ও নিষ্প্রাণ করে তোলে, আর সেই আবরণের মধ্যে সে স্বয়ং রয়েছে —নিঃসরণশীল, টগ্‌বগ করে ফুটতে থাকা লাভার মতো।

কিন্তু রঞ্জির পা গায়ে পড়তেই ফজলের ভেতরে যেন একটা ধনুক মড়াৎ করে ভেঙে যায়। কংক্রিট আর লোহা যেন গলে গলে মাংসের মতো কোমল হয়ে আসে, যেন প্রেমিকার পায়ের তলায় লক্ষ লক্ষ ফুল ছড়িয়ে দিতে চায় —তার বুকের অণু-পরমাণু বিবশ হয়ে রঞ্জির কম্পমান নগ্ন পদযুগলকে যেন জিজ্ঞেস করতে থাকে —তুমি কোথায় চলেছ রঞ্জি …কোথায় যাচ্ছ?

এক পা …আর এক পা…

আর রঞ্জি যেন শুনতে পায়, ফজলের আত্মা তাকে অনবরত চিৎকার করে বলছে —তুমি কোথায় যাচ্ছ রঞ্জি ? তুমি তো আমার —তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার —তোমার সারা শরীর, সমগ্র আত্মা আর তার যাবতীয় স্বপ্ন আমার। মনে পড়ে ! আমরা জীবনের প্রথম বসন্তে পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম —মনে পড়ে, যখন আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল, মাটিতে ঘাসগুলো হলুদ হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি তোমায় প্রথম কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটতে শিখিয়েছিলাম —মনে পড়ে, যখন একটি একটি করে সফেদার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছিল, তখন আমি তার রূপোলী ডাল কেটে তীর-ধনুক তৈরী করে দিয়েছিলাম —যখন চারপাশে মৌমাছিরা গুঞ্জন করছিল, আঙুরলতায় লালচে রঙের মুক্তো ঝক্‌মক করছিল, তখন আমি তোমার ঠোঁটে প্রথম ভালোবাসার চুম্বন এঁকে দিয়েছিলাম —রঞ্জি ! তুমি আমার পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমার দু'বাহুর স্বপ্ন —তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় যেতে পার …রঞ্জি …রঞ্জি…

সেই মুহূর্তে ফজল লক্ষ্য করল যে, রাজা তাকে অতিক্রম করে অন্য লোকের শরীরের ওপর হেঁটে যাচ্ছেন। রঞ্জি তার বুকের ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

রাজাজী পেছন ফিরে রঞ্জিকে এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন।

হঠাৎ ফজল তার হাত-পা আল্‌গা করে দিলো। সাঁকো ভেঙে পড়ল। মুহূর্তে রঞ্জি নিচে পড়ে গেলো। ফজলও পড়ল তার সঙ্গে সঙ্গে।

লোকে দেখল, নিচে পড়তে পড়তেই ফজল রঞ্জিকে দু'হাতে ধরে ফেলল, আর তারপরেই ওরা দু'জনেই কাগানের গভীর নীল জলে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

তিন

আবদুল খুব খুশী। সে তন্ময় হয়ে রাস্তায় হাঁটছে। কখনো গান গাইতে ইচ্ছে করলে কানে হাত দিয়ে এক দীর্ঘ সুর ছেড়ে দেয় —দীর্ঘ, দীর্ঘ, খুব দীর্ঘ সুর —যেন তার আত্মা কোনো বিজয়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মতো আকাশের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে চায় ! এই মুহূর্তে আবদুলও সেই বিজয়ীর মতো অনুভব করছে, জীবনের ভালোবাসা যেন তার করায়ত্ত। কখনো হাঁটতে হাঁটতে সে তার ডানপাশে তাকায়, যেন বানোও তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। মিষ্টি হেসে সে যেন বানোকে জিজ্ঞেস করে, 'ক্লান্তি লাগছে ? কাঁধে তুলে নেবো, বলো'?'

অদৃশ্য বানো জবাব দেয়, 'ইস, ভারি কাঁধে তুলে নেওয়ার লোক এসেছে ! তোমার চেয়েও জোরে হাঁটতে পারি।'

'পাল্লা দিতে চাও ?'

'বেশ, হয়ে যাক।'

তারপর আবদুল নিজেই হাসতে হাসতে দৌড়তে শুরু করে। ডানদিকে বাঁদিকে তাকায়। শেষ পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে সে যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন একটা ছোট খন্‌চরী গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে যায়, পেছন ফিরে বলে, 'শেষ পর্যন্ত হেরে গেলে তো!' আবদুল দেখে যে, বানো হাঁপাচ্ছে, টলতে টলতে সামনে এগিয়ে এসে চোখ বন্ধ করে আবদুলের দু'বাহুর মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিলো।

আবদুল বলে, 'আচ্ছা তবে চলো, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

বেশ কিছুদূর সে তার স্বপ্নটিকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়, তারপর বানোকে বড় ভারি বলে মনে হয়—মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'হাঁপিয়ে গেলাম একেবারে।'

'ব্যস, হয়ে গেলো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সারা জীবন আমার বোঝা বইবে কি করে?'

'আমি তোমার কোলে একটা খোকা দিয়ে দেবো—তুমি নিজেই তখন তার বোঝা বয়ে বেড়াবে। আমার সাহায্যের তুমি আর কোনো দরকারই মনে করবে না।'

বানো হাসতে শুরু করে।

আবদুল এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের কাছে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'এই গাছটার কি নাম—জানো?'

'না। কি নাম?'

'আমিও জানিনে।'

'তাহলে?'

আবদুল গাছটার বেশ কিছু পাতা ছিঁড়ে নেয়। নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিতে নিতে বানোকে বলে, 'শুঁকে দ্যাখো, পাতাগুলোতে কেমন ধূপের মতো গন্ধ!'

আবদুল পাতাগুলো বানোর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেয়। হাওয়ায় ফর্‌ফর্ করে ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো।

ওপরের ডালে বসে একটা পাখি জোরে ডেকে উঠল। হঠাৎ আবদুল বুঝতে পারল সে একা। রেগে গিয়ে সে একটা পাথর তুলে নিয়ে পাখিটার দিকে ছুঁড়ল। চঞ্চল পাখিটা চিৎকার করতে করতে উড়ে গেলো। কাগানের নালার ওপারে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো।

'উল্লু কোথাকার! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!' আবদুল মনে মনে গজগজ করল।

আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে। ভীষণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে, পা দুটো বেশ ভারি বোধ হচ্ছে। তার চোখের সামনে বানোর টল্‌টলে চোখ দুটি ভেসে উঠল, অশ্রুভারাক্রান্ত গলার স্বর—'তাড়াতাড়ি ফিরে এস। শহরে যাওয়ার সময় আমায় নিয়ে যাবে কিন্তু।' আবদুল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তার চুলে

মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ, তারপর তার মুখখানাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তার ফুলে-ফুলে-ওঠা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়েছিল।

'চী-হো— চী-হো—' পাখিটা কোথায় দূরে চিৎকার করে উঠল জোরে জোরে। আবদুল মৃদু হেসে বলল, 'হারামি! আমার কাছে যদি এখন বন্দুক থাকত!'

'চীহো— চীহো—' অর্থাৎ আঙ্গুর টক। পাখিটা যেন বলল।

আবদুল সামনে পা বাড়াল।

অনেক দূর গিয়ে সে দেখল, এক জায়গায় অজস্র নার্গিস ফুটে রয়েছে, যেন সহস্র চক্ষু মেলে আহ্বান করছে তাকে। এক তীব্র আকর্ষণে আবদুল এগিয়ে গেলো সেই দিকে, পায়ের জুতো আর মাথার টুপি খুলে রেখে ফুলগুলোর ওপর শুয়ে পড়ল সে।

তার চারদিকে শুধু ফুল আর ফুল —সাদা সাদা পাপড়ির মাঝখানে উজ্জ্বল হলুদ রঙের চোখের তারা, যেন সলজ্জ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে।

'তুমি বানোর চোখ —আমি তোমায় চুমো খাব।' আবদুল একটা ফুলের কোমল ডাঁটা ধরে তাকে চুমো খেলো, সঙ্গে সঙ্গে তার আশপাশের অনেকগুলি ফুল দুলে উঠল। সমস্ত ফুল একসঙ্গে দুলছে এখন। আবদুল খুশী হয়ে ফুলগুলোর একেবারে মাঝখানে চোখ বন্ধ করে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল, অমনি তার কানে বানোর মধুর খিল্‌খিল হাসি ভেসে এল। ঝট করে চোখ মেলতেই হাসিটাও বন্ধ হয়ে গেলো। আশপাশে কেউ নেই। আবদুল আবার চোখ বন্ধ করে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আবার হেসে উঠল বানো —বেশ জোরে জোরে। আবদুল তৎক্ষণাৎ চোখ মেলে তাকাল, আবার বন্ধ হয়ে গেলো হাসি। আবদুল উঠে বসে চারদিকে চেয়ে দেখল —কেউ নেই। বানো এখানে কোত্থেকে আসবে? সে তো পেছনে অনেক দূরে রঙ্গড়ের জঙ্গলে তার বাবার ঝুপড়িতে রয়েছে এখন। তাহলে কে হাসছে —আবদুল চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

আবদুলের খুব রাগ হলো। সে যেখানে শুয়ে ছিল, সেখান থেকে উঠে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল। দেখে কি, যেখানে টুপি রেখেছিল, জুতো রেখেছিল, সেখানে টুপি-জুতো কিছুই নেই। হাত দিয়ে চোখ মুছল সে —দুটো জিনিসই অদৃশ্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কে নিয়ে গেলো? আবদুল চিন্তিত হয়ে মাথা চুলকালো, আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকাল। টুপি ও জুতো খুঁজতে খুঁজতে সে ফুলগুলোর আর এক পাশে এসে হাজির হলো। হঠাৎ তার নিকটস্থ একটি ঝোপ থেকে দুটি মেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। আবদুল থমকে দাঁড়াল সেখানেই।

মেয়ে দুটি খিল্‌খিল করে হাসছে। আবদুলও হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আমার জুতো জোড়া কোথায়?'

একটি মেয়ে বলল, 'আগে বলো, আমাদের ফুলগুলোর ওপর শুয়ে ছিলে কেন ?'

'আমার টুপিটাই বা গেলো কোথায় ?'

'আগে বলো, আমাদের ফুলগুলোকে চুমো খাচ্ছিলে কেন?'

'আমি তোমাদেরও চুমো খেতে পারি।'

তার কথা শুনে মেয়ে দুটি জড়সড় হয়ে দাঁড়াল।

একজন মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ধ্যেৎ, অসভ্য কোথাকার !'

আর একজন বলল, 'তোমার ঘরে মা-বোন নেই ?'

আবদুল জবাব দিলো, 'দুই-ই আছে। কিন্তু তারা তো আর চুমো খাওয়ার জন্যে নয় !'

তাতে একটি মেয়ে বলল, 'তুমি আমার পায়ের জুতো দ্যাখনি বোধহয়, কেমন মজবুত !'

আবদুল বলল, 'হ্যাঁ, দেখে তো মজবুতই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, ও জুতো তুমি নিজের হাতেই তৈরী করেছ।'

মেয়েটি জুতো ছুঁড়ল তার দিকে। পিঠ ঘুরিয়ে কাঁধ বাঁচাল সে। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটি জুতো এসে তার পিঠে লাগল। আবদুল তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া পরে নিয়ে বলল, 'এবার টুপি নিয়ে এস।'

অন্য মেয়েটির হাতে টুপি ছিল। সে টুপিটাকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলো বাগানের নালার জলে। জলের ওপর টুপিটা নৌকোর মতো ভাসতে ভাসতে গেলো অনেক দূর —দুলতে দুলতে, ঘুরপাক খেতে খেতে —তারপর এক সময় জলের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ডুবে গেলো।

আবদুল লাফিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত চেপে ধরল খপ করে। বলল, 'কোন মুচির মেয়ে তুই, দেখাচ্ছি তোকে !'

মেয়েটি হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমি মুচি নই, ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমার নাম গঙ্গা।'

'আর তোর এই মিতেটা কে ?'

'ও আমার মিতে নয়, আমার দিদি, সরস্বতী।'

আবদুল মেয়েটির হাত ছেড়ে দিলো। মাথা নিচু করে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে বলল, 'খাঁটি হরিণের ছালের টুপিটা শহর থেকে কিনে এনেছিলাম !'

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সরস্বতী সলজ্জ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে ?'

'আমার নাম আবদুল।'

'বাড়ি কোথায় ?'

'আমাদের গাঁয়ের নাম টিকরী শাহমুরাদ। তোমাদের বাড়ি ?'

'বধিয়ানি।'

'এখানে কেন এসেছ ?'

গঙ্গা বলল, 'জল নিতে এসেছি। এ দিকে আসতেই তোমার জুতো আর টুপি চোখে পড়ল, আর তুমি চোখ বন্ধ করে ফুলের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছ, তাই দেখে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আবদুল আর ও বিষয়ে কথা বলতে দিতে চায় না। তাই দেখে গঙ্গা সরস্বতী দু'জনেই হেসে ফেলল। একসঙ্গে দু'জনের হাসি বড় ভালো লাগল আবদুলের। বলল, 'তা এখন বাড়ি যাবে তো? না আর কোনো মুসাফিরের কাপড় খুলে নেওয়ার তালে আছ ?'

সরস্বতী আর গঙ্গা কাগানের ধারে গিয়ে কলসিতে জল ভরল। আগে সরস্বতী গঙ্গার মাথায় কলসি তুলে দিলো। মাথায় কলসি নিতেই গঙ্গার ঘাড়টা কুঁজোর মতো হয়ে গেলো। বুক স্ফীত হয়ে উঠল, মাজা দুলতে লাগল। আবদুলের মনে হলো, যেন কোনো শিকারী তার ধনুকে জোর টান দিয়েছে।

সরস্বতী তখনও জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বালির ওপর তার কলসি, নালার জল এসে কলসিতে আলতো ধাক্কা দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। সরস্বতী চারদিকে তাকাল, তারপর আবদুলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম আবদুল, না ?'

আবদুল মৃদু হেসে বলল, 'আমার নাম রামভরসাও হতে পারে—অন্তত তোমার কলসিটা তুলে দেওয়ার জন্যে ...হরি শ্রীওঙ তৎসৎ...'

সরস্বতী আবার চারদিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে শীগ্‌গীর তুলে দাও। কিন্তু দেখো, কাউকে বোলো না যেন।'

আবদুল কলসি তুলে দিতে দিতে বলল, 'সে সব তোমায় ভাবতে হবে না।'

সরস্বতী যখন মাথায় কলসি নিল, তখন ধনুক ও তীরের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল—তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন যৌবন টল্‌টল করছে, নারীত্বের আকর্ষণ তার সারা দেহে এমন টইটম্বুর হয়ে উঠেছে যে আবদুলের হাত কেঁপে গেলো, কলসি থেকে কিছুটা জল চল্‌কে পড়ল সরস্বতী ও আবদুলের চোখে-মুখে। সরস্বতী আবদুলের দিকে চাইল, চোখে ভ্রূকুটি, বলল, 'জল চল্‌কে দিলে তো!'

আবদুল বলল, 'এই হয়। নদী বিপরীত দিকে বইলেই এ রকম ঘটে।'

'তার মানে ?' সরস্বতীর কণ্ঠস্বর বড় দুর্বল।

'সরস্বতী তো দক্ষিণ দিকে বয়। তাই সে যখন উত্তর দিকে বইতে যায়, তখন তার জল চল্‌কে ওঠে।'

'আমি ওসব বাবুদের ভাষা বুঝিনে।'

গঙ্গা বাঁকানো ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওর মাথায় কলসির এক বাড়ি দে তো, তবেই সোজা কথা বেরোবে ওর মুখ দিয়ে।'

আবদুল বলল, 'আমি তোমায় ছুঁয়ে দেবো গঙ্গা।'

গঙ্গা হক্‌চকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এমন ক্রুদ্ধ চোখে তাকে দেখতে লাগল, যেন বলতে চাইছে, 'হ্যাঁ, আমাকে ছুঁয়ে দাও —না না, ছুঁয়ো না, আমার গায়ে হাত দিও না —আচ্ছা, দু'হাতে জড়িয়ে ধরো আমায় —তুমি বড় ভালো —তোমায় প্রচণ্ড ঘেন্না করি আমি !'

তার দেহের অণু-পরমাণু থেকে দুটি বিপরীত ভাবনা যেন সোচ্চার হয়ে উঠছে। তার চোখে-মুখে যেন দুটি বিপরীত ভাবনার খেলা চলছে। আবদুল আবার হাসল।

'হাসছ কেন ?' গঙ্গা হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল।

আবদুল জবাব দিলো, 'তুমি জানো আমি তোমায় ছোঁব না, তবু তোমার মনের মধ্যে ভয় —আসলে ভয় পেয়ে গেছ তুমি।'

গঙ্গা বেশ সাহসের সঙ্গে জবাব দিলো, 'আমি তোমায় মোটেই ভয় পাইনি। কারণ তোমার চোখে সঙ্কোচ।'

আবদুল গঙ্গার চোখের দিকে লক্ষ্য করল, খুশী ও গর্বের সঙ্গেই লক্ষ্য করল। এখন তাকে ঠিক মুক্ত মেঘের মতো দেখাচ্ছে, ঠিক যেন তার বোন রজ্জি। তারপর আবদুল সরস্বতীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর তোমার কি মত, শুনি ?'

সরস্বতীর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিল সে। তার পা দু'খানি থরথর করে কাঁপতে লাগল। আবদুল তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে।

সরস্বতী বড় দুর্বল গলায় বলল, 'তুই আমায় ছুঁয়ে দিলি কেন ?'

আবদুল নির্বাক।

বেশ কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ হাঁটতে থাকে। আবদুল ভাবে, এই 'তুই' শব্দটা কি ? একটি শব্দ —কিংবা একটি চুম্বন —কিংবা একটি জলন্ত অঙ্গার, যা তার গণ্ডদেশ স্পর্শ করে গেছে। 'তুই' তুমি আর আপনি-র সহোদর, কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ। একটি ছোট্ট গোলগাল শিশু, নারী তাকে কোলে তুলে নিয়েই তার ঠোঁট দুটো চুমো খেয়ে খেয়ে লাল করে দেয়। 'তুমি' তার মেজদা, সমবয়স্কতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূরত্ব বজায় রেখে চলে। কিন্তু এই 'তুই' শব্দটি এত কাছের কেন ? 'তুই' যেন অপরিচিতের মাঝখানে হাজার শতাব্দীর ব্যবধান এক লাফে অতিক্রম করে, দুটি খাবি-খাওয়া হৃদয়ে প্রেমের মন্দিরার মতো বেজে ওঠে। 'তুই' সম্বোধনটি কি করে এক মুহূর্তে দুটি ধর্ম, দুটি সভ্যতা, দুটি সংস্কৃতি, দুটি চিন্তাধারা, দুটি মানুষ একে অপরের গলা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে —সেটি এই 'তুই' শব্দের এক বিচিত্র মনোরম মিলনের ফলশ্রুতি।

আবদুল আবার হাসল।

গঙ্গা পাড়ে উঠতে উঠতে দাঁড়াল। সরস্বতী ও আবদুলও দাঁড়াল।

গঙ্গা পাড়ের নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল, 'ওটা কি ?'

'কোথায় ?' আবদুল ও সরস্বতী একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

'ঐ দেখো, নিচে কাগানের ধারে।'

হঠাৎ তিনজনেরই চোখ গিয়ে পড়ল কাগানের তীরের এক জায়গায়, সেখানে দুটি লাশ পড়ে রয়েছে।

'হায় রাম!' সরস্বতী কেঁপে উঠল। চাপা গলায় আবদুলকে বলল, 'কলসিটা নামিয়ে দাও। আমার পা কাঁপছে।'

গঙ্গা তার মাথার কলসি নিজেই নামিয়ে রাখল নিচে। বলল, 'তুমি এত ভয় পেয়ে যাও কেন দিদি! চলো, গিয়ে দেখি কি ব্যাপার ?'

* * *

নালার ধারে দুটি মানুষের দেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। একজন আর একজনের হাত ধরে আছে। মেয়েটির খোলা চুল কোমর পর্যন্ত ছড়ানো। পুরুষটার গায়ে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন। ওদের সারা শরীর ভিজে জবজবে। দেহে চেতনার এতটুকু লক্ষণ নেই, যেন মৃত্যুর চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন তারা।

সরস্বতী ঘাবড়ে গিয়ে একটা উঁচু পাথরে বসে পড়ল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

আবদুল লাশ দুটির কাছে গেলো। পুরুষটার শরীর সোজা করে দিয়ে তার মুখের দিকে চাইতেই স্তব্ধ হয়ে গেলো সে —আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল যেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আরে, এ যে ফজল!'

তারপর সে তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে সোজা করতেই চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'রজ্জি ···রজ্জি!'

সরস্বতী পাথর থেকে উঠে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'তোমার··· তোমার···'

'আমার বোন।' আবদুল অশ্রুরুদ্ধ গলায় জবাব দিলো।

গঙ্গা বলল, 'এখনো বেঁচে আছে কিন্তু, নিশ্বাস পড়ছে।'

সরস্বতী বলল, 'খুব জল খেয়েছে। আয় গঙ্গা, ওর পেটের জল বের করে দিই। আবদুল, তুমি ওকে ছাখো।'

আবদুল ফজলকে উপুড় করে দিয়ে তার পেটের জল বের করে দিতে শুরু করল, কিন্তু ফজলের শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না আদৌ। আবদুল তার হাত দু'খানাকে ওপরে-নিচে করতে করতে মুখে ফুঁ দিলো, হৃৎপিণ্ডের কাছে হাত দিয়ে রগড়ে দিলো কয়েকবার। ক্রমশ জোরে ফুঁ দিতে লাগল তার মুখে, হাত দিয়ে ঘষে ঘষে তার শরীরটাকে গরম করে তোলার চেষ্টা করতে থাকল। তারপর আপনা থেকেই ফজলের শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে শুরু করল, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। আবদুল উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'রজ্জি!, রজ্জি! এর আগে সে কোনো কথা বলার অবকাশ পায়নি।

'রঞ্জি ঠিক আছে।' গঙ্গা আনন্দে চিৎকার করে জবাব দিলো।

সরস্বতী বলল, 'ওদের বাড়িতে নিয়ে চলো। গরম দুধে খেজুর আর বদ্‌তুর শেকড় গুলে খাওয়াব। গা গরম হলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আবদুল ফজলকে নিল, সরস্বতী ও গঙ্গা রঞ্জিকে।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কত দূর?'

সরস্বতী বলল, 'ঐ যে চখ্‌রির গাছ দেখা যাচ্ছে, ওর পেছনেই। বেশী দূর না, চলে এস।'

বাড়িটা খুব দূরে নয়। ছোটখাটো বাড়ি। উঠোনের পাঁচিলের ওপর মাদার গাছের ডালপালা ঝুঁকে আছে। ভেতরে উঠোনের চালায় দুটি গরু বাঁধা রয়েছে।

দাওয়ার একপাশে উনুন। এক বুড়ি রুটি সেঁকছে। ওরা দল বেঁধে ভেতরে ঢুকতেই সে হতচকিত হয়ে চেয়ে রইল ওদের দিকে। উনুনে যে-রুটি সেঁকতে দিয়েছে, সেটা পুড়ে যাচ্ছে।

ওরা দাওয়া পেরিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করল। একপাশে একটি বিছানা পাতা রয়েছে। গঙ্গা ও সরস্বতী রঞ্জিকে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

বৃদ্ধা কোনো কথা না বলে চুপচাপ ভেতরে এসে দাঁড়াল।

সরস্বতী জিজ্ঞেস করল, 'মা, দুধ দুয়েছ?'

'আগে কি আমি কখনও দুধ দুইতাম?' বৃদ্ধা বেশ রুষ্ট গলায় জবাব দিলো। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটি কে?'

সরস্বতী কোনো উত্তর দিলো না। সে একটা মটকি নিয়ে দুধ দুইতে গেলো। আবদুল গিয়ে চালার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

বৃদ্ধা তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে বাছা?'

সরস্বতী বলল, 'ও একজন মুসাফির।'

'কিন্তু ও কাদের লোক? আর ঐ বেটাছেলে মেয়েমানুষ দু'জনই বা কে?'

গঙ্গা পাথরের শিল-নোড়ায় বদ্‌তুর শেকড় পিষতে পিষতে উত্তর দিলো, 'মা, ওরা কাগানের জলের ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। তাই দেখে আমরা তুলে এনেছি। হয়ত বেঁচে যাবে। আমাদের সঙ্গে তুমিও একটু হাত লাগাও না, মা! তাড়াতাড়ি লেপের একটু তুলো বের করে আগুনে গরম করে দাও, সেঁকতে হবে ওদের।'

'কিন্তু ওরা কে?'

'আমি কি জ্যোতিষ জানি?' —গঙ্গা ঝাঁজাল গলায় বলে উঠল, 'যে মুখ দেখে নাম বলব, ঠাঁই-ঠিকানাও বলে দেবো। এখনো তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে দু'জনেই। আগে জ্ঞান ফিরে আসুক, তখন না-হয় জিজ্ঞেস করা যাবে!'

মা আবদুলকে দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু ও তো বেহুঁশ হয়ে নেই, ওর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোচ্ছে না কেন?'

সরস্বতী তাড়াতাড়ি বলল, 'ওর নাম রামভরসা।' এই বলে সরস্বতী মটকি নিয়ে উঠল। আবদুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তার পা মাড়িয়ে দিলো। উনুনের কাছে গেলো দুধ গরম করতে।

'রামভরসা!' মা আবদুলকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেখতে বলল।

আবদুল মা-র দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। খুশী হয়ে হাত জোড় করে মাকে নমস্কার করল সে।

* * *

বদ্যুর শেকড় রামবাণের মতোই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী। অতএব রজ্জির জ্ঞান ফিরে এল খুব শীগ্‌গীর। জিজ্ঞেস করল, 'ফজল কোথায়?'

আর ফজলের জ্ঞান ফিরে আসতেই তার মুখ দিয়ে বেরোলো, 'ইয়া আল্লা!'

তাই শুনে মা চমকে উঠল একেবারে, কারণ সেই ঘরেরই একপাশে ঠাকুর রয়েছে। বাইরের দাওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের যাতায়াত আছে কিন্তু এই ঘরখানা তার মেয়েদের শোবার ঘর, সেই সঙ্গে ঠাকুরঘরও। সমস্ত ভ্রষ্ট হয়ে গেলো এখন। এমন সময় হঠাৎ রজ্জির চোখ পড়ল আবদুলের ওপর। অমনি সে বলে উঠল, 'আবদুল ভাই ...তুমি?'

ভাই-বোন দু'জন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

মা অগ্নিশর্মা হয়ে সরস্বতীকে বলল, 'তুই যে বললি, ওর নাম রামভরসা?'

সরস্বতী নিতান্ত ভালোমানুষী গলায় জবাব দিলো, 'তাই তো বলেছিল ও।'

'এখন গঙ্গাজল দিয়ে এ ঘর শুদ্ধ করতে হবে। জানিস তো, নন্দুশাহ হরিদ্বার থেকে টিনে করে গঙ্গাজল আনে, এখানে তার দু'ঢোক জলের দাম আট আনা— আমি আট আনা পয়সা কোত্থেকে পাই এখন?'

আবদুল বলল, 'আট আনায় দু'ঢোক জল? কিন্তু মা, তোমার ঘরেই তো গঙ্গা রয়েছে!'

গঙ্গা হাসতে শুরু করল।

কিন্তু মা এ সব ব্যাপারে হাসি-ঠাট্টা বোঝে না। সে মেয়েদের ধমকাতে লাগল। ওদিকে রজ্জি, ফজল আর আবদুলের মধ্যে নিজেদের কথাবার্তা চলছে। সরস্বতী ওদের কাছে আগুন জ্বালাতে বসল। ধোঁয়া যাতে কম হয়, সে জন্যে ফুঁ দিতে লাগল সে।

'গঙ্গা, এ কি করলি মা তুই? সরস্বতী, তোর জ্ঞানগম্যির কি হলো বল দেখি!' বৃদ্ধা এক নাগাড়ে বলে চলেছে।

সরস্বতী বলল, 'মা, উনুনে রুটি পুড়ছে।'

মা তিতিবিরক্ত হয়ে জবাব দিলো, 'পুড়ুক। পুড়ে যাক সব। আমার ঘরে মুসলমান ঢুকেছে, আমি পাড়াপড়শীর কাছে মুখ দেখাব কি করে!'

গঙ্গা মুখ ভেংচে বলল, 'আহা, পাড়াপড়শী! এখানে তোমার পাড়াপড়শী

কে আছে শুনি ? এক আছে মিশির বুআরামের বাড়ি। বাবা যখন মারা গেলো, সুখে মরল না দুঃখে মরল, তাদের বাড়ির কেউ কি সে কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল ? ওরা কখনও আমাদের খোঁজ-খবর নেয় ? অমন পাড়াপড়শীর পা ধুয়ে কি জল খাব আমরা ?'

'হুঁ !'

সরস্বতী বলল, 'গতবার আমাদের জমি চাষ করে দিয়েছিল কে ? বুআরাম মিশির আর তার ছেলে ? না খুদাবক্সের ছেলে মঞ্জুর ! ঠাকুর ওদের ভালো করুন।'

গঙ্গা জিজ্ঞেস করল, 'আর আমাদের ফসল কেটে এনে গাদা করে দিলো কে শুনি ? বুআ মিশিরের ছেলে, না আলিজুর জামাই গুল্লা ?'

বৃদ্ধা দু'হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'ও সব আমি কিচ্ছু জানিনে। আমার ঠাকুরঘর ভ্রষ্ট হয়েছে. এখন ঠাকুরকে গঙ্গাজলে নাওয়াতে হবে —কম-সে-কম এক টাকার জল চাই।'

'কাগানে তো অনেক জল !' নিজেদের কথাবার্তার মাঝখানে আবদুল হঠাৎ মা-র দিকে চেয়ে বলল কথাটা।

বৃদ্ধা ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'কি করব, আমি অসহায়, বিধবা মানুষ। আমার স্বামী যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে তোমার এ কথার উচিত জবাব দিত। আমি কি আর বলব ! নন্দুশাহ আমাদের সাহুকার, আট আনায় গঙ্গাজল দেয় দু'ঢোক। ঘরে কেউ মরলে কিংবা কারোর জন্ম হলে সেই গঙ্গাজলই নিয়ে আসতে হয় আমাদের। এত দাম দিয়ে লোকে ও-জল কিনবে কি করে ! অবশ্য এটাও ভেবে দেখার কথা, এই অধর্মের দেশ কাশ্মীরে আমরা দু'চারটে ব্রাহ্মণ যারা এখনো বেঁচে-বর্তে আছি, তাদের জন্যে নন্দুশাহ অদ্দূর থেকে গঙ্গাজল আনিয়ে রাখে, সেটা তার নিতান্তই দয়া। নইলে অ্যাদ্দিন তো আমাদের সর্বনাশের কিছু বাকি থাকত না ! —কিন্তু এখন ঠাকুরকে নাওয়ানোর জন্যে এক টাকা পাই কোথায় ?' বৃদ্ধা ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেলল।

আবদুল উঠে এল কাছে। পকেট থেকে একটি টাকা বের করে সে মায়ের হাতে দিয়ে বলল, 'মা, টাকাটা নাও। আমরা চলে গেলে তুমি তোমার ঠাকুরকে নাইয়ে দিও।'

বৃদ্ধা অবাক বিস্ময়ে আবদুলের দিকে চেয়ে রইল —এ কেমন মুসলমান ! তার ঠাকুরঘর শুদ্ধ করার জন্যে সে নিজেই পয়সা দিচ্ছে ! মা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, যেন সে নিজের চোখকে, আবদুলকে, নিজের হাতের ঝকমকে টাকাটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

আবদুল মৃদু হেসে বলল, 'বাজিয়ে দেখে নাও, মেকীটেকি নয়।' ঠিক তখনই বৃদ্ধার হাত থেকে টাকাটা পাথরের শিলের ওপর পড়ে গেলো। অমনি চাঁদির

টাকা ঝন্‌ঝন করে বেজে উঠল। বৃদ্ধার মুখচোখে খুশী ও কৃতজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি টাকাটা তুলে নিয়ে সালোয়ারের পকেটে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

* * *

ফজলের গায়ে একটু বল ফিরে আসতেই আবদুল তাকে উঠিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলো। তারপর জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কি হয়েছিল? শীগ্‌গীর বলো না, কি হয়েছিল?'

রজ্জি কাছেই শুয়ে ছিল, বাধা দিয়ে বলল, 'না ফজল, এখন না···'

'না। এক্ষুনি বলো।'

ফজল বলল, 'রাজা করম আলি তোর আব্বাকে খুন করেছে। রজ্জিকেও নিয়ে যেতে চাইছিল।'

আবদুল কেঁপে উঠল। থর্‌থর করে কাঁপতে লাগল তার সারা শরীর, যেন একটা ভাঙা গাছ কাগানের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার দেহ ও মন প্রচণ্ড রাগ, লজ্জা, অসহায়তা ও প্রতিশোধস্পৃহার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যেন ওলট-পালট খাচ্ছে। সাঁড়াশীর মতো প্রচণ্ড জোরে সে ফজলের হাত চেপে ধরল।

হঠাৎ সরস্বতী এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'তারপর··· তারপর···'

ফজল বলল, 'ফসলের ভাগ দেওয়া নিয়ে ঝগড়া। টিকরী শাহমুরাদের চাষীরা জায়গীরদারকে ফসলের ভাগ দিতে চায়নি। তাতে রাজা ফৌজ নিয়ে এসেছিল।'

'তারপর?' আবদুল ভীষণ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ফজল তার মুখের দিকে লক্ষ্য করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে আবদুলকে দেখল সে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তারপর মানুষের সাঁকো তৈরী করল। আর তোর বোন সারা রাত রাজার তাঁবুতে ছিল।'

আবদুলের গলায় যেন একটা বড় পাথর আটকে গেছে, বুকেও যেন এক বিশাল পাথর জমাট হয়ে বসে আছে, আর তার পা দু'খানি যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠেছে। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না, তার মাথার মধ্যে সব কি রকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যাকুলতা নিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'তারপর!' ফজল মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তারপর আর কি, রাজা তোর বোনকে বিয়ে করতে চায়।'

রজ্জি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। গঙ্গা ও সরস্বতীর চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আবদুল ঠায় চেয়ে রইল ফজলের দিকে। পাষাণ বুক ঠেলে তপ্ত অশ্রু বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দিয়ে, ফজলের কাঁধে মুখ লুকাল সে। ফজল তাকে জোরে চেপে ধরল। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি হবে? পুলিশ তো নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নিয়েছে।'

গঙ্গা বলল, 'হ্যাঁ, সে তো নেবেই।'

আবদুল কি যেন ভাবছে। সরস্বতী জোরে আবদুলের কাঁধ ধরে বলল, 'শোন, তোর বোন আমার কাছেই থাকবে, ওর স্বামীও। এখানেই থাকবে ওরা, পুলিশ কোনোদিন পাত্তাও পাবে না—ভাবতেই পারবে না যে, দু'জন মুসলমান কোনো ব্রাহ্মণের বাড়িতে লুকিয়ে আছে।'

গঙ্গা খুশী হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই ঠিক হবে। আবদুল ভাই, তুমি রজ্জি আর ফজলকে আমাদের কাছে রেখে যাও।'

আবদুল বলল, 'তোমাদের মা কি বলে? তোমাদের সমাজ ···তোমাদের ভগবান···'

গঙ্গা বলল, 'সরস্বতী মাকে ঠিক সমঝে দেবে। আর আমরা সমাজকে কেয়ার করিনে। আর ভগবান···' গঙ্গা পবিত্র বিগ্রহের দিকে একবার তাকাল, তার পায়ের কাছে বসে পড়ে মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। তারপর বিগ্রহটাকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দাওয়া পেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেলো সে। কিছুক্ষণ পর যখন সে ফিরে এল, তখন তার হাতে কিছুই নেই।

আবদুল রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি করলে তুমি?'

গঙ্গা বলল, 'ঠিকই করেছি। এখানে মঞ্জুর ভাই আসে, আলিজুর জামাই গুল্লাও আসে। ওরা গাঁয়ের লোক, পাড়াপড়শী, আমাদের সব কাজ করে দেয়। মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বেশী মনে করে আমাদের। কখনও আমাদের খারাপ চোখে দেখে না। কিন্তু মা ওদের ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেয় না, কারণ ঘরে আমাদের ঠাকুর থাকত যে। তাই ঠাকুরকে এমন এক জায়গায় রেখে এলাম, আমরা ছাড়া সে জায়গা কেউ মাড়াবে না।'

সরস্বতী বলল, 'পাগলী কোথাকার! কোথায় রেখে এলি?'

'দেখাব দিদি। সকালে পুজোর জন্যে তোকে তো যেতেই হবে।'

চখ্‌রি গাছে একটা ফোকর ছিল, গঙ্গা বিগ্রহটিকে সেখানে বড় যত্নে রেখে দিয়েছে। গাছটার চারপাশে একটা বেড়া তৈরী করাই ছিল। গঙ্গা বলল, 'আমরা তিন মা-মেয়ে ছাড়া এখানে আর কেউ আসবে না, ঠিক তাই না? শোবার ঘরের চেয়ে তো এ জায়গাটা বেশী পবিত্র।'

সরস্বতী বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভালোই হয়েছে, না মা?'

মা কোনো জবাব দিলো না।

* * *

সরস্বতী আর গঙ্গা যখন চখ্‌রি গাছের কাছ থেকে ফিরে এল, তখন আবদুল যাওয়ার জন্যে তৈরী।

সরস্বতী বলল, 'যাবে যখন অন্তত খেয়ে যাও।'

'না।' শক্ত গলায় জবাব দিলো আবদুল। নিজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হয়ে গেলো সে। অনুতপ্ত হয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, 'না সরস্বতী, এখন খিদে নেই আমার।'

আবদুল গঙ্গার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই বড় পাগলী গঙ্গা।'

'আর তুমি খুব বুদ্ধু দাদা!' আবদুলের গলার নকল করে গঙ্গা বলল, সঙ্গে সঙ্গে লাল টুকটুকে পাতলা জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

আবদুল হাত জোড় করে বৃদ্ধাকে বলল, 'আমি যাচ্ছি মা। আমার বোনটাকে নিজের মেয়ে মনে করে কাছে রাখবেন।'

মা কোনো জবাব দিলো না। আবদুল উঠোন পেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো—খুব আস্তে আস্তে ···ধীর পায়ে।

ফজল আর রজ্জিকে এখানে রেখে যেতে ইচ্ছে করছিল না তার, কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও নেই। দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে চখ্‌রি গাছটার দিকে তাকাল, মৃদু হেসে বলল, 'ভগবান, ওরাও তোমার সন্তান।' তারপর সে সামনের রাস্তায় পা বাড়াল। এমন সময় কে তার জামার আস্তিন ধরে টানল। পেছন ফিরে দেখে, সরস্বতী। হাঁপাচ্ছে সে। তার এক হাতে একটা পুঁটলি। তাড়াতাড়ি সে পুঁটলিটা খুলল। তাতে রয়েছে শুকনো খোবানি, খোসা ছাড়ানো আখরোট, ভুট্টার খই ···আর গুড়।

সরস্বতী পুঁটলিটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এটা নিয়ে যা। তুই তো কিছু মুখেও দিলিনে ···' বলেই সে বাড়ির দিকে দৌড়ে পালাল।

আবদুলের মনে 'তুই' শব্দটা আবার বিজলীর মতো লাফিয়ে উঠল, যেন কেউ অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আবদুল সেই উজ্জ্বল আলোর প্রদীপ হাতে নিয়ে নির্জন পথে আবার পা বাড়াল। পথটা গেছে তার আব্বার কবরের দিকে।

চার

নূরা জোলাকে কবর দিয়ে যখন টিকরী শাহমুরাদের মানুষ গাঁয়ে ফিরল, তখন ইলমদীন নম্বরদারের বাড়ির সামনে লোক গম্‌গম করছে। প্রায় এক হাজার কৃষক। কারণ নূরা জোলাকে খুন করা, মানুষের সাঁকো বানানো এবং রজ্জি ও ফজলের জলে ডুবে যাওয়ার খবর রাহু, বড়ওয়ারা, জানোরা, ঝাঁগ্‌নি প্রভৃতি আশপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সব গ্রামের কৃষকেরাও জমিদারকে ফসলের ভাগ দেবে না বলে ঠিক করেছে, তাই এখন তারাও বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত কিছু আলোচনা করার জন্যে, এবং সেইসঙ্গে টিকরী শাহমুরাদের মানুষদের

সমবেদনা জানানোর জন্যে পঞ্চাশজন একশোজন করে দল বেঁধে বেঁধে হাজির হয়েছে। সকলেরই মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত, কেউ কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত, তবু প্রত্যেকের মনেই প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহার অগ্নিশিখা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

পরিস্থিতির জটিলতা উপলব্ধি করে ইলমদীন রাহু গ্রামের চুটকি দাড়িওয়ালা মৌলভী জালালউদ্দিনকে 'ওয়াজ' (ধর্মোপদেশ) শোনানোর জন্যে ডেকে আনিয়েছেন। শোনা যায়, তিনি না-কি ইংরেজি খবরের কাগজও পড়তে পারেন। রাজা জীবনসিং জায়গীরদারের দরবারে তিনি পঞ্চম সভাসদ। তাঁর দুই স্ত্রী, পাঞ্জাব থেকে তাদের বিয়ে করে এনেছেন, বোরকা পরে। মৌলভী জালালউদ্দিনের রঙ ফরসা, কণ্ঠস্বর যেমন গম্ভীর, তেমনি কর্তৃত্বপরায়ণ। লোকে তাঁর ওয়াজ খুব মন দিয়ে শোনে, সরল কৃষকেরা তাকে আল্লার বাণীর মতো সত্য বলে মনে করে।

মৌলভী জালালউদ্দিন ছাড়াও ঝাঁগ্নি গ্রামের 'মাজারে মুবারক'-এর (পবিত্র সমাধির) ধর্মগুরু ও সিদ্ধিলব্ধ ফকির পীর হিরনাশাহ্ও এই উপলক্ষে দর্শনদানের জন্যে হাজির হয়েছেন। পীর হিরনাশাহ্ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। কথিত আছে যে, তাঁর পীর ও গুরু মুবারকশাহের 'মাজারে' (সমাধিতে) প্রায় প্রতি রাতেই বহু জংলী হরিণ এসে মলমূত্র ত্যাগ করে জায়গাটিকে অপবিত্র করে দিত। একদিন পীর হিরনাশাহ্ মাঝরাতে ধ্যান থেকে উঠে এক পাল হরিণকে ক্রীড়ামত্ত অবস্থায় দেখতে পান। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের পাথরে পরিণত করে দেন, অর্থাৎ জলজ্যান্ত হরিণ তাঁর অভিশাপে তৎক্ষণাৎ প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। অমনি সে দিন থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় পীর হিরনাশাহ্। সারা এলাকা জুড়ে মানুষ পীর সাহেবকে সম্মান করে, বিশেষ করে মেয়েরা তো পুজো করে তাঁকে। তিনি প্রসন্ন হলে মানুষ তত খুশী হয় না, কিন্তু গালাগালি দিলে তারা ভীষণ খুশী হয়। শোনা যায়, যখন হিরনাশাহ্ কখনো কাউকে গালিগালাজ দিয়ে কিছু বলেন, তখন তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, আর তিনি প্রসন্ন হলে ধরে নিতে হয়, আসলে তিনি খুশী নন, জাগতিক আচার-ব্যবহারের দ্বারাই কার্যসিদ্ধি করতে চাইছেন। সে জন্যে পীর হিরনাশাহ্ যাতে গালিগালাজ দেন, কৃষকেরা সব সময় সেই চেষ্টাতেই থাকে।

জটলার মধ্যে কথা বলতে বলতে মানুষগুলোর উত্তেজনা যখন রীতিমতো চড়ে গেছে, কিছু কিছু যুবক চাষী সরাসরি পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতেও পিছপা নয়, তখন মৌলভী জালালউদ্দিন উঠে ঘণ্টা দুয়েক ধরে 'ওয়াজ' করলেন। এ কথা সে কথা বলতে বলতে, মুসলমানদের সাচ্চা মুসলমানে পরিণত হওয়ার আদেশ দিয়ে, তাদের গৌরবময় অতীতের চিত্র তুলে ধরে, তাদের বর্তমান দুর্দশার জন্যে শোক প্রকাশ করে বললেন যে, যদি তারা সাচ্চা মুসলমান হতো, তাহলে এখানে খাদ্যশস্যের এমন আকাল পড়ত না। আল্লা তাঁর বিপথগামী উম্মতের (ঈশ্বরের আদেশ

পালনকারী সম্প্রদায়) ওপর তাঁর কহর (কোপ) বর্ষণ করছেন। তারপর বললেন, 'হে মুসলমানগণ, এই কহরকে ভয় করো। সাচ্চা রাস্তায় চলো।' তারপর তিনি চট করে প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে নূরা জোলার মৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশ করলেন। পুলিশ ও ফৌজের উদ্দেশেও ভালোমন্দ অনেক কিছু বললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বক্তৃতার উপসংহার টানলেন এই বলে যে, যখন যিনি রাজা, তখন তাঁর তাঁবেদারি করাই প্রত্যেক মুসলমানের 'ফরজ' (অবশ্যকর্তব্য)। 'কালামে ইলাহী'-তেও (কোরান শরীফেও) সে কথা লেখা আছে, আর যে-মুসলমান সে কথা মেনে চলে না, সে 'কাফের'।

দু'ঘণ্টা ধরে এ রকম তথ্যপূর্ণ মূল্যবান 'ওয়াজ' করার পর মৌলভী জালাল-উদ্দিনের ধারণা হলো, তিনি কৃষকদের ঠাণ্ডা করতে পেরেছেন। তারপর তিনি ইলমদীনের বাড়িতে পদধূলি দিতে গেলেন —আহারাদি সারতে। এ দিকে এখন পীর হিরনাশাহের পালা। হিরনাশাহ্ উঠেই আগে সমাবেশের চারদিকটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। হঠাৎ হা-হা করে হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে চুপ করে গিয়ে কাঁপতে শুরু করলেন, তারপর হাত নেড়ে কৃষকদের গালাগালি দিতে দিতে বললেন, 'কহরকে ভয় কর। হরিণ পাথর হয়ে গেছে, তেমনি তোরাও পাথর হয়ে যাবি। যত্তো সব বাঞ্চোৎ··· মাদার··· ! এক নম্বরের পাজী বদমাশ ! ফালা-ফালা করে দেবো তোদের। যার যা হিস্‌সা তাকে তা দিয়ে দে। ওপর-ওয়ালা যখন যাকে পয়দা করেছেন, তখনই তার হিস্‌সা সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়েছেন। যার যা হিস্‌সা সে তা পাবে। জায়গীরদারের হিস্‌সা জায়গীরদার পাবে, মাজার-ওয়ালার হিস্‌সা মাজারওয়ালা পাবে। বে-পীর হারামজাদারা! শুয়োরের বাচ্চারা!' গালাগালি দিতে দিতে হিরনাশাহ্ পীরের মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙতে লাগল, আর তারপরই বেহুঁশ হয়ে গেলেন তিনি, যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন। অনেক কৃষক 'কহর'-এর বর্ষণ সম্ভাবনায় শিউরে উঠল। কেউ কেউ বলল, 'পীর সাহেব সত্যি কথাই বলেছেন।' কেউ কেউ বলল, 'মৌলভী সাহেবও খাঁটি কথা বলেছেন। আমাদের নিজেদের মৌলভী সাহেব, নিজেদের পীর সাহেব —ওঁদের বাক্যি তো খোদার বাক্যি···'

প্রথমে আস্তে আস্তে কথাবার্তা চলছিল, তারপর গলার স্বর ক্রমশ চড়তে লাগল, একজন আর এক জনকে দোষ দিতে শুরু করল। সর্বাগ্রে কার মাথায় ফসলের ভাগ না দেওয়ার এমন দুষ্ট বুদ্ধি গজিয়েছিল, কে কে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল— তাই নিয়ে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল তারা। দু' একজন কৃষক হাত-পা ছুঁড়তেও শুরু করল, আর তারপরই ঝগড়া বেধে গেলো, কেউ কেউ লাঠি তুলে নিল হাতে। শেষ পর্যন্ত মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম, এমন সময় সুলতান, এতক্ষণ একটেরে বসে ছিল, উঠে বলল, 'ভাইসব, নিজেদের মধ্যে তোমরা মারামারি করছ, জগৎ-সংসার সম্বন্ধে তোমাদের কি কোনো হুঁশ আছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হুঁশ আছে। তুই ভারি হুঁশওয়ালা এসেছিস! কালকের ছোকরা, সে দিন তুই কথা বলতে গিয়েই সারা গাঁয়ের নাক-কান কেটে দিলি।' রহমান তার লাঠি ঝাড়ল সুলতানের দিকে। সুলতান সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাল। চড়া গলায় বলল, 'লোকের কথায় মুখ্যু সাজতে যেও না। নিজেরা ভেবে দেখো— এইভাবে যদি ফসল দিতে থাকো, তাহলে নিজেরা কি খাবে?'

'তোর মাথা!' বলেই রহমান আবার লাঠি তুলল, কিন্তু নবীবক্স তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। বলল, 'আরে, আগে ছোঁড়াটাকে তার কথা শেষ করতে দে না! কি বলে দেখি।'

সুলতান বলল, 'আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু বলতে চাই, নিজেদের মধ্যে এ রকম দলাদলি করলে সব চাষীকেই মরতে হবে। আর যদি একজোট হয়ে থাকো, তাহলে জায়গীরদারের পুলিশ ফৌজ মিলেও আমাদের কিছুই করতে পারবে না।'

অনেকে তাতে সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু কি করব আমরা?'

'কি করা উচিত, সেটা আমিও জানিনে। তবে এটুকু অন্তত জানি, রাজা করম আলি যে রকম মান্যগণ্য ব্যক্তি, আর সে দিন যেভাবে কাগানের নালায় ডুবে মরতে মরতে কোনো রকমে বেঁচে গেছেন, তাতে তিনি ভীষণ রেগে আছেন। রেগে গিয়ে আমাদের গাঁয়ের ওপর দুশো টাকা জরিমানা ধরেছেন, আর আশপাশের গাঁয়ের ওপরও তিনশো টাকা…'

'মিথ্যে কথা… মিথ্যে কথা…' অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল।

'এইমাত্র রহমান আমাকে বলেছে, জিজ্ঞেস করো।'

কয়েকজন রহমানের ঘাড় চেপে ধরল, 'বল, কি বলেছিস তুই?'

রহমান চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ক্রোধান্ধ কৃষকেরা তাকে ঘিরে রয়েছে। সে অস্ফুট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা আমাকে ইলমদীন বলেছিল। আর বলেছিল, আমি যেন কাউকে না বলি।'

বহু চাষী একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় সেই শুয়োরের বাচ্চা ইলমদীন? সামনে নিয়ে আয় ওকে!'

গুলাম নবী বলল, 'ও জালালউদ্দিন মৌলভীকে নিয়ে বাড়ি গেছে।'

লম্বা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে একজন বলল, 'ওর মাকে নিয়ে যাক, জংলী ভালুক কোথাকার! চল, ওর বাড়ি চল। আজ জিন্দা কবর দেবো ওকে —ব্যস ঐ ওর ওষুধ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ওর ওষুধ।' কয়েকজন কৃষক মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেলো।'

'থামো!' সুলতান নিজেই এখন কৃষকদের উত্তেজনা দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

সে ভাবতে পারেনি, তার কথা এতখানি কার্যকর হবে। মনে মনে খুশী কিন্তু ভয়ও হচ্ছে —এখন কি হবে! কি করা যায় এখন! তার নিজের মধ্যে কি এক নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটেছে —সেটা উপলব্ধি করছে সে, আবার ভয়ও হচ্ছে।

সুলতানের দিকে প্রায় এক হাজার লোক চেয়ে রয়েছে চুপচাপ। সকলের চোখে-মুখে একই প্রশ্ন।

সুলতান বলল, 'চারদিকে পুলিশ ছড়িয়ে আছে, একটু বেচাল দেখলেই সব ক'টাকে ভাজা-ভাজা করে ছাড়বে। এক নূরা জোলার জায়গায় একশো কবর খুঁড়তে হবে। অন্য কোনো উপায়ের কথা ভাবো।'

একটি যুবক তেরিয়া মেজাজে বলল, 'সেটা তুমিই বলো না! নিজের বোনকে কি জায়গীরদারের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেবো?'

'আমি বলছি, বড় জায়গীরদার সাহেব, মানে রাজা জীবনসিংয়ের খিদ্‌মতে আমরা একটা দরখাস্ত করি না কেন, যে আমাদের ওপর সরকারের কর্মচারীরা, পুলিশ-ফৌজ আর ছোট জায়গীরদার কি রকম অত্যাচার চালাচ্ছে —রাজাসাহেব নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনবেন। শুনেছি, বড় রাজাসাহেব খুব ভালোমানুষ।'

'তাহলে লেখো দরখাস্ত!' একজন কৃষক বলল।

'তাহলে লেখো দরখাস্ত!!' তিনজন কৃষক সায় দিলো তাতে।

'হ্যাঁ, লেখো, লেখো দরখাস্ত!!! এক্ষুনি লেখো!' তিনশো কৃষক সম্মতি জানাল সে কথায়।

কে একজন সামনে হাড়ী গাছে আট্‌কানো পুলিশের নোটিশ ছিঁড়ে এনে সুলতানের সামনে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, লেখো। এতেই লেখো দরখাস্ত। লেখো শীগ্‌গীর।'

সুলতান হতাশা প্রকাশ করল, 'কিন্তু আমি তো লিখতে জানিনে।' অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল সে।

এক হাজার লোক হতাশ হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। কেউ লিখতে জানে না। লিখতেও জানে না, পড়তেও জানে না। তাদের ভাষা আছে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আবেগ আছে, আর আছে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি। তাদের মেহনত আছে, প্রেম আছে, আর আছে মা-বাবার স্নেহ। তাদের গান আছে, কবিতা আছে, শক্তি আছে, আর আছে চোখের জল। তাদের কর্মতৎপরতা আছে, প্রচেষ্টা আছে, আর আছে নিরন্তর অধ্যবসায়ের সৌন্দর্য —কিন্তু তারা লিখতে পড়তে জানে না। কেউ যেন তাদের সব কিছু দিয়েও আবার সমস্তই ছিনিয়ে নিয়েছে। এক হাজার কৃষক অক্ষম অসহায় হয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকাচ্ছে —যেন কেউ শক্তি থেকে কর্মতৎপরতা কেড়ে নিয়েছে, কবিতা থেকে ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছে, আর গান থেকে সুর কেড়ে নিয়েছে। যেন

কেউ সৌন্দর্য থেকে লাবণ্য, লাবণ্য থেকে জ্যোতি, আর জ্যোতি থেকে তার ঔজ্জ্বল্য কেড়ে নিয়েছে। এভাবেই তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে চলেছে। যেমন কুঁড়ি তার ফুলে, নারী তার মাতৃত্বে এবং রচনা তার যুগোত্তরণে সার্থকতা লাভ করে, তাদের অধ্যবসায়ের সে রকম কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল নেই।

রাগে জলতে জলতে এক হাজার লোক নিতান্তই অসহায় অক্ষম হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ কে একজন সামনে আবদুলকে এগিয়ে আসতে দেখে, অমনি এক হাজার কণ্ঠ থেকে এক আনন্দের চিৎকার বেরিয়ে আসে, সবাই আবদুলের দিকে ছোটে। অতগুলি লোককে একসঙ্গে দৌড়ে আসতে দেখে আবদুল তো প্রথমে হকচকিয়ে গেলো। সে হয়ত দৌড়েই পালাত, কিন্তু তার আগেই লোকগুলো গিয়ে ঘিরে ফেলল তাকে। একজন কৃষক পুলিশের নোটিশের কাগজটাকে উল্টিয়ে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'লেখো —লেখো!' আর একজন হাড়ীগাছের একটা ছোট্ট ডাল ভেঙে নিয়ে তার হাতে গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'লেখো ···লেখো···'

আবদুল তো কিছু বুঝে উঠতেই পারছে না কি ব্যাপার! জিজ্ঞেস করল, 'কি লিখব?'

এক বুড়ো চাষী বলল, 'লেখো! এতে লেখো যে, রজ্জি বলে আমার এক মেয়ে ছিল, সে আজ মারা গেছে।'

আর একজন বলল, 'লেখো, চাষ করার জন্যে আজ আমার বলদ নেই।'

তৃতীয় জনের বক্তব্য, 'আমার জমিজমা এখন মীরাশাহের কব্জায় —রাজা জীবনসিংজী, আমার জমি ফেরৎ দিতে বলুন —লেখো, তুমি লিখছ না কেন?'

কৃষকেরা আবদুলের হাত চেপে ধরল।

পঞ্চম ব্যক্তি স্পষ্ট জানাল, 'লেখো, আমরা মরব, তবু আর জুলুম সহ্য করব না। আমরা গুলি খেয়ে মরব, কিন্তু আমাদের মেয়েদের বেইজ্জতী দেখব না। আমরা জান বাজি রাখব, তবু আমাদের ছেলেমেয়েদের ভুখা রেখে ছোট জায়গীরদারের পেট ভরাব না —লেখো, লেখো —লিখছ না কেন তুমি?'

আবদুলের কব্জিতে কৃষকদের নখ ক্রমশ চেপে বসছে। নিজের মুখ-চোখের ওপর এক হাজার কৃষকের শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করছে সে। গরম গরম রক্তের শ্বাস-প্রশ্বাস —যেন তার সারা শরীরে জালা ধরিয়ে দিচ্ছে। এক হাজার লোক ক্রমাগত ফুঁ দিয়ে যে আগুন জালছে, সেই আগুনে সে যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। কৃষকেরা জোর করে তার হাত ধরে আছে, তার কব্জিতে তাদের নখ বসে যাচ্ছে। চারদিক থেকে তারা শুধু বলছে— 'লেখো —লেখো —লেখো ···শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কাহিনী —আজ সেই কাহিনী বলছি, এই কাগজে লিখে দাও, হাড়ীগাছের ঐ ছোট্ট ডাল দিয়ে লিখে দাও।'

আবদুল তার কব্জিতে বসে যাওয়া নখের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে বলল,

'কিন্তু ···কিন্তু লিখব কি করে? এখানে তো কালি নেই ···আর তোমরা আমার কব্জিটা আগে ছাড়বে তো!' আবদুল বৃদ্ধ কৃষককেই লক্ষ্য করে বলল কথাগুলো। বৃদ্ধ কৃষক তার হাত সরিয়ে নিল আবদুলের কব্জি থেকে। সে লজ্জা বোধ করল, কারণ আবদুলের কব্জি থেকে তখন রক্ত বেরোচ্ছে। আবদুল বৃদ্ধ কৃষকের দিকে তাকাল, তারপর নিজের হাত থেকে গড়িয়ে-পড়া রক্ত দেখল, আর তারপরেই সে হাড়ী গাছের ডালটা নিজের রক্তে ডুবিয়ে নিয়ে পুলিশের নোটিশটার উল্‌টো পিঠে লিখতে শুরু করল—

'মহামহিম মহানুভব ভূস্বামী রাজা জীবনসিং মহাশয়, অত্র পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে···'

রক্তের হাল্‌কা রেখা পুলিশ-নোটিশের কাগজের ওপর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল।

পাঁচ

মীরাশাহ নিজের ঘরে জাবদা খাতা খুলে হিসেব করছিল। এ ঘরটা একাধারে মীরাশাহের গদি, দোকান ও শস্যের গুদাম। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে শস্যের বস্তাগুলো ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। আর একদিকে গুড়ের বস্তা, চায়ের টিন, নস্যির কৌটো, একটা বড় র‍্যাগে কাপড়ের থান সাজানো, জিনিসগুলোর সামনে দুটি দাঁড়িপাল্লা। দেখতে দুটিই এক রকম, কিন্তু মীরাশাহ জানে, কোন দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা মাল কেনার জন্যে আর কোন দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা মাল বেচার জন্যে। পঁচিশ-তিরিশটি ছোটবড় টিনে শুকনো নারকেল, খোরমা, মিছরী আর কবিরাজী ও ইউনানী ওষুধপত্তর। দেওয়ালে রঙ-বেরঙের চুড়ির গোছা দড়িতে ঝুলছে। যেখানে মীরাশাহ বসে, তার পেছনের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণ, রাম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাজী, মহাত্মা গান্ধী ও মহারাজ হরিসিংয়ের ছবি টাঙানো। ছবিগুলোর নিচে রঙ-বেরঙের কাগজের শিকলি দেওয়ালের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে, শিকলিগুলিতে ছোট-বড় আয়না ঝোলানো, ছবির কাঁচের নিচে পুঁতির মালা লটকানো। তারই নিচে একটা বড় তোশকে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মীরাশাহ্ ফতেহ্‌দীন জোলার হিসেব কষতে ব্যস্ত। ফতেহ্‌দীন জোলা খুব বৃদ্ধ, ভীষণ দুর্বল, আর তার চেয়েও বেশী ঋণী। তার চোখে পশুর মতো অসহায়তা ও অজ্ঞতা —সাধারণত লোকে যাকে সরলতা বলে থাকে। এ সময়টা সে মীরাশাহের দিকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকাচ্ছিল, যেন তার সামনে সাক্ষাৎ ভগবান বসে আছেন।

লালা মীরাশাহ জাবদা খাতা থেকে মাথা তুলে বলল, 'ফত্তু, তোর হিসেব হয়ে গেছে। দু'বছরে তুই আমাকে যা কাপড় বুনে দিয়েছিস, আর আমি তোকে

দানা-সওদা যা দিয়েছি, সব মিলিয়ে একেবারে সমান সমান। আমার কাছ থেকে তোর আর কোনো পাওনা নেই।'

ফতেহ্‌দীন, অর্থাৎ ফত্তুর ধড়ে প্রাণ এল। কাঁপতে কাঁপতে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'আল্লার কাছে হাজার শুকুর (কৃতজ্ঞতা) লালা। কিন্তু এখন তো পশম কেনার পয়সা নেই যে আমার কাছে, কি করে কাজ চলবে!'

'কাঁচা পশম নিয়ে যা আমার কাছ থেকে, কিন্তু সুতো কাটার পয়সা দিতে পারব না আমি।' মীরাশাহ বড় সরলতার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি তৈরী মালের হিসেব ধরব কিন্তু।'

'আল্লা তোমার ভালো করুক লালা। আমাকে দানাও দিয়ে দাও তাহলে।'

'আচ্ছা, এখানে তবে বুড়ো আঙুলের ছাপ দে।'

ফতেহ্‌দীন বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে গেলে মীরাশাহ জিজ্ঞেস করল, 'তোর মেয়ে গুল আজকাল এ দিকে আসে না—কতদিন দেখিনি!'

ফতেহ্‌দীন খাতায় ছাপ দিয়ে মাথায় আঙুল মুছতে মুছতে চাপা গলায় বলল, 'সামনের ভাদরে ওর বিয়ে—এখন বাইরে একটু কম বেরোয়-টেরোয়—তাছাড়া, আজকাল খুব দাঙ্গা চলছে না! ঐ বেচারা নূরা...'

'আরে, তোর আবার ভয় কি ফত্তু! তুই কারোর সাতেও থাকিসনে, পাঁচেও থাকিসনে—গুলকে এ দিকে একটু পাঠিয়ে দিস, গোমতীর দেখার বড় ইচ্ছে।'

'আজকাল জামানা বদলে গেছে, লালা। নিচের গাঁয়ে দেখো, চাষীদের বুকে আগুন জ্বলছে—আগে এ রকম হতো কখনও—গোলমাল শুনতে পাচ্ছ?'

দু'জনেই চুপ করে গেলো।

নিচে টিকরী থেকে একসঙ্গে বহুলোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, নদীতে বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের গর্জন শোনা যায় যেমন, ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

লালা মীরাশাহ বলে, 'লোকগুলো একেবারে গণ্ডমূর্খ। শুনছি, রাজা করম আলির বিরুদ্ধে ওরা রাজা জীবনসিংয়ের কাছে না-কি দরখাস্ত পাঠাচ্ছে!'

'শুনছি তো সেই রকমই কথা, আল্লা মালিক আছে।'

'রাজা করম আলি মরতে মরতে কোনো রকমে বেঁচেছেন। এখন যদি গাঁয়ের লোক বেশী ট্যাফোঁ করে, তাহলে গাঁ-কে-গাঁ জ্বালিয়ে দেবে। এই মাত্তর তো আবার ফৌজ আর পুলিশ গেলো গাঁয়ে।'

'আল্লা সবার ভালো করুক।'

'তুই আবার ঐ সব উল্‌টো-পাল্‌টা ব্যাপারে মাথা গলাসনে ফত্তু!'

'না লালা, আমি কারোর ভালোতেও নেই মন্দতেও নেই। শুধু আল্লাকে ডাকি, ব্যস!'

'আচ্ছা, যা তাহলে। গুলকে পাঠিয়ে দিস; বলিস, গোমতী ডেকেছে।'

'আচ্ছা লালা, সালাম!'

ফত্তু লাঠি ঠক্‌ঠক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরের দাওয়ায় গোমতীর সঙ্গে দেখা হয় তার। ফত্তু মাথা হেঁট করে সালাম জানিয়ে বলে, 'কেমন আছ শাহনী?'

গোমতী এক হাতে দারোগা হসমত আল্লাবেগের জন্যে খাবারের থালা নিয়ে যাচ্ছিল। ফত্তুর দুর্গন্ধ ময়লা তেলচিটে কাপড়-চোপড় দেখে একপাশে সরে গেলো। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেমন আছ ফত্তু? গুল কেমন আছে?'

'ভালোই আছে। আজই পাঠিয়ে দেবো ওকে। লালা বলছিল, শাহনীর দেখার বড় ইচ্ছে।'

'অ্যাঁ—হ্যাঁ, তা পাঠিয়ে দিও। অনেক দিন দেখিনি ওকে।'

ফত্তু আবার মাথা হেঁট করে সালাম জানিয়ে বিদায় নিল। গোমতী ক্ষিপ্ত হয়ে ভুম্‌ভুম করে পা ফেলে মীরাশাহের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'চৌকির ওপর তোমার খাবার রেখেছি, গিয়ে খেয়ে নাও।'

'আচ্ছা।' মীরাশাহ খাতায় হিসেব দেখতে দেখতে জবাব দিলো।

'আমি দারোগা সাহেবের জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।' মীরাশাহ খাতা থেকে চোখ না তুলেই বলল।

'তুই গুলকে ডেকে পাঠিয়েছিস কেন—আমি কবে বলেছিলাম?'

মীরাশাহ বলল, 'আমি ভাবলাম, এ বাড়িতে শুধু পুরুষ মানুষ আর পুরুষ মানুষ, তোর যদি কখনো-সখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে…'

গোমতী বলল, 'আমি সব বুঝি। কখনও যদি তুই গুলের দিকে তাকাস, তোর মুখ ঝল্‌সিয়ে দেবো বলে দিচ্ছি। আজ ঠাকুর কাহনসিং আসছে, এ দিকে আবার গুলও আসছে!'

'ও, তা আমি গিয়ে মানা করে দিয়ে আসছি।'

'কেন?'

'ইয়ে, মানে এই ভাদরে ওর বিয়ে কি-না!'

গোমতী হেসে বলল, 'তাতে কি হয়েছে! আমার বিয়েও তো ভাদরে হয়েছিল।'

গোমতী চলে গেলো। মীরাশাহ রাগে সশব্দে খাতা বন্ধ করল, তারপর সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেয়। খাতার পাতাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মীরাশাহ হাতের মুঠো বারবার বন্ধ করতে আর খুলতে লাগল। শেষে এক সময় সে গদি থেকে নিচে নেমে ছড়ানো পাতাগুলো গোছাতে শুরু করল। কাগজের পাতায় পাতায় নানা লেখা—

> রহমানের কাছ থেকে গত ফসলের দরুন পঞ্চাশ মণ মকাই নেওয়া হয়েছে —আট টাকা মণ।

রহমানকে ফসল দেওয়া হয়েছে, ষোল টাকা মণ —দু' মণ তিন সের গুল খোরমা ও মিছরী নিয়ে গেছে —মুফত। ফত্তুর নামে আট আনা।

জব্‌রো পাঁচ বছর থেকে সুদও দেয়নি, আসলও দেয়নি। জমি ক্রোক হয়ে গেছে —আট কনাল দু' মরলা (প্রায় দু' বিঘে আধ কাঠা)।

খয়রুর বাপের জন্যে কাফন …সাত টাকা —বাকী। সুদ সমেত দশ টাকা, সামনের মরসুমে ভেড়ার পশম দেবে…

এ পাতাটা সাদা —মীরাশাহ ওটা হাতে নিয়ে ভাবতে শুরু করল, কি লেখা যায়! একটা নাম তার মাথায় এল —গোমতী! গোমতী সুদও নয় আসলও নয়, কনালও নয় মরলাও নয়। গোমতী, ক্রোক! গোমতী, কাফন! গোমতী —প্রতি মণ আট টাকা! গোমতী —প্রতি মণ আট শো টাকা! গোমতী —প্রতি মণ আট হাজার টাকা …গোমতী! …গোমতী! …গোমতী!

মীরাশাহ সাদা পাতাটিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর লেখা পাতাগুলো গুছিয়ে নিয়ে থলেতে পুরে তক্তপোশে উঠতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় পাশের ঘর থেকে গোমতী আর হসমতের একসঙ্গে হাসির শব্দ শুনতে পেল। অমনি পা পিছলে সে নিচে পড়ে গেলো। খাতার পাতাগুলো আবার ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। হাতে লেগে আয়না ছিট্‌কে পড়ল, টিনের ঢাকনা খুলে গেলো, কাছের একটা শস্যের বস্তা উল্‌টে তার মাথায় গড়িয়ে পড়ল, সমস্ত শস্য ছড়িয়ে গেলো সারা মেঝেতে। সেইসঙ্গে পাশের ঘরে হাসির আওয়াজ ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যেন তাকে নিয়েই ওরা হাসাহাসি করছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে, যেন বলছে —ঐ লোকটাই লালা মীরাশাহ সাহুকার! টিকরী শাহমুরাদের জায়গীরদার ও তাঁর মন্ত্রীর পারিষদ? আরে, ও তো মীরু গাধাওয়ালা …মীরু! …মীরু! …মীরু! গাধাওয়ালা!! নিজেই গাধা …নিজেই গাধা!!!

পাশের ঘরে গোমতী আর হসমত একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছে, হাসাহাসি করছে, কথাবার্তা বলছে।

গোমতী আচমকা বলে উঠল, 'আমার মনে হচ্ছে, এ-বার আপনি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন!'

হসমত মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বলল, 'খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ যে এমন একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছেন, নইলে আমি তো তোর মুখখানাই ভুলে যেতে বসেছিলাম!'

'ইস! আমি সব জানি —শুনলাম, বড়ওয়ারার যুবতী সৈয়দানী …কি নাম যেন তার …দূর ছাই, মনে পড়ছে না, তার সঙ্গেও না-কি তোমার ভালোই পরিচয় আছে, আর এ দিকে ওপর-ওপর পীরিত জানাচ্ছেন আমাকে!'

'আরে, ঝাঁটা মারো সে মালজাদীকে —কিসে ও তোর মোকাবিলা করবে শুনি! দুনিয়ায় পোঠোহারী রূপের কোনো জবাব আছে?' হসমত এক ঢোক মদ খেয়ে বলল, 'নাও, খেয়ে নাও।'

'না, দিনের বেলা নয়।'

'না, দিনেই।'

'লালা ঘরে রয়েছে না!'

'লালা! ও-খো-খো-খো!' হসমত সশব্দে হেসে উঠল, 'লালার কথা বলছ তুমি···লালা···খী-খী-খী···খোদার কসম, তুমিও বেশ ঠাট্টা-তামাশা জানো দেখছি। লালা ···এ হে হা-হা-হা ···মেরে ফেললে দেখছি···'

হসমতের হাসি আর থামে না। এমন সময় দরজায় খট্‌খট আওয়াজ হলো। হসমত গোমতীর কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বলল, 'ভেতরে এস।'

প্রথমে সওকত প্রবেশ করল, তারপর একটা দীর্ঘ দড়ি, তারপর একটা দীর্ঘ শেকল, তারপর আবদুল, হাতকড়া পরানো —তার দিকে চেয়ে গোমতীর চোখ স্থির হয়ে গেলো। হসমত জিজ্ঞেস করল, 'কে ও?'

সওকত বলল, 'হুজুর, নূরা জোলার ছেলে আবদুল, ও চাষীদের ক্ষেপাচ্ছিল। আর হুজুরের বিরুদ্ধে নিজে দরখাস্ত লিখে বড় রাজাসাহেবের কাছে পাঠাচ্ছিল। ওকে গ্রেপ্তার করার সময় চাষীরা খুব রুখে দাঁড়িয়েছিল হুজুর···'

আল্লাদাদ বলল, 'গুলি চালাতে হয়েছে হুজুর।'

'কেউ মরেছে, না খামোকা গুলি নষ্ট করেছ?'

'জী হ্যাঁ, আট-দশটা লাশ আমি নিজের চোখে দেখেছি, জখম হয়েছে আরও বেশী। তবে বেশীর ভাগ লোকই পালিয়ে গেছে, কেবল ওদের এই পাণ্ডাটাই ধরা পড়েছে।'

সওকত আবদুলের মাথার দিকে ইশারা করে বলল, 'আমার হাত নিস্‌পিস করছে হুজুর, বলেন তো ভুট্টা উড়িয়ে দিই!'

হসমত উঠে আবদুলের সামনে এগিয়ে গেলো, তার হাতে মুরগীর হাড়, তাই দিয়ে সে আবদুলের মুখে খোঁচা মেরে বলল, 'কি? দরখাস্ত লিখছিলিস? রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াবি বলেই লেখাপড়া শিখেছিস না-কি!'

হাড়খানা আবদুলের নাকে এত জোরে লেগেছিল যে তার নাকের ডগা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রক্ত মুছে সে বলল, 'আমি পুঞ্চ শহরে একটা স্কুলে মাস্টারি করি। এখানে চার বছর পরে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম, রাস্তায় চাষীরা আমাকে ঘিরে ধরে।'

'চাষীরা তোকে ঘিরে ধরল, আর তুই অমনি দরখাস্ত লিখে দিলি! অ্যাঁ!' হসমত তার মুখে জোরে এক ঘুষি কষাল।

আবদুলের ঠোঁট কেটে গেলো, চোয়াল থেকেও রক্ত গড়াতে লাগল। হাতকড়া পরানো হাত দিয়েই সে রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ।' —হাতকড়ায় রক্ত, রক্ত দড়িতেও…

হসমত আবার হাত তুলল। গোমতী তার হাত ধরে ফেলে বলল, 'ছেড়ে দাও। আমি মেয়েমানুষ, আমার পক্ষে এ সব দেখা মুশকিল।'

তারপর সে তার সামনে মদের গেলাস ধরে বলল, 'নাও, রাগের মাথায় জল ঢালো এখন, আর …এ দিকে এস।'

হসমতকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলো খাবারের কাছে।

হসমত ওদের দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'ওকে গরু-ছাগলের গোয়ালে আটকে রাখো, কাল সকালে বড় থানায় পাঠিয়ে দেবো।'

সওকত ও আল্লাদাদ আবদুলকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। গোমতী আবদুলের দিকে ঠায় চেয়ে রইল…

'কি দেখছিস ?' হসমত ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

গোমতী তার দিকে ঘুরে বলল, 'বেচারাকে দেখে তো আমার নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে।'

হসমত রাগে জ্বলে উঠে বলল, 'ওকে দেখে তোর যেটা মনে হচ্ছে, সেটা নির্দোষ নয়, অন্য কিছু —কিন্তু এই রিভলবারটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস।'

গোমতী হাসতে হাসতে তার পিঠে সেঁটে গেলো একেবারে। তারপর তার কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কই দেখি, কোথায় আগুন লেগেছে …এখানে ?' গোমতী তার হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত রাখল।

হসমত তার মুখের ওপর মাথা নিচু করতেই গোমতী এক পাকসাট দিয়ে তার হাত থেকে বেরিয়ে গেলো।

সওকত ও আল্লাদাদ গোমতীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। দাওয়া দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো ছুটে যেতে দেখল তাকে। সওকত ও আল্লাদাদ দাওয়া থেকে একটু দূরে খোবানি গাছতলায় বসে আর দু'জন সেপাইয়ের সঙ্গে তাস খেলছিল। সওকত আর থাকতে না পেরে বলল, 'আল্লাদাদ! দারুণ মেয়ে কিন্তু। খোদার কসম, একবার যার দিকে চোখ তুলে চায়, তার আর নড়ার সাধ্যি থাকে না, সেখানেই শিল-পাথর হয়ে যায়…'

আল্লাদাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যার যেমন কপাল !'

'অত হা-হুতাশ করার কি আছে ! খুব শিকার-ধরা মেয়ে বলে মনে হয়। বলা তো যায় না, কবে তোমার ওপরেও…'

আল্লাদাদ তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিলো, 'সর্বনাশ হয়ে যাবে সওকত। দারোগার কানে যদি যায়, নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়ে দেবে। তুমি জানো না খবিসটাকে। মেয়েটার জালে ও আগাপাস্তলা জড়িয়ে গেছে।'

সওকত তাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'আমি কারোর পরোয়া করিনে। তবে, কি জানি কেন, মেয়েটাকে ভাল্লাগে না আমার। রক্ত খেতে যে-মজা, সে মজা আর কিছুতে নেই ইয়ার! আমি তোমাকে রামপুরের গল্প বলছি শোনো—একবার হয়েছে কি, একটা মেয়ে আমার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল।'

আল্লাদাদ হাতের সমস্ত তাস ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বাদ দাও ইয়ার, অন্য কথা বলো। ভাল্লাগে না।'

'কেন? এখনো তোমাকে নাড়া দিচ্ছে না-কি?'

আল্লাদাদ খোবানি গাছের কাছে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে করতে বলল, 'ছাড়ো ও সব কথা —ও পাখি কারোর খাঁচার জন্যে নয়।'

'আবার কি খাঁচা-টাচার কথা বলছ! চারটে তো বাড়িতেই রয়েছে।'

'চারটে তো কি হয়েছে!' আল্লাদাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'চারটে তো এমনিতেই জায়েজ (বৈধ)। আমি এখন পাঁচ নম্বরের ফিকিরে আছি।'

সওকত আল্লাদাদকে আপাদমস্তক দেখল, তারপর হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মতো এমন গোলগাল চেহারার লোককে সরকারী ষাঁড়ের মতো পোষা উচিত।'

আল্লাদাদ হাসতে হাসতে নিজের বাহুপেশী দেখতে লাগল।

সওকত এক অদ্ভুত হতাশার সঙ্গে বলল, 'মেয়েমানুষেরা নিশ্চয় তোমায় খুব পছন্দ করে?' আল্লাদাদের চোখ-মুখ খুশীতে ডগ্‌মগ করে উঠল। গর্বে বুক ফুলে উঠল তার, খোঁটার মতো শক্ত হয়ে উঠল ঘাড়।

সওকত বলল, 'মেয়েমানুষ আমার একদম ভাল্লাগে না। কে জানে ওতে কি মজা! আমি যা বুঝি, মানুষের শরীরে চাক্কু চালিয়ে দাও, ব্যস, এক্কেবারে শশা কাটার মতো মজা।'

আল্লাদাদ বলল, 'আমার পাঁচ নম্বরেরটাও কচি কচি শশার মতোই মুচমুচে, নরম আর মোলায়েম। ওর নাম বানো ···বানো ···সত্যি-সত্যিই বানো ···চাঁদের মতোই ঝক্‌মক করে ···এই ষোল-সতেরো বছরের ···ওর বাপকে পাঁচশো টাকা দিয়েছি আমি।'

'বিয়ের জন্যে?'

'না —বিয়ের জন্যে সাড়ে সাতশো দিতে হবে। পাঁচশো জমিয়ে ফেলেছি, আর দু'চারদিন এ রকম গোলমাল চললে বাকি দুশোও হয়ে যাবে।'

'তারপর?' সওকত ঠোঁটে জিভ বোলাল।

'তারপর গাঁয়ে ফিরে বিয়ের ঢোল বাজাব —ডুগ্‌ডুগ —ডুগ্‌-ডুগা-ডুগ···' আল্লাদাদ নিজের পেটেই ঢোল বাজিয়ে নাচতে লাগল। সওকত অন্য সেপাইদের দিকে চেয়ে হাসতে শুরু করল।

সওকত ভাবতে ভাবতে বলল, 'আগে শোনো, তুমি পাঁচটা রাখবে কি করে! একটাকে তো তালাক দিতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

'তবে এমনও তো হতে পারে, একটা বউ হয়ত গরু-ছাগল চরাতে পাহাড়ে গেলো, তারপর পা পিছলে নিচে খানা-খন্দে পড়ে মরে গেলো!'

'তা-ও হতে পারে।' আল্লাদাদ মৃদুকণ্ঠে বলল।

'আবার এমনও হতে পারে, রাত্তিরবেলা সে হয়ত উঠোনে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটা নেকড়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেলো! দুদিন কিংবা চারদিন পরে তার লাশ...'

আল্লাদাদ থুতনি চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে।'

সওকত চাকু বের করে ফলাটা চোখের কাছে এনে বলল, 'আমাকে যদি কোনো কাজে লাগে তো বোলো, আমি তৈরী থাকব।'

আল্লাদাদ হেসে সওকতের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমার মতো দোস্ত-ই তো ভরসা —অবশ্য এমনিতে কোনো গোলমাল বাধাবার দরকার নেই। তালাকও তাড়াতাড়ি পেয়ে যেতে পারি। আর যদি কোনো কারণে দেরীও হয়ে যায়, বানোর বাপের কাছে চাল মেরে দেবো। বলব, আমার এখনো বিয়েই হয়নি। আমার নাম আল্লাদাদ নয়, রহমত খাঁ।'

সওকত চাকু বন্ধ করে পকেটে রাখল। হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'যাও, তোমার সঙ্গে আর কি কথা বলব, তুমি আমার লাইনের লোক নও।'

আল্লাদাদ সশব্দে হেসে উঠল। কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেলো, কারণ ঠিক সেই সময় গোমতী একটা ছোট মটকি নিয়ে তাদের দিকেই আসছে।

আল্লাদাদ বিড়বিড় করে বলল, 'ওর এ দিকে আসা ঠিক নয়। জানে যে আমরা সেপাই লোক, তবু এ দিকে আসছে। ওকে দেখলেই বুকের ভেতরে কি যেন হয়। কবে কি করে ফেলব, তখন দারোগা-লালা দু'জনেই কেঁদে মরবে —হে খোদা, ও যেন এ দিকে না আসে —হে খোদা, ও যেন এ দিকে না আসে!'

কিন্তু গোমতী মৃদুমন্দ পায়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। একেবারে কাছে এসে বলল, 'গোয়ালের চাবিটা দাও।'

আল্লাদাদ চুপ। সওকত জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'দুধ দুইতে যাচ্ছি।'

'ভেতরে মারাত্মক আসামী রয়েছে, ওর হাতকড়াও খোলা।'

গোমতী মুচকি হেসে বলল, 'ও আমায় কিছু বলবে না। তাছাড়া তোমরা তো এখানে রয়েছ, আর ঐ গোয়ালের দরজা! যদি ও এখান থেকে পালায় —দরজাটা তো সামনেই, তোমাদের চোখের সামনে পালিয়ে যাবে কোথায়?'

আল্লাদাদ বলল, 'ও পালাবে বলে আমরা ভাবছিনে, ভাবছি তোমার জন্যে।'

গোমতী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আল্লাদাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার ব্যাপার আমি নিজেই বুঝব।'

আল্লাদাদ সওকতের হাত থেকে চাবি নিয়ে গোমতীকে দিয়ে দিলো। মুহূর্তের জন্যে গোমতীর ঠাণ্ডা আঙুলের ছোঁয়া লাগল তার হাতে, অমনি তার মনে হলো, তার শরীরে আগুনের শিখা যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে। আল্লাদাদ ওর দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইল।

সওকত মাথা নেড়ে বলল, 'আমার একদম ভাল্লাগে না, একদম ভাল্লাগে না। যদি কেউ দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে এনে একদিকে তাকে আর একদিকে এই চাকু রেখে দেয়, তাহলে আমি কিন্তু চাকুটাই তুলে নেব।'

আল্লাদাদ কোনো জবাব দিলো না। সে গোমতীর দিকে চেয়ে রয়েছে। গোমতী গোয়ালের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তালার মধ্যে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে। তারপর দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

* * *

গোয়ালের দুর্গন্ধ মেঝেতে শুয়ে শুয়ে আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'কে ?'

তৎক্ষণাৎ সে দেখতে পেল, ছোট্ট দরজায় একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে— সুন্দরী স্ত্রীলোক —সুন্দরী মেয়ে নয় —ফলভারানত শাখার মতো ভর-ভরন্ত একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক, দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের জন্য তার নাকের কাছে এক নামহীন গন্ধের ঢেউ খেলে গেলো, তারপর দরজা বন্ধ হলো। আধো আলো আধো-অন্ধকারে এক উষ্ণ পরিবেশের মধ্যে সে স্ত্রীলোকটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

গোমতী হাল্‌কা পায়ে হেঁটে তার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল —একটু থামল সেখানে। আবদুল উঠে বসল, কিন্তু গোমতী তাকে কোনো কথা বলল না। তখনই পেছন ফিরে সে দুধেল গরুটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাছুর ছেড়ে দিলো। গরুর বাঁটে দুধ নামলে বাছুরটাকে কাছেই বেঁধে রেখে দুধ দুইতে বসল সে।

আবদুল বলল, 'শাহনী, প্রথমে চিনতে পারিনি তোমায়, এই পাঁচ বছরে তুমি অনেক বদলে গেছ।'

গোমতী বলল, 'আগে আমিও তোমায় চিনতে পারিনি। পাঁচ বছর আগে তুমি একেবারে ছোট্ট খোকাটি ছিলে।'

'ওরা আমার আব্বাকে বেকসুর খুন করেছে শাহনী।'

গোমতী চুপচাপ দুধ দুইতে থাকে। ধবধবে সাদা বরফের মতো দুধের ধারা মধুর শব্দ তুলে মটকিতে গিয়ে পড়ছে। আবদুলের মনে হয়, মটকিতে নয়, দুধের সেই ধারা তার গলার ভেতরে এসে পড়ছে। সে গলায় হাত রেখে বলল, 'শাহনী, আমি কাল থেকে কিচ্ছু খাইনি।'

গোমতী চুপচাপ দুধ দুইতে থাকে।

দুধ দেখে বাছুরটি জোরে জোরে তার মাকে আওয়াজ দেয়।

গরুও হাম্বা-হাম্বা করে ডাক ছাড়ে।

মটকিতে দুধ পড়ে।

আবদুল ক্ষুধায় তেষ্টায় অস্থির হয়ে ওঠে। সে দুধের ধারার 'ঘর্‌র্‌-ঘর্‌র্‌' শব্দ আর শুনতে পারে না, কানে আঙুল দেয়। পাশে ছড়ানো ঘাসে মুখ ঢাকে।

গোমতী দেখল, মটকি থেকে দুধের ফেনা উছলে পড়ছে। তখন সে আস্তে আস্তে গরুর কাছ থেকে উঠে বাছুরটাকে আবার খুলে দিলো। বাছুর ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার মা-র বাঁটে মুখ লাগিয়ে চুক্‌চুক করে দুধ খেতে লাগল।

মটকি থেকে ফেনা উছলে পড়ছে।

আবদুল ঘাসে মুখ লুকিয়ে আছে।

গোমতী তার শিয়রে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ওঠো, দুধ খেয়ে নাও।'

আবদুল শুয়েছিল, উঠে বসল। সে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু গোমতী তার পাশেই উবু হয়ে বসল। তার কাঁধের কাছে ঝুঁকে মুখের কাছে মটকি ধরল গোমতী। ঢক্‌ঢক করে দুধ খেতে থাকে আবদুল। প্রথমে মটকিতে দুধ উছলে পড়ছিল, তারপর ফেনা ক্রমশ মটকির তলার দিকে নেমে যেতে থাকে, প্রথমে সিকি ভাগ, তারপর অর্ধেক, তারপর এক সময় খালি হয়ে যায়। এখন আবদুলের ঠোঁটের চারদিকে শুধু দুধের সাদা ফেনা।

গোমতী তার মিহি পাতলা কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিলো। তার চিবুক আর নাকের ডগায় জমে-থাকা রক্ত মুছে দিলো। আবদুল দু'একবার বাধা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার হাতটাকে থামাতে পারল না কিছুতেই। আবদুলের নিজের হাতই কমজোর হয়ে এল, তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এক অদ্ভুত মর্মরধ্বনি, এক অদ্ভুত কোমলতা।

গোমতী বলল, 'শুনেছি, তুমি শহরের স্কুল-মাস্টার। আট ক্লাস পাস।'

আবদুল বলল, 'হ্যাঁ। আর এখন দশ ক্লাসের পরীক্ষা দিতে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু…'

'রাওয়ালপিণ্ডি!' গোমতী বিষন্ন গলায় বলল, 'বিয়ের আগে আমি একবার রাওয়ালপিণ্ডি গিয়েছিলাম। আমাদের ভোন্‌গাঁ থেকেই গিয়েছিলাম। ঐ রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার এক জ্ঞাতি থাকে—সজ্জনদেব। আগে ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা ছিল। তারপর জানা যায় ওরা আমাদের জ্ঞাতি, বিয়ে চলবে না। আচ্ছা বলো তো, যার সঙ্গে আমার ভালোবাসা, তার সঙ্গে আমার বিয়ে চলবে না কেন?' —গোমতী আবদুলকে জিজ্ঞেস করল।

আবদুল কোনো জবাব দিলো না।

গোমতী বলল, 'তুমি রাওয়ালপিণ্ডি যাবে তো, সজ্জনদেবের সঙ্গে অবশ্যই দেখা কোরো। অবশ্যই। এখন হয়ত সে-ও বিয়ে করেছে, হয়ত ছেলেপিলেও আছে ওর। তুমি যাবে কিন্তু, গিয়ে দেখবে ওর বউটা কেমন হয়েছে—দেখতে খুব ভালো, না…তবে ভালোই হবে—দেখো, কথা দাও, তুমি যখন রাওয়ালপিণ্ডি যাবে, তখন…'

আবদুল বলল, 'এখন তো আমি জেলে যাচ্ছি।'

'জেলে যাবে কেন? না না, তুমি ঠিক রাওয়ালপিণ্ডি যাবে! তোমায় রাওয়ালপিণ্ডি পাঠাবই আমি!'

'তা কি করে হবে?'

'তুমি দেখো না!'

এই বলে গোমতী তার আঙুলের পাতলা নখ দিয়ে আবদুলের গলায় জমে থাকা রক্তের দাগ সাফ করে দিলো। আবদুলের গলা কত মজবুত! শিরা-গুলো কেমন পরিষ্কার টান-টান! নিচে কণ্ঠার নিচে দুটো মজবুত হাড়। গোমতী আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল। আবদুল হকচকিয়ে গেলো।

বলল, 'তা —আমি …না, মানে তুমি, কি করে আমায় সাহায্য করবে?'

গোমতী মুচকি হাসল। তার উঁচু বুক দুটি আবদুলের বুকটাকে ছুঁয়ে মুহূর্তে সরে গেলো বলে মনে হলো তার, ঠিক যেমনটি অজস্র ফলের ভারে ভারাক্রান্ত ডালপালা ঝড়ের এক ঝাপটায় হঠাৎ ওপরে উঠে যায়। আবদুল লক্ষ্য করল, খানিকটা নিরাশ হয়ে দারুণ বিচলিত গোমতী উঠে দাঁড়াল। মটকি তুলে নিল। তারপর সে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওর দিকে চেয়ে বাতাসের শব্দের মতো নরম গলায় বলল, 'আচ্ছা আমি রাতে আসব।'

এই বলে গোমতী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলো। আবদুল কিছু বলতে পারল না, নিষেধও করতে পারল না। কেন আসবে গোমতী? সে ওর কে? তার সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কি? কেন সে ওকে নিষেধ করল না? এটা কি রকম নাটক —এটা কি ধরনের প্রবৃত্তি যা তার মুখের কথা বন্ধ করে দিয়েছিল? আবদুল এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। দুধের বুদ্‌বুদের মতো প্রশ্নগুলি যেন ফেটে ফেটে তার মস্তিষ্কে হারিয়ে যেতে লাগল।

গোয়াল থেকে বেরিয়েই গোমতী আল্লাদাদের হাতে চাবি দিয়ে দিলো।

সওকত জিজ্ঞেস করল, 'শাহনী, মটকি খালি যে?'

গোমতী বলল, 'তোমাদের আসামী কাল সন্ধ্যে থেকে কিছু খায়নি।'

আল্লাদাদ বলল, 'দারোগা সাহেবের হুকুম, ওকে কিছু খেতে দেওয়া হবে না।'

'আচ্ছা, তাহলে আল্লাদাদ, দারোগাকে কিছু বোলো না। আমি রাতেও খাবার দিয়ে যাব ওকে।'

গোমতী তেমনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আল্লাদাদের দিকে কটাক্ষ করে মুচকি হাসল —এমন পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হাসি যে আল্লাদাদের মাথা ঘুরে গেলো। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'ঠিক আছে শাহনী।'

গোমতী চলে গেলে সওকত বলল, 'তুমি ভালো করছ না দোস্ত।'

আল্লাদাদ খোবানি গাছের আশপাশে পায়চারি করতে লাগল। তারপর হঠাৎ থেমে সওকতকে বেশ চড়া গলায় বলল, 'দারোগার নিকুচি করেছে!'

এমন চড়া গলায় কথাটা বলল যে, সে নিজেই অবাক হয়ে গেলো।

*　　　*　　　*

গোমতী দাওয়া দিয়ে যেতে যেতে নিজের সাহস দেখে নিজেই হাসল। তারপর সে ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, গুল একটা খাটো কামিজ আর বড় ঘেরের সালোয়ার পরে উত্তরের রাস্তা দিয়ে তাদেরই বাড়ির দিকে আসছে। গুল দেখতে খুব সুন্দর। গোমতী ভাবছিল —ক'বছর থেকেই মীরাশাহ্ ওর মুখ কালো করার চেষ্টায় আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার হিম্মতে কুলোয়নি। গুল ব্যাপারটা বোঝে না, এটা অসম্ভব। হাজার হলেও মেয়ে তো, নিশ্চয়ই বোঝে! মীরাশাহ্ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে যখন ওর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকায়, তখন সে কি দেখে! যখন সে গুলের থলেটা গড়ি-খোরমা-পানিফলে ভরে দেয়, তখন তার হাত কাঁপতে থাকে কেন! যখন সে একবার নিজের প্রাণ শক্ত করে গুলকে সালোয়ার-কামিজের রেশমী কাপড় মুফতেই দিয়ে দিলো, তখন তার মনের অবস্থা কি ছিল! অবশ্য গোমতী ভালো করেই জানে, তার স্বামী কেবল পায়েই মাথা ঠুকতে পারে, ভালোবাসতে পারে না। ওর মধ্যে সে সাহসটুকুও নেই যে গুলকে বলতে পারে— 'আমি তোর দেহ চাই!' —কাপুরুষ!

গোমতী গুলকে উত্তরের রাস্তা ধরে উঠে আসতে দেখল, তারপর তাকে মীরাশাহের ঘরের দিকে যেতে দেখল। মুচকি হাসল সে। এমন সময় কাছেই পায়ের শব্দ শুনে সে পেছন ফিরে দেখল, ঠাকুর কাহনসিং গোঁফে তা দিচ্ছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'রাজাজী এখন কেমন?'

'শহর থেকে ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন, মাস খানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন।'

গোমতী চুপ করে থাকে।

ঠাকুর কাহনসিং বলে, 'ভাবলাম, যাই, গোমতীকে দেখে আসি আর প্রাণের বন্ধু দারোগার সঙ্গেও দু'চারটে কথাবার্তা বলে আসি।'

গোমতী মৃদু হেসে বলল, 'আজ এখানেই থেকে যান না! শহর থেকে নতুন মাল আনিয়েছি আর…'

'আর?' ঠাকুর কাহনসিং একেবারে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল।

গোমতী একটু পেছনে সরে গিয়ে বলল, 'আর একটা নতুন বোতলও।'

'কোথায়?'

'ঐ সামনে লালার ঘরে। এক্ষুনি দেখাচ্ছি আপনাকে।'

*　　　*　　　*

লালা গুলকে ঘরে ঢুকতে দেখেই একটু ভয় পেয়ে গেলো। গুলকে এমন ভালো দেখাচ্ছে, এমন অপূর্ব, যে তার ঘরখানায় যেন বসন্ত ছড়িয়ে পড়ল। লালা সে সময়

দাঁড়িপাল্লায় কি যেন ওজন করছিল, কাঁপতে কাঁপতে তার হাত থেকে দাঁড়িপাল্লা পড়ে গেলো। থতমত খেয়ে বলল, 'আরে গুল, তুমি!'

গুলের মেহেদী রাঙানো হাত ঝলমল করে উঠল, হাতের একটা আঙুল রাখল তার লম্বা নাকের সোনালী গোল পাথরটায়। সলজ্জ কণ্ঠে বলল, 'জী, শাহজী!'

গুল ঘরের মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল, লালা তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বলল, 'আরে, ও কি করছ? এখানে, এখানে এই তক্তপোশে বসো।' সে গুলের হাত ধরে তাকে তক্তপোশের ওপর টেনে আনল। হিসেবের খাতাটাতা একপাশে সরিয়ে রাখল। তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'বলো, কি চাই তোমার? খোরমা দেবো? পানিফল? নতুন মিছরী এসেছে! আয়না-চিরুনি, নতুন ফুলদার ছিটের কাপড় —গুল, কি চাই তোমার?'

গুল হাসল, যেন সে নিজের ক্ষমতাটা বেশ বুঝতে পারছে। বলল, 'লালা, আমাকে কাঁচের চুড়ি আর ঐ গলার সবুজ রঙের মালা যদি দাও, তাহলেই তোমার যথেষ্ট দয়া!'

'আরে, দয়া আবার কি! দয়া আবার কি, গুল! এই নাও, এই নাও··· তোমার জন্যে তো ···কিন্তু, আচ্ছা!' লালা এক বিচিত্র রকম কৃপাপ্রার্থীর দৃষ্টিতে গুলের দিকে চেয়ে বলল, 'শুনলাম, এই ভাদ্র মাসে তোমার বিয়ে?'

গুল লজ্জায় মাথা নিচু করল। তার সারা মুখখানি, ঘাড় থেকে কপাল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল।

লালা হাত কচলাতে লাগল, 'হায় গুল, চলে যাবে! এমন সোনার প্রতিমা, এমন মোহিনী মূর্তিও গাঁ থেকে চলে যাবে' —মীরাশাহ চুপ করে গেলো। একবার সে তার গাধার সঙ্গে ভালোবাসা পাতিয়েছিল, একবার সে গোমতীর সঙ্গে প্রেম করেছিল, একবার সে গুলকে চেয়েছে, কিন্তু ধনসম্পদ ছাড়া কেউই তাকে চায়নি। আর মানুষ গাধাকে যে রকম ভালোবাসে, ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণ তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এত ধনসম্পদ পেয়েও মীরাশাহের হৃদয়ে ধূ-ধূ করে ছাই উড়ছে, জিভে মাটির স্বাদ, গুলের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু হাত কচলাচ্ছে।

গুল তার জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি যাই তাহলে!'

গত চার বছর ধরে এই কাণ্ডই হয়ে আসছে। গুল আসে, কিছু কিছু জিনিস পছন্দ করে, কিন্তু জিনিসপত্র দেয় যে লোকটা, তাকে পছন্দ করার কোনো সুযোগই দেয় না। তারপর একটা সময় আসে, যখন দু'জনেই চুপ করে থাকে। তাই গুল লালার উপকারের ঋণ শোধ করতে পারে না। আর লালাও তার উপকারকে উপকার বলে ভাবে না বলেই সেই মুহূর্তটি বড় নিশ্চুপ, বড় দীর্ঘ হতে থাকে, এক বিশাল বেলুনের মতো ফুলতে থাকে, এত বড় হয়ে ওঠে যে, লালার মনে হয় এ-বার বেলুনটা ফেটে যাবে, তখন সে এক অদ্ভুত গলায় বলে, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে যাও গুল।' কিন্তু আজ, কে জানে কেন, লালা সে কথাটাও বলতে পারল

না, সে কৃপাপ্রার্থীর মতো চুপচাপ তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। গুল আস্তে আস্তে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

হঠাৎ লালা বলল, 'গুল, শোন ···আমাদের গরুর বাছুর হয়েছে, ভারি সুন্দর, ওর কপালে একটা সাদা তারাও আছে —দেখবি তুই ?'

'কোথায় ?'

'গোয়ালে।'

গুল ভাবল —উপকারের ঋণ শোধ করার সময় এসেছে, উপকার শেষ পর্যন্ত উপকারই, ভালোবাসা নয়। এই গত চার বছর ধরে লালাকে তার মন্দ ও কুৎসিত মনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে যে রকম কদর্য কুৎসিত দেখাচ্ছে, এমন আর কখনও নয়। এর আগে লালার মৌনতায় এক কৃপাপ্রার্থী ভালোবাসার ছায়া অনুভব করত গুল, আজ তাতে কেবল দুর্গন্ধ, শুধু নোংরা দুর্গন্ধ !

গুল ভৎ‍র্সনার গলায় বলল, 'লালা, ভাদর মাসে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে !'

লালা তার হাত ধরে তাকে গোয়ালের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, 'আরে খুব সুন্দর বাছুর —ভারি চমৎকার —এই তো পাশেই গোয়াল।'

গুল আপত্তি জানায়। গোয়ালের যত কাছাকাছি হয়; লালার উৎসাহ তত বাড়তে থাকে, গুলের প্রতিরোধও বাড়তে থাকে ততই। লালা এখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, চোখ-মুখ রাগে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সে নিজেই নিজের ওপর, নিজের ভোঁতা নাকের ওপর, নিজের কদর্য চেহারার ওপর, নিজের শয়তানির ওপর, গুলের সৌন্দর্যের ওপর, গোমতীর বিশ্বাসঘাতকতার ওপর, সব কিছুর ওপর রাগ হচ্ছে তার। কেন রাগ করবে না সে ? তার কি রাগ করা উচিত নয় ! গুলকে তার উপকারের ঋণ মিটিয়ে দিতে হবেই —শেষ পর্যন্ত সেটা উপকারই থেকে যাবে কেন, ভাব-ভালোবাসা হয়ে উঠবে না ? কেন হবে না ? কেন সে তাকে গোয়ালের দিকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে ? হঠাৎ তার কানে হাসির আওয়াজ এল। পেছন ফিরে দেখল, সওকত ও আল্লাদাদ ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

লালা থমকে দাঁড়াল।

আল্লাদাদ বলল, 'কি ব্যাপার লালা, কোথায় যাচ্ছ ? গোয়ালে আমাদের আসামী আটক আছে।'

হঠাৎ লালার মনে পড়ল কথাটা। গুলের হাত ধরে ছিল যে-হাতে, সে-হাত শিথিল হয়ে পড়ল। গুল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে এক দৌড় দিলো। সওকত ও আল্লাদাদের পাশ দিয়ে, খোবানি গাছের কাছ দিয়ে ছুটতে ছুটতে, এক লাফে বেড়াটা পেরিয়ে, নিচের রাস্তায় যেই উঠতে যাবে, অমনি কে যেন একেবারে সামনে এসে শক্ত হাতে ধরে ফেলল তাকে। গুল ভয় পেয়ে চোখ তুলে

দেখল, তার সামনেই বড় বড় গোঁফওয়ালা এক লম্বা-তাগড়া জোয়ান লোক তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। কাছেই গোমতী দাঁড়িয়ে।

'সরো, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'আরে, এ যে সত্যি-সত্যি নতুন বোতল!' কাহনসিং খুশী হয়ে বলল।

গোমতী বলল, 'ভাদর মাসে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

'আমাকে যেতে দাও।' গুল চিৎকার করে উঠল।

'ভাদ্র মাসের তো বেশ দেরী। আজ রাত বেশ জোয়ান আছে, আমার হাতও খুব মজবুত।'

*　　*　　*

রাত আজ জোয়ান, আর গুল ঠাকুর কাহনসিংয়ের ঘরে। রাত আজ জোয়ান, আর গোমতী দারোগা হসমত আল্লাবেগের ঘরে। রাত আজ জোয়ান, আর সেপাইরা খোবানির গাছতলায় বসে তাস খেলছে। রাত আজ জোয়ান, আর লক্ষ্মী বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে। লালা মীরাশাহ নিজের হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা-বেদনাগুলি গুনতে গুনতে কখনো এ ঘর থেকে সে ঘরে, কখনো এক দাওয়া থেকে সে দাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়, আর ভাবে, সে কি অন্য কারোর মতো এই জোয়ান রাতের বুকে ঘুষি মারতে পারে না—এমন এক জোরাল ঘুষি, যাতে সমস্ত ঘরের দরজা-কপাট ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, দাওয়ার ছাদ বাতাসে উড়ে যায়, মণ্ডপ অট্টহাসির নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! সেটা কি হতে পারে না? সেটা কি হতে পারে না? এই জোয়ান রাত···লালা মীরাশাহ রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে।

*　　*　　*

রাত আজ জোয়ান আর বড় অদ্ভুত। গোমতী ভাবে—আমার বুকে এ কিসের ঢেউ উঠছে, যেন আমার এই প্রথম বিয়ে হচ্ছে আজ! আজ গোমতী তার সবচেয়ে সেরা রঙের স্যুট পরেছে, হাতে কামদার চুড়ি, গায়ে মেখেছে হলুদ গোলাপের আতর। আজ তার নিজেকেই নতুন নতুন মনে হচ্ছে। লালার কষ্ট দেখে সে বড় খুশী। গুলের চিৎকার শুনতে শুনতে একটি দিনের কথা মনে পড়ছিল তার। তহশিলদার সেই প্রথম তাদের বাড়ি এসেছেন, লালা মীরাশাহ রাত দশটার সময় তাদের দু'জনকে একলা রেখে কি একটা জরুরি কাজে নিচের গাঁয়ে চলে গেলো, ফিরল রাত দুটোয়। আজ গুলকেও বাড়ি ফিরতে হবে রাত দুটোয়। আহা, রাত্রিটি কি চমৎকার! আজ ঐ হসমত আল্লাবেগটাও কেমন তড়পাবে—কিছুতেই আজ সে ওকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

*　　*　　*

গোমতী সেজেগুজে খাবারের থালা নিয়ে গোয়ালের দিকে গেলো। আল্লাদাদ আর সওকত পাহারায় রয়েছে।

গোমতী আল্লাদাদকে বলল, 'চাবি?'

আল্লাদাদ চাবি দিয়ে দিলো।

গোমতী বলল, 'লালা যদি জিজ্ঞেস করে তো বলে দেবে, দারোগা সাহেব খাওয়া-দাওয়া করছেন, আমি সেখানে। আর দারোগা জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমি লালার কাছে রয়েছি।'

আল্লাদাদ্ বলল, 'কিন্তু ?'

'ও সব কিন্তু-টিন্তু কিছু নয়। দু'জনের কেউ কাউকে কখনও জিজ্ঞেস করার সাহস করবে না, সে জন্যে ওতে কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই, বুঝলে! আমি তোমাদের আসামীটাকে খাইয়ে-দাইয়ে আসি।'

গোমতী তালায় চাবি লাগাল। দরজা খুলল। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

আল্লাদাদের কাঁপুনি আরম্ভ হলো।

গোয়ালের মধ্যে আবদুল আবার সেই নামহীন গন্ধটা অনুভব করল —আরে, এটা তো হলুদ গোলাপের গন্ধ! হাতে থালা নিয়ে, থালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই সোনার প্রতিমা তার দিকে এগিয়ে আসছে। আবদুল উঠে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সেই প্রতিমার কাছে এগিয়ে গেলো। তার হাত থেকে থালাটা নামিয়ে নিল। সেই আধো আলো-আঁধারিতে গোমতীর রহস্যময় ঠোঁট আর যাদুভরা চোখের পাশবিক দৃষ্টি তাকে এক অদ্ভুত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বলে মনে হলো। আবদুলের বুক কেঁপে উঠল —বানো অনেক দূরে, আর এখানে গোমতীর শরীরের আহ্বান খুব নিকটেই। আবদুলের বুকটা ভীষণ জোরে ধক্‌ধক করছে। যে তারুণ্য জেলের গারদের কাছাকাছি এসেও সজীব ছিল, মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতেও প্ররোচনা দিচ্ছিল, সেই তারুণ্য সত্ত্বেও আজ তার ভয় করতে লাগল।

গোমতী বলল, 'খেয়ে নাও।'

আবদুল বলল, 'এস, আগে কথাবার্তা সেরে নিই।'

ওরা খস্‌খস শব্দ করে শুকনো ঘাসের ওপর বসে পড়ল —একেবারে পরস্পরের কাছাকাছি।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কি উপায়ে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠাবে ভেবেছ ?'

গোমতী সব কিছু ভুলে গিয়েছিল —রাওয়ালপিণ্ডি! উপায়! আবদুলের গ্রেপ্তার হওয়া! তার কেবল আবদুলকে মনে ছিল —দিন, দুপুর, সন্ধ্যে এবং এই এখন পর্যন্তও তার মন জুড়ে ছিল শুধু আবদুল যেই আবদুল তার স্মৃতিকে নাড়া দিলো, অমনি রাওয়ালপিণ্ডির কথা মনে পড়ল তার —তাজা গরম রক্তের মতো, প্রাণময়! আর তার ভেতর থেকে সজ্জনদেব! সজ্জনদেব হাসতে হাসতে তার সামনে এসে দাঁড়াল, তার হাত দু'খানি নিজের দু'হাতে তুলে নিল, আর তার মুখে এমন এক পবিত্র হাসি, যে-হাসি তার পরে গোমতী কখনও নিজের মুখে, কিংবা তার অন্য কোনো প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর মুখে দেখেনি। গোমতী হঠাৎ সমস্ত কথাবার্তায়,

চালচলনে, তার কামপ্রবৃত্তি ভুলে গেলো। আজ সে যেন কয়েক বছর আগের সেই অনূঢ়া মেয়েটি —গোমঁা, যে অকপট হৃদয়ে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু মীরাশাহের ধনসম্পদ তার সোনার শেকলে বেঁধে টেনে আনল তাকে। গোমতীর বুকটা জোরে দুলে উঠল। আবদুলের মুখটাও যেন সেই রকম, সজ্জনদেবের মতো সুন্দর, পবিত্র, সরল, আর তেমনি বোকা-বোকা, যেন কি করা উচিত, সেটা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। শুধু শরীরের আহ্বান শোনে, আর সেই আহ্বান তাকে যেন কোনো এক নতুন স্তরে তুলে নিয়ে যায়। আরক্তিম তরুণ মুখখানি —সেই মুখখানি যা পথপ্রদর্শন, সহায়তা ও উৎসাহ প্রার্থনা করে। আবদুলের মতো একটি মুখ কেন সে পেল না? মীরাশাহকে পেল কেন? ···কেন? ···কেন?

গোমতী দু'হাতে মুখ ঢাকল।

আবদুল তাকে বুকে টেনে নিল।

'আমাকে ছুঁয়ো না!' গোমতী তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল।

আবদুল বিস্মিত, স্তম্ভিত।

গোমতী আবদুলের কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'আমাকে মাফ করো। এখন আমি আর আমার মধ্যে নেই —ইচ্ছে করলে আমি তোমার সর্বনাশ করতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না, তোমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে।'

'কি সব অদ্ভুত কথা বলছ, শাহনী!'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত কথাই আবদুল! তুমি যখন বিয়ে করবে, তখন মনে পড়বে আমার কথা। বুঝতে পারবে, কেন একজন তোমায় এই হাতের মুঠোয় এনে আবার ছেড়ে দিয়েছিল!'

'আমি বানোকে বিয়ে করব।'

'বানো কে?'

সেই মুহূর্তে আবদুলের হৃদয়ে বানো যেন দূরে কোনো এক ঘণ্টার মতো বেজে উঠল, সেই ঘণ্টাধ্বনি ক্রমশ যেন কাছে এগিয়ে আসছে —বানো-বানো-বানো বানো-বানো-বানো ···আবদুলের মুখখানি খুশীতে ঝলমল করে উঠল। সে খুব চমৎকার মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বরে বলল, 'বানো আমার হবু-বউ।'

গোমতী আবদুলের কাছ থেকে সরে বসল। বলল, 'তুমি খেয়ে নাও। তারপর তোমায় ছেড়ে দেবো।'

আবদুল বলল, 'ছাড়া পাব ভাবতেই আমার খিদেটিদে চলে গেছে।'

'তাহলে এস, বেরিয়ে যাও এক্ষুনি।'

আবদুল উঠে দাঁড়াল।

গোমতী খাবারের থালার দিকে তাকাল, কত খাটাখাটুনি করে, কত ভালোবাসা দিয়ে সে ঐ খাবার তৈরী করেছিল! কত পরিশ্রম করে কত অনুরাগ নিয়ে সে আজ সাজসজ্জা করেছিল! জোয়ান রাতের কত আশা-আকাঙ্ক্ষার

হিল্লোল নিয়ে সে আজ এই গোয়ালে এসেছিল। হঠাৎ গোমতী রেগে গিয়ে থালায় জোরে এক লাথি মারল, থালাটা ঝন্‌ঝন করে ছিটকে দেওয়ালে গিয়ে লাগল। সেখান থেকে আবার ছিটকে গিয়ে পড়ল মোষটার পায়ের কাছে। মোষটা থালা শুঁকতে লাগল, ঠিক যেন মীরাশাহ খাবার খাচ্ছে।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'কি ···কি করবে এখন?'

'কিছু না।'

'বাইরে সেপাই আমাকে কিছু বলবে না?'

'না, কিছু বলবে না ওরা।'

'আমি কি বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব!'

'তার কোনো দরকার নেই।'

'আমি রাওয়ালপিণ্ডি গিয়ে অবশ্যই সজ্জনদেবের সঙ্গে দেখা করব।'

'সেটা তোমার ইচ্ছে!'

'তার সঙ্গে দেখা করে কি বলব?'

হঠাৎ গোমতীর মাথা ঘুরে গেলো। সে দেওয়ালটা ধরে দাঁড়াল কোনো রকমে। তারপর ভীষণ হতাশ, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত গলায় বলল, 'ওকে বোলো, যে মেয়েটিকে তুই ভালোবাসতিস, সে আজকাল বেশ্যাখানায় বসে রয়েছে।'

'শাহনী, কি বলছ তুমি?'

'সত্যি কথাই বলছি আবদুল!' গোমতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ যেন সে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এ-বার দরজা খুলে বেরিয়ে যাও তুমি।'

'বাইরে সেপাই রয়েছে যে!'

'তুমি দরজাটা খোলো না!'

আবদুল দরজা খুলল। দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল, বাইরের আলো ভেতরে এল, ভেতরের অন্ধকার বাইরে গেলো। আবদুল দরজায় দাঁড়িয়ে। সওকত ও আল্লাদাদ ওকে চেনার চেষ্টা করছিল।

'কে যায়?' সওকত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলল।

'আমি আবদুল।'

সওকত চাকু বার করল। আল্লাদাদ এগিয়ে গেলো, 'কি ব্যাপার, শাহনী?'

গোমতী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'গোয়ালের এই দরজা রয়েছে, এই দরজা দিয়ে একজন বাইরে যাবে, অন্য একজন ভেতরে আসবে।'

এক দীর্ঘ, খুব দীর্ঘ নীরবতার পর আল্লাদাদ কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'ঠিক আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আবদুল বলে উঠল, 'না-না।'

সওকত বলল, 'কি করো আল্লাদাদ?'

আবদুল বলল, 'না-না, আমি ওতে রাজী নই।'

গোমতী বেশ শক্ত গলায় বলল, 'তুমি এখন আর একটুও দেরি কোরো না, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে, হয়ত আমার ইচ্ছেটাই বদলে যেতে পারে —তাই আর দেরি না করে আমার এই এক মুহূর্তের পুণ্যফলটুকু নিয়ে পালিয়ে যাও —আমি এই গোয়ালের ভেতরেই দাঁড়িয়ে রয়েছি, তোমার দিকে চেয়ে থাকব —যতক্ষণ তুমি চোখের আড়াল না হবে, ততক্ষণ এই গোয়ালের ভেতরে কেউ পা দিতে পারবে না।'

গোমতী ধাক্কা দিয়ে আবদুলকে বার করে দিলো। আবদুল আস্তে আস্তে হাঁটে আর পেছন ফিরে দেখে। তারপর তার পা দ্রুততর হলো। অবশেষে দৌড়তে দৌড়তে দক্ষিণের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেলো। গোমতীর আশা ছিল, দিগন্তের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে একবার সে পেছন ফিরে তাকাবে, কিন্তু সে আর পেছনে তাকাল না। গোমতীর মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিলো, ধীরে ধীরে কাঁপা-কাঁপা গলায় সে আল্লাদাদকে বলল, 'ভেতরে চলে এস, আল্লাদাদ! পশুর ঘরের দরজা তোমার জন্যে খোলা আছে!'

* * *

পুব বারান্দায় দারোগা হসমত আল্লাবেগ ভীষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। উত্তর বারান্দায় লালা মীরাশাহ দারুণ উৎকণ্ঠায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়চারি করতে করতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পুব ও উত্তর বারান্দার কোণে এসে দু'জনেই মুখোমুখি দাঁড়াল।

লালা দারোগাকে জিজ্ঞেস করল, 'গোমতী কোথায় ?'

দারোগা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'সেটা তো আমিই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।'

হঠাৎ দারোগার একটি কথা মনে পড়ে গেলো। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। লালা তাকে অনুসরণ করল। ঘরে গিয়ে দারোগা তার লং বুটজুতো পরে নিয়ে ছড়ি হাতে বেরোল। একটা ছোট্ট তেপায়ার ওপর মদের বোতল ছিল। বোতলটার অর্ধেক নিঃশেষিত। বোতলের পাশে দুটি গেলাস, তার একটিতে একবিন্দুও মদ ছিল না। ঘর থেকে বেরোবার সময় দারোগা দারুণ রাগে গেলাস দুটিকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করল। অমনি কাঁচের গেলাস নিচে পড়ে গিয়ে ঝনাৎ করে সশব্দে ভেঙে গেলো।

লালার মুখে একটা ক্রুর হাসি দেখা দিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেলো। বলল, 'হুজুর! এখানেই কোথাও আছে হয়ত, কোথায় যাবে বেচারী!'

হসমত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তেপায়ার ওপর পিস্তলের বেল্ট পড়ে ছিল। লালা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল, তারপর সে পিস্তলের বেল্ট তুলে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে হসমতের পেছনে

পেছনে হাঁটতে শুরু করল। হসমত দ্রুত পা ফেলে গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। লালা তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর বলছে, 'কিন্তু হুজুর, গোয়ালঘরে তো গরু-মোষই বাঁধা থাকে —ঐ গরু-মোষই রয়েছে ওখানে, আর আপনার এক আসামী।'

'তুমি এস না আমার সঙ্গে!' হসমত রাগে গর্জন করে উঠল।

গোয়ালঘরের সামনে গিয়ে সে সওকতকে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে কে আছে?'

সওকত চুপ করে রইল।

'বলছিস নে কেন শুয়োর?' হসমত হুঙ্কার দিলো।

ঠিক সেই সময়, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, লালা মীরা-শাহের কাঁধ থেকে পিস্তলের বেল্ট নিচে পড়ে গেলো, ঠিক দারোগার পায়ের কাছেই। লালা সেটা তুলে নিতে যাচ্ছিল, হসমত কেড়ে নিল। বেল্ট থেকে কার্তুজ বের করে পিস্তলে ভরল।

লালা হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর —হুজুর, একটু ভেবে দেখুন, ও আমার স্ত্রী।'

হসমত গর্জন করে উঠল, 'দরজা খোল।'

সওকত চাবি দিয়ে তালা খুলে দিলো।

'হুজুর —হুজুর, একটু ধৈর্য ধরুন। হুজুর, একটু ভেবে-চিন্তে দেখুন!' লালা বড় হৃদয়হীনতার সঙ্গে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল।

হসমত লালাকে ধাক্কা মেরে গোয়ালঘরে ঢুকল।

বন্ধ হয়ে গেলো গোয়ালঘরের দরজা।

লালা জোড়হাত করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু বলছে, 'হুজুর! হুজুর! হুজুর!…'

হঠাৎ গোয়ালঘরের ভেতরে দুটো গুলির শব্দ। একটা দীর্ঘ আর্ত চিৎকার। আর তারপরই স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

'হায় রাম!' লালা জোরে আর্তনাদ করে উঠে মাটিতে পড়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পরেই দরজা খুলে হসমত আল্লাবেগ বেল্টে পিস্তল গুঁজতে গুঁজতে বেরিয়ে এল। পা টলছে। পায়রার মতো চোখ দুটো টক্‌টকে লাল।

আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে লালা বলল, 'হুজুর —হুজুর, আমি শেষ হয়ে গেলাম! আমি জানে-প্রাণে মারা গেলাম! কিন্তু এ-বার আপনিও শেষ হয়ে যাবেন হুজুর, ফাঁসিতে চড়তে হবে আপনাকে। এ খুন কিছুতেই লুকোনো যাবে না হুজুর। আপনার আর সওকতের এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছি হুজুর।'

হসমত সওকতকে বলল, 'ঘোড়া আনো। এক মিনিট দেরি কোরো না। আমরা এ দেশ ছেড়ে পালাব।'

একটু পরেই দেখা গেলো, দু'জন ঘোড়সওয়ার টিকরী শাহমুরাদের সীমানা ছাড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। লালার মুখে বিজয়ীর হাসি। তারপর সে বাইরের দাওয়ার সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, শোরগোল তুলে কাঁদতে শুরু করল, 'ওগো কে আছ, আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো, সর্বস্বান্ত হলাম আমি! গাঁয়ের লোকজন ছুটে এস গো, আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো, আমি সর্বস্বান্ত হলাম!'

ছয়

রাতে ঘুমোবার সময় মা সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করল, 'আখরোট কম মনে হচ্ছে আমার। খোরমাও। ঘরে ইঁদুর হয়েছে বোধহয়।'

সরস্বতী বলল, 'ইঁদুর নয় মা, আমি কিছু আখরোট-খোরমা আবদুলকে দিয়েছি।'

গঙ্গা মুচকি হেসে পাশ ফিরল, চোখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিলো একটু।

মায়ের মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো, তারপর সশব্দে ঠোঁট দুটো বন্ধ করল সে। তার মুখচোখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কিন্তু সরস্বতীর মুখখানি ডালিম ফুলের মতো রাঙা। সে একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আজ বেশ ঘুম হবে মনে হচ্ছে।'

মা ধীরে ধীরে মেঝে থেকে উঠে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সরস্বতী চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখে। মা তার ওপর কেন অসন্তুষ্ট, সে জানে। কিন্তু মনের অসন্তোষ প্রকাশ না করার এক বদ অভ্যেস আছে তার, সব সময়েই চুপ করে থাকে।

'মা আস্তে আস্তে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে' —সরস্বতী বলল। তারপর পাশ ফিরে গঙ্গাকে আরও কোলের কাছে টেনে নিল সে। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমিয়ে পড়লি, গঙ্গা?'

'না সরো।' সরস্বতী তার মসৃণ আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে, সেই কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে আদুরে গলায় জবাব দিলো গঙ্গা।

'ওরা দু'জন এখন কি করছে বল তো?' সরস্বতীর ইঙ্গিতটা ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকা ফজল ও রজ্জির প্রতি।

তার কণ্ঠস্বর মৃদু-কোমল, কিন্তু সেই কোমলতার মধ্যে এমন এক সোহাগ নিহিত, যেন ছাই হাঁটকাতে হাঁটকাতে কারোর হাতে লেগে হঠাৎ প্রায় নিভে যাওয়া আঙার উসকে উঠল।

গঙ্গা চমকে উঠে বলল, 'কি আর করবে, ঘুমোচ্ছে হয়ত।'

'কি করে ?' সরস্বতী আবার একই রকম গলায় জিজ্ঞেস করল। গঙ্গাকে জোরে জড়িয়ে ধরল সে।

গঙ্গা বলল, 'দম আটকে যাচ্ছে ছাড়ো। ছেড়ে দে আমায়, নইলে মাকে বলে দেবো কিন্তু।' সরস্বতী গঙ্গাকে ছেড়ে দিলো।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। গঙ্গার চোখে তন্দ্রা নেমে আসছিল, অমনি সরস্বতী ফের কথা বলে তার ঘুম নষ্ট করে দিলো, 'ঘুমিয়ে পড়লি, গঙ্গা ?'

'না দিদি।'

'আমারও ঘুম আসছে না।'

'তাহলে একটা ভালো দেখে গল্প শুরু করো, ঘুম এসে যাবে।'

'আচ্ছা বলছি, শোন। তোকে হুঁ-হাঁ দিয়ে যেতে হবে কিন্তু।'

'ঠিক আছে।'

'এক রাজা ছিল। তার সাত রাণী।'

'হুঁ।'

'ওদের মধ্যে ছয় রাণী ভালো, কিন্তু অন্য রাণীটা খারাপ। সে রাক্ষস-কন্যে, রক্ত খেত।'

'হুঁ।'

'যখন সবচেয়ে বড় রাণীর, মানে পাটরাণীর একটা ছেলে হলো, তখন রাক্ষস-কন্যে ওপরে ওপরে ভালো সেজে তার খুব সেবাযত্ন করে—চল্লিশ দিন পর্যন্ত। তারপর এক রাতে সে পাটরাণীকে একা ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তার ছেলের রক্ত খেয়ে নিল।'

'হায় রাম!' গঙ্গার চোখ থেকে ঘুম উবে গেলো একেবারে। সে খুব আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনে, 'তারপর কি হলো ?'

'তারপর রাজা খুব ভেঙে পড়লেন। মহলের সমস্ত রাণী-বাঁদি চিৎকার করে করে কাঁদতে শুরু করে। রাক্ষস-কন্যে সবচেয়ে বেশী কাঁদে, বারবার মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে সে।'

'তারপর ?' গঙ্গা অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করে।

'তারপর, পরের বছর মেজরাণীর এক ছেলে হলো।'

'সেটারও রক্ত খেয়ে নিল বুঝি ?' গঙ্গা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে। সরস্বতী একটু থেমে বলে, 'হ্যাঁ, কিন্তু ...এই, ভেতরে কিসের খস্‌খস শব্দ হচ্ছে রে ?'

'আমি কি জানি ? —তুই গল্প বল।'

সরস্বতীর বুক দারুণ টিপ্‌টিপ করতে থাকে। তার হাত-পা যেন ঠাণ্ডায় সিরসির করে ওঠে। শরীরের এখানে-ওখানে যেন পিঁপড়ের সারি। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'এরপর গল্পের পুরোটাই ভুলে গেছি আমি।'

গঙ্গা বলে, 'না। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'হ্যাঁ, তাই। কথাটা মিথ্যে। আসলে আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'এই তো এখুনি তোমার ঘুম আসছিল না!'

'কিন্তু এ-বার আসছে।'

'ওটাও মিথ্যে।'

'হ্যাঁ, তাই। আসলে আমার গল্প বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন বলতে ইচ্ছে করছে না?'

সরস্বতী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেলো। রজ্জি দ্রুত পালিয়ে এসে সরস্বতীর বিছানায় লুকিয়ে পড়ল।

'কি হলো?' সরস্বতী উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রজ্জি বলল, 'যতক্ষণ আমাদের বিয়ে না হয়, ততক্ষণ আমরা এক জায়গায় শোব না।' সরস্বতীর মন খুশীতে ভরে গেলো। নিজের শরীরটাকে ফুলের মতো হাল্‌কা মনে হতে লাগল তার।

সে গঙ্গাকে বলল, 'দুঃখ করিসনে গঙ্গা। এ-বার একটা খুব সুন্দর গল্প বলছি। তুইও শুনবি রজ্জি? আমার কাছে আরও সরে আয়।'

গঙ্গা তো সরস্বতীর দু'বাহুর মধ্যে ছিলই, এখন রজ্জিও সরস্বতীর গায়ে হাত রাখল। সরস্বতীর মনে হলো, ওরা হাত ধরাধরি করে তাকে যেন চারদিকে ঘিরে রেখেছে। সে চোখ বন্ধ করে বলতে লাগল, 'এক রাজার সাত রাণী ছিল…'

* * *

বাইরে মা চথরি গাছের ঝোপে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। বারবার সে নিজের শুক্‌নো বুকে কিল মারে, দু'হাতে বুক চাপড়ায়, আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ওপরে তাকায়, তারপর আবার ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে।

পাথরের ছোট্ট ঠাকুরটির পরনে ধুতি। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যায়, চোখ দুটি ওপরের দিকে তাকানো, হাত দু'খানি এমনভাবে প্রসারিত, যেন কাউকে সহায়তা করছে। ঠাকুরটিকে মা নিজের পিত্রালয় থেকে নিয়ে এসেছিল। তার পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামে পাথরের এক বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সে এই মূর্তিটি পায়। একজন সুশিক্ষিত মূর্তি-বিশেষজ্ঞ মূর্তিটা দেখলে সহজেই বলে দিতে পারে যে, আজ থেকে চারশো বছর আগে রাজা ত্রিভুবনের স্নানাগারের ছাদসংলগ্ন স্থানে মূর্তিটির ঠাঁই ছিল। যে মূর্তি-নির্মাতা মূর্তিটি নির্মাণ করেছিল, তার সামনে ছিল রাজার বিদূষকের চেহারা, যার মজাদার চুটকিতে রাজসভা অট্টহাসিতে গমগম করে উঠত। তারপর একদিন মুসলমানরা আক্রমণ করে, ত্রিভুবন রাজার প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়, পবিত্র স্নানাগারে স্নান করতে করতে রাজাও মারা যান। আর বিদূষকের সহাস্য মূর্তিটি ধুলাবলুণ্ঠিত হয়েও শুধু হাসতে থাকে। অবশ্য দু'তিনটে দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, তবে হাসিটা নষ্ট হয়নি। কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে, যেখানে ভাণ্ডের ঝোপঝাড় ও অন্যান্য গাছগাছালি

জন্মেছে, সেখানে মূর্তিটা পড়ে পড়ে মানব-উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করে হাসছিল। এই মূর্তিটার ওপর মা-র যথেষ্ট ভরসা। সে তার চরণে প্রণত হয়ে জীবনের সমস্ত প্রার্থনা জানায়। যখন তার স্বামী অসুখে পড়েছিল, তখন সে তার কাছেই আসত স্বামীর আরোগ্য কামনা করতে। আবার স্বামী যখন মারা গেলো, তখন সে মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আকুল আবেদন জানাতে এসেছিল তার কাছেই। এখনও সে ক্ষোভে-দুঃখে ঐ মূর্তিটাকেই জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর প্রার্থনা জানাচ্ছে, 'ঠাকুর, আমার মেয়েদের বুদ্ধি-সুদ্ধি দাও, তাদের ধর্মের পথ দেখাও। হে আমার ভগবান, হে ঈশ্বর, আমার মেয়েরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর! রাক্ষসদের হাত থেকে ওদের বাঁচাও। মুসলমানদের ভরাডুবি করে দাও ভগবান...'

মা কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছে, আর পাথরের বিদূষক হেসেই চলেছে। যখন আরবীয় ঝড় বয়ে যায়, মহারাজা ত্রিভুবনের ব্রাহ্মণ-রাজ্য ভেঙে পড়ে, তখনও সে হাসছিল। যখন মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, তখনও সে হাসছিল। গঙ্গা যখন তাকে ভেতরের ঘর থেকে নিয়ে এসে এই চথরি ঝোপে রেখে যায়, তখনও সে হাসছিল। আবার যদি কোনোদিন তাকে এই চথরি ঝোপ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোনো জাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়, তখনও সে ঐভাবেই হাসতে থাকবে। কারণ যে মূর্তি-নির্মাতা তাকে নির্মাণ করেছিল, মানব-হৃদয় সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা ছিল, যে অভিজ্ঞতা ছিল অজন্তার ভাস্করদের, গ্রীক শিল্পীদের। যে অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে কালিদাসের কাব্যে, শেক্সপীয়রের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। এ কথা সত্য যে, ইতিহাস মানুষের ধ্যান-ধারণার ওপর সীমারেখা টেনে দেয়। তবে এ কথাও সত্য যে, মানুষের বুদ্ধি ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই সীমারেখাকেও অতিক্রম করতে পারে।

কিন্তু মা অবুঝ, পাথর বিচক্ষণ, তাই তার ওপর অশ্রুর কোনো প্রভাব পড়ে না। সে আগের মতোই হাসতে থাকে। মা কাঁদতে কাঁদতে এক সময় চুপ করে যায়, যেন কেঁদে কেঁদে তার মনের গ্লানি দূর হয়ে গেছে, ঘুম পাচ্ছে, চথরি ঝোপ থেকে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। উঠোনে এসে দেখে, রজ্জি, সরস্বতী আর গঙ্গা পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘুমোচ্ছে। ওদের তিনজনকে একসঙ্গে ঘুমোতে দেখে মা স্তম্ভিত হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে ভগবানের প্রতি সংশয় দেখা দেয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে তার সেই মনোভাবকে মনের মধ্যেই জোর করে দমন করে। নিজের কম্বলটা তুলে নেয়, তারপর উনুনের ছাই নিয়ে মেঝের ওপর একটা দাগ টেনে দেয়। দাগের একদিকে উনুনের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে সে। প্রথম বার মোরগ ডাকতেই ঘুম ভেঙে যায়, দেখে, তখনও রজ্জি, সরস্বতী ও গঙ্গা একভাবেই ঘুমোচ্ছে। উঠোনের আকাশের কোণে পরাজিত দাবার ঘুঁটির মতো কয়েকটি তারা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মৃদু মৃদু হাওয়ার শিহরণে সরস্বতীর সুন্দর মুখের ওপর আলুথালু চুলের একটি গোছা ধীরে ধীরে কাঁপছে। গরুটা

তার দিকে মাকে চেয়ে থাকতে দেখে আহ্লাদে ডাক ছাড়ে। সুন্দর বাছুরটি বড় বড় চোখ মেলে তাকায়।

মা দুধের মটকি নিয়ে ছাই দিয়ে মাজতে বসে। তারপর গরুকে ঘাস-বিচালি ফেলে দিয়ে নদীতে নাইতে যায়। নদীতে নেয়ে বাড়ি ফিরে দেখে, ততক্ষণে সরস্বতী গঙ্গা ঘুম থেকে উঠেছে। গঙ্গা উনুন জ্বালিয়েছে, সরস্বতী দুধ দুয়ে ফেলেছে। মা দরজার কাছ থেকেই ফিরে যাচ্ছিল, গঙ্গা জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো মা?'

মা জবাব দিলো, 'কিছু না। আজ আমার ব্রত। আমি কিছু খাব না।'

'আজ তো সংক্রান্তি নয়?'

সরস্বতী বলল, 'মা অসন্তুষ্ট হলেই সংক্রান্তি বানিয়ে নেয়।'

মা শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলল, 'ঘরে এমন ছেলেপুলে থাকলে সংক্রান্তি তো বানাতেই হবে।'

'কি করেছি আমি?' সরস্বতী গর্জে উঠল।

'ঘরে মুসলমান ঢুকিয়েছিস, এর বেশী আর কি করবি?'

গঙ্গা বলে উঠল, 'মুসলমানরা কি মানুষ নয় মা? ঐ যে রজ্জি মেয়েটা, ও কি আমাদের মতোই নয়? তোমার মেয়েকে যদি পুলিশ তুলে নিয়ে যায়, তোমার কি এতটুকু দুঃখ হবে না?'

'হবে।' —মা জবাব দিলো।

'তাহলে রজ্জির ইজ্জৎটা কি কাঁচের তৈরী?' সরস্বতী চিৎকার করে বলল।

মা বলল, 'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিস কেন? যা যা গিয়ে মুসলমানকে বিয়ে করেনে। তোর হাবভাব দেখে কিছু বুঝতে বাকি নেই আমার?'

সরস্বতী ঝাঁজাল গলায় জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, তাই করব।'

গঙ্গা বলল, 'তুই চুপ কর না সরো!'

মা ওপরে দু'হাত তুলে বলল, 'হে ভগবান!' আর তারপরই সে চথরি ঝোপের দিকে ছুটে গেলো। ভগবানের পা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'তুই শুনতে পাসনে! ভগবান, ঐ মুসলমানরা আমার মেয়েদের ধর্মভ্রষ্ট করছে। ওদের ভরাডুবি করে দে ঠাকুর!'

'কচু করবে!' গঙ্গা মায়ের পেছনে পেছনে এসেছিল, ঝাঝাল গলায় বলল, 'ভগবান কারোর মন্দ কথায় কান দেয় না, বুঝলে! তুমি তো ক্ষেপে গেছ। ভালো কিছু চাও, মিলতেও পারে।'

মা তার ওড়নায় মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ মায়ের ওপর গঙ্গার বড় করুণা হলো। সে মা-র দু'হাত ধরে নিজের গলায় জড়িয়ে নিল। চোখের অশ্রু আর বাধা মানল না! রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'মা ভয়ের কিছু নেই! কেন তুই অত ভাবছিস? আমরা কি যেমন-তেমন মেয়ে? সব বুঝি আমরা। কিন্তু

এখনই ঐ বেচারীদের ঘর থেকে বের করে দেবো, সেটা কি করে হয় ! ওরা যাবে কোথায় ? তার ওপর এ সময় চারদিকে মারামারি, পুলিশ ওদের তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন ওদের ঘর থেকে বের করে দিলে লোকে ওদের সোজা করম আলির কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। তারপর সেখানে ওদের কি অবস্থা হবে, বুঝতেই পারছ !'

মা ওড়নায় চোখের জল মুছতে থাকে।

গঙ্গা বোঝায়, 'ব্যস, এ-বার চুপ করো। ছু'চার দিনের ব্যাপার, হয়ত তার আগে ওরা নিজেরাই চলে যাবে এখান থেকে। আবতুল না ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে থাকবে। ও এলে ওর আমানতের জিনিস ওকে বুঝিয়ে দেবো, ব্যস। নে, চুপ কর এ-বার। খুব ভালো মা আমার।'

গঙ্গা মাকে চুমো খায়। মা-ও চুমো দেয় গঙ্গাকে। সরস্বতী একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার লাল লাল চোখে যেন আগুনের ফুল্‌কি ঝরছে। গঙ্গা তাকে মা-র দিকে ঠেলে দিলো, মা-মেয়ে ছু'জনেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

মেনে তো নিল, কিন্তু মা খাওয়া-দাওয়া করল না। বলল, 'যতক্ষণ ওরা এখানে থাকবে, ততক্ষণ আমার ব্রত। বড় জোর ফল-টল কিছু খেয়ে নেব।' অবশেষে অনেক বলা-কওয়ার পর উঠোনের একপাশে একটা পৃথক উন্থন পেতে নিতে রাজী হলো সে। ব্যাপারটা ফজল ও রজ্জির বড় খারাপ লাগল। ফজল বলল, 'আমাদের জন্যে আপনার এত অস্থবিধে, এটা ভালো কথা নয়। আমরা এখানে থাকব না।' রজ্জিও চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। সরস্বতী ও গঙ্গা ছু'জনেই ওদের নিরস্ত করার চেষ্টা করল, 'পাগল হয়েছ! বাইরে বেরোলেই ধরা পড়ে যাবে। কম-সে-কম আবতুলের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর সে যা বলবে, করবে। আমরা নিজেরাই মা-র জন্যে তোমাদের এখানে বেশী দিন রাখতে চাইনে। তবে এটুকু অন্তত দেখা উচিত, যাতে তোমরা রাগের মাথায় কোনো বোকামি করে না বসো। মা তো হাজার হলেও আমাদেরই মা। ও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠিক কথাই ভাবছে, আমাদের পূর্বপুরুষের পূর্বপুরুষ থেকে যেমন ভেবে এসেছে সবাই। মা-র ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

কথাটা রজ্জি ও ফজলের মনে ধরল। কিন্তু ফজল বলল, 'যাইহোক, আমি রাতে এখানে থাকব না। নিচে নদীর পাড়ে গিয়ে পড়ে থাকব।' রজ্জি তীব্র দৃষ্টিতে ফজলের দিকে তাকাল। ফজল মাথা নিচু করল। গঙ্গা মৃদু হেসে ছু'জনকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি বুঝেছি। ফজলভাই, আমি আজই মঞ্জুর আর মৌলবীকে ডেকে এনে তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করছি।'

ফজলের মুখ-চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। রজ্জি ভয় পেয়ে বলল, 'না-না, এ রকম বিপদের সময় অন্য কোনো বিপদ ডেকে আনা ঠিক নয়।'

ফজল বলল, 'তুমি বিয়েটাকে বিপদ বলে ভাবছ কেন?'

'না, ঠিক তা নয়। একটু ভেবে দেখো, যদি মৌলবী কাউকে ঘুণাক্ষরে কিছু বলে দেয় যে আমরা এখানে রয়েছি…'

'না। গঙ্গা যে মঞ্জুর আর মৌলবীর কথা বলছে, ওরা নিশ্চয়ই কাউকে কিছু বলবে না।'

গঙ্গা মৃদু হেসে বলল, 'ওরা কাউকেই কিছু বলবে না রঞ্জি।'

'কিন্তু…' রঞ্জি আমতা-আমতা করে।

ফজল জিজ্ঞেস করে, 'আবার কিন্তু কি?'

'কিছু না!' রঞ্জির কণ্ঠস্বর বড় দুর্বল। তাই দেখে সরস্বতী ও গঙ্গা দু'জনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে। মা-ও হেসে ফেলে। রঞ্জির মুখচোখ রাঙা হয়ে ওঠে। বলে, 'এ অবস্থায় কেউ কি বিয়ে করে, বলো তো?'

ফজল রাগে গরগর করে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ অবস্থায় কেউ কি বিয়ে করে! আমি তোমায় বিয়ে করছি আর কি! তোমাকে বিয়ে করার দরকারটাই বা কি আমার? ব্যস, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি এখান থেকে!'

ফজল উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে যায় আর কি! সরস্বতী গিয়ে ধরল তাকে, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'থানায় যাচ্ছি, আবার কোথায় যাব! পুলিশের হাতে নিজে থেকেই ধরা দেবো!'

রঞ্জিও এগিয়ে গিয়ে তার পথ আটকালো। তারপর মাথা হেঁট করে বলল, 'তুমি যা চাও তাই হবে।'

'হো! হো!' ফজল চিৎকার করে উঠল। দু'হাতে রঞ্জিকে ওপরে তুলে খুশীতে লোফালুফি করতে করতে নাচতে লাগল, 'হো! হো! অলীবা মস্ত কলন্দর, মলাজী ধেম্ তড়াকা!'

সরস্বতী ও গঙ্গা হাসতে শুরু করল, মা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। একটু লজ্জা-সরম নেই এই মুসলমানদের! আমি যাচ্ছি নন্দুশাহর বাড়ি, ঠাকুরকে গঙ্গাজলে নাওয়াতে হবে! কথাটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে সে সালোয়ারের পকেটে আবদুলের দেওয়া টাকাটা আঙুলে ছুঁয়ে দেখল। মা যখন নন্দুশাহর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল, তখন সে একটা বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে হুকো টানছে। নন্দুশাহ বেজায় মোটা। এত মোটা যে গাঁয়ের লোকে তার নামে রটিয়ে রেখেছিল, নন্দুশাহ না-কি দিনে মাত্র দু'বার তাকিয়া ছেড়ে ওঠে। একবার মলমূত্র ত্যাগের জন্যে, আর একবার দারোগাকে সেলাম দেওয়ার জন্যে। নইলে যেটা ওর লাশ, সেটাই ওর তাকিয়া।

মা পকেট থেকে টাকা বের করে নন্দুশাহকে দিয়ে বলল, 'আমায় এক টাকার গঙ্গাজল দাও দেখি।'

জুম্মা নন্দুশাহর পা টিপছিল। নন্দুশাহ অবাক হয়ে টাকাটার দিকে তাকাল, মা-র দিকে তাকাল, তারপর সে জুম্মাকে বলল, 'ব্যস, এখন যা এখান থেকে। আবার ডাকলে চলে আসিস।'

জুম্মা উঠে চলে গেলে নন্দুশাহ মা-র দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এ যে দেখছি এড্‌ওয়ার্ডের নতুন টাকা, তোমার কাছে এল কি করে?'

'কেন, আমার কাছে টাকা থাকতে পারে না?'

'না না, তা কেন! নিশ্চয়ই তোমার অনেক টাকা আছে! টাকা-পয়সা কমতি আছে না-কি তোমার! কিন্তু আমি বলি কি, এ যে একেবারে নতুন টাকা মনে হচ্ছে! এ টাকা গাঁয়ে এল কি করে—এড্‌ওয়ার্ডের নতুন টাকা?'

'এক মুসাফির এ দিক দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাছ থেকে নিয়েছি।'

'ওকে কি কিছু দিয়েছিলে?'

'কিছু না।'

'কিছু না? তো সে তোমায় টাকা দিলো কেমন করে? পুরো এক টাকা দান করে দিলো? খুব বড়লোক তো! লোকটা কে?'

'এক মুসলমান।'

'মুসলমান? মুসলমান এক ব্রাহ্মণকে টাকা দিয়ে ফেলল অ্যাঁ?'

মা চুপ করে রইল।

'সত্যি সত্যি বলো, মা মিসরাণী, আজকাল জমানা খুব খারাপ।'

মা আচম্‌কা বলে উঠল, 'আমার দুটি মেয়ে আছে না—সাক্ষাৎ দেবী।'

নন্দুশাহ বলল, 'আরে, আমি মেয়েদের কথা বলছিনে। ওরা তো সাক্ষাৎ দেবী দুগ্‌গা বটেই, মা মিসরাণী। কিন্তু দিনকাল এমন পড়েছে না, গঙ্গার ওপর নম্বরদারের ছেলের চোখ পড়েছে। তোমাকে জানিয়ে দিলাম কথাটা, বুঝলে! তাছাড়া, চারদিকে মুসলমানেরা বড় বাড় বেড়েছে। বলে কি-না, জায়গীরদারকে, ডোগরা সরকারকে, কোনো রাজা-মহারাজাকে খাজনা লগান দেবে না, ফসলও দেবে না। বলো, এভাবে দুনিয়ার কাজ-কারবার চলবে কি করে? আমাদের ডোগরা সরকার চলে গেলে আমরা হিন্দুরা যাব কোথায়?'

মা মাথা নাড়ল, 'তুমি তো ঠিক কথাই বলছ নন্দুশাহ।'

নন্দুশাহ হাত নেড়ে বলল, 'সে জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, এই নতুন টাকা কোত্থেকে এল? এ গাঁয়ে যত টাকা আছে, সবই রাণী ভৌরিয়ার টাকা, কিন্তু এটা ভৌরিয়ার টাকা নয়। এড্‌ওয়ার্ডের টাকা। মা মিসরাণী, ছাখো, সত্যি সত্যি বলো, কোথাও কোনো বিপদ বাধিয়ে বসো না আবার! আজকাল বাইরে থেকে খুব ধান্দাবাজ লোক আসছে।'

মা চারদিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, 'নন্দুশাহ, কাউকে বলো না…'

'রাম-রাম, কি বলো মিসরাণী! কাউকে যদি বলি, মা কালী তক্ষুনি যেন

আমায় তুলে নেয়! যদি বলি, ভীমের গদার বাড়ি পড়বে আমার মাথায়! মা জগদম্বার দিব্যি করে বলছি, ঠাকুরের একশো আট পবিত্র পীঠস্থান এই হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলছি —আমি তোমার কথা কাউকে বলব না। আর তাছাড়া, কাউকে বলতে যাবই বা কেন? গাঁয়ে তো এই তিন-চারটে হিন্দুর ঘর। একটা আমার ঘর, একটা তোমার, আর দু'ঘর তোমাদেরই মিসির জ্ঞাতিগোষ্ঠীর। মুসলমানরা চারদিকে তড়পাচ্ছে, এমন সময় তো আমাদের মিলেমিশে থাকাই উচিত।'

মা চোখ নামিয়ে বলল, 'ঘরে দু'জন মুসলমান ঢুকেছিল। ওদের সঙ্গে একটা মুসলমানদের মেয়েও ছিল। আমার ভেতরের ঘর, যেখানে ঠাকুর থাকে, সেটা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সে জন্যেই গঙ্গাজল নিতে এসেছি।'

'ওরা কে, সে কথা তো বললে না?' নন্দুশাহর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন আগ্রহ।

'মেয়েটির নাম রজ্জি ওর দাদার নাম আবদুল, সে চলে গেছে। ওর বোনের সঙ্গে আর একটা লোক আছে, তার নাম ফজল। আমার মেয়েরা ফজল আর রজ্জিকে নদীর ধারে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল।'

নন্দুশাহ জোরে নিশ্বাস টেনে নিয়ে একদম চুপ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আচ্ছা, তুমি গঙ্গাজল নিয়ে যাও।'

মা হাত কচলাতে কচলাতে ছলছল চোখে বলল, 'নন্দুশাহ, সেই মুসলমান ছেলেমেয়ে দুটো আমার ঠাকুরঘরেই লুকিয়ে আছে, পুলিশ খুঁজছে ওদের।'

নন্দুশাহ বলল, 'আমি কি জানি! ব্যস, একটাকার গঙ্গাজল নিয়ে যাও তুমি। আমি ও সব কিছুই জানিনে।'

মা নন্দুশাহর পা ধরে ফেলল, 'শাহজী! ঠাকুরের দোহাই, কি করব বলো।'

নন্দুশাহ বলল, 'পুলিশকে খবর দিয়ে দাও। নইলে তোমাকেও ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। ঐ ফজল আর রজ্জি তো টিকরী শাহমুরাদের দাঙ্গায় ধরা পড়েছিল। রাজা করম আলীর লোক ঠাকুর কাহনসিং ফৌজ নিয়ে আজ এ গাঁয়ে খুঁজতে এসেছে। আমি তোমায় বলছি মিসরাণী, গিয়ে ওদের সমস্ত ব্যাপার খুলে বলো, ছাড়া পেয়ে যাবে। গাঁয়ের লোকেরাও বিপদের হাত থেকে বাঁচবে, নইলে…'

নন্দুশাহ চুপ মেরে গেলো।

মা মিসরাণী বলল, 'সেটা তো বিশ্বাসঘাতকতা হবে!'

'তবে ভেবে ছাখো। আমার কি, ঝঞ্ঝাট পোয়াবে তুমি আর তোমার দুই মেয়ে। আমার কি, আমি কারোর ভালোতেও নেই, মন্দতেও নেই!'

মা-র চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ভীতকণ্ঠে বলল, 'হে ঠাকুর, এখন আমি কি করব? —পুলিশ ডেকে আনব?'

* * *

সরস্বতী ও গঙ্গা মৌলবীকে নিয়ে ফিরে আসছিল, পথে মঞ্জুরের সঙ্গে দেখা। সে ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছিল। সারা ক্ষেতে শুধু মকাইয়ের ডাঁটা।

গঙ্গা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি লাঙল দিতে শুরু করেছ ?'

মঞ্জুর বলল, 'চাষী মানুষ আর কি করবে, গঙ্গা !' তারপর মৌলবীর দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'সালাম মৌলবীজী ! এই বামুনদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ ? খুব ধোঁকাবাজ কিন্তু।' গঙ্গার দিকে চেয়েই কথাটা বলল সে।

মৌলবী হেসে বলল, 'তুমিও চলে এস, ভালো কাজ। একজন সাক্ষীরও দরকার হবে।'

'লাঙল রেখে যাব ?'

গঙ্গা তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শীগ্‌গীর এস মঞ্জুর। এই এক-আধঘণ্টার কাজ।'

মঞ্জুর লাঙল-গরু ঐ অবস্থাতেই রেখে দিয়ে গোল টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে বলল, 'চল গঙ্গা মিসরাণী, তোর খাতিরেই না-হয় আর একটা হয়ে যাক।'

গঙ্গা ও মঞ্জুরের চোখ ঝক্‌ঝক করে উঠতে দেখল সরস্বতী। তাতে তৎক্ষণাৎ আবদুলকে মনে পড়ল তার। সারা অন্তঃকরণ বিষাদে ছেয়ে গেলো। ক্ষেতের আলে একটা আপেল গাছ রয়েছে, সে দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। ডালপালা-গুলো সাদা সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। ওপরে নীল আকাশ। নীল আকাশে সাদা জলপায়রারা কাঁচির মতো সার বেঁধে দক্ষিণের উষ্ণ আবহাওয়া থেকে এ দিকে পালিয়ে আসছে। বসন্ত আসছে, মনে মনে বলল সরস্বতী। এক বিচিত্র অনুভূতিতে সারা মন ভরে গেলো। সারা শরীরে এমন এক শিহরণ অনুভব করল যেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বসন্তের ফুল ফুটছে। সেই বসন্তের শোভা-সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে হেলতে দুলতে সে সকলের আগে আগে হাঁটতে লাগল। গঙ্গা মঞ্জুরের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল, তার দিকে চেয়ে মঞ্জুর মনে মনে ভাবল, গঙ্গা সত্যি-সত্যিই নিমের কচি পল্লব, লক্‌লকে কোমল। তাতে কোমল সবুজ পাতা গজিয়েছে এখন। কিন্তু সরস্বতীর দেহে যেন ফুটেছে পুষ্পকোরক। দেখো না, কেমন করে হাঁটছে, যেন ভরপুর আপেলের শাখার মতো দুলছে।

বাড়ির দরজার কাছে এসে সরস্বতী ও গঙ্গা দাঁড়াল। হঠাৎ দু'জনে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে মৌলবী ও মঞ্জুরকে কথা বলতে নিষেধ করল। যদিও আগেই তারা মৌলবীর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নিয়েছে, তবু যেন সন্দেহ ঘোচে না, গঙ্গা আর একবার মৌলবীকে জিজ্ঞেস করল, 'মৌলবীজী, বলো, তুমি কাউকে কিছু বলবে না ?'

বৃদ্ধ মৌলবী হেসে বলল, 'আমি ইমানদার লোক, মা। আর এটা তো আমারই স্বজাতি ভাইবোনকে সাহায্য করার প্রশ্ন। আমার তো মনে হয়, এমন একটা ভালো কাজে খোদা যেমন আমার দিকে, তেমনি তোমাদের দিকেও।'

মঞ্জুর জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ? কই, এখনো পর্যন্ত আমাকে তো কিছুই বললে না তুমি ?'

গঙ্গা বলল, 'ফজল আর রজ্জির বিয়ে। সে জন্যে মৌলবীকে ডেকে এনেছি। তোমাকে সাক্ষী হতে হবে।'

'কোন ফজল আর রজ্জি?' মঞ্জুর জিজ্ঞেস করল, তারপর কি ভেবে যেন থেমে গেলো। তার বিস্মিত দৃষ্টি গঙ্গার দিক থেকে সরস্বতীর দিকে, সরস্বতীর দিক থেকে মৌলবীর দিকে ঘুরতে লাগল শুধু। তার চোখেমুখে যেন এক বিজেতার মনোভাব দেখা দিলো। বেশ একটু উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোন ফজল আর রজ্জি —টিকরী শাহমুরাদের? সত্যি?'

গঙ্গা ও সরস্বতী মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ —সেই —সেই।'

'ইয়া আল্লা, তুমি কি এতই দয়াময়!'

'হ্যাঁ।' মঞ্জুরকে খুশী দেখে গঙ্গা খুব খুশী।

মৌলবী বলল, 'তো চলো মা, ভেতরে চলো। তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ফেলি।'

সরস্বতী বলল, 'দাঁড়াও, আমি আগে দরজা খুলতে বলি।'

সরস্বতী দরজার কড়া নাড়ার জন্যে এগিয়ে গেলো। এ দিকে পেছনে মঞ্জুর গঙ্গার হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি তো ভাবছিলাম, আমিই যেন আধা-হিন্দু বনে গেছি। মনে হচ্ছে, তুইও যেন আধা-মুসলমান হতে চলেছিস।'

গঙ্গা মঞ্জুরের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে নিজের বুকে আঙুল ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে বলল, 'আধা আমি, আধা তুমি!'

'হুঁ!'

পেছন থেকে মৌলবী বলল, 'আমীন!' ঘন সাদা দাড়ির আড়ালে তার মুখে মৃদু হাসি।

গঙ্গা লজ্জা পেল খুব। মাথা নিচু করে বলল, 'আমি তোমায় বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম মৌলবীজী। মঞ্জুরের সঙ্গে আমার প্রায়ই ঝগড়া হয়।'

সবেমাত্র ওরা কথাবার্তা শুরু করেছে, এমন সময় সরস্বতী দরজার কড়া নাড়তেই চুপ করল সবাই। সরস্বতী দরজায় আবার জোরে খট্‌খট আওয়াজ করল। ভেতর থেকে মৃদু পদশব্দ কানে এল। আস্তে কে যেন দরজা খুলল। প্রথমে একটুখানি, পরে দরজার কপাট পুরো খুলে ফেলল। লোকটাকে দেখেই সরস্বতী, গঙ্গা, মৌলবী, মঞ্জুর সকলেই ঝট করে পেছনে সরে গেলো!

দরজা খুলেছিল একজন পুলিশের লোক। হেসে বলল, 'এস এস, ভেতরে এস। তোমাদের জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।'

ভয়ে ভয়ে তারা উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। গঙ্গা দেখল, দুটি খাটিয়ায় হাবিলদার হীরাসিং, গাঁয়ের চৌকিদার আর পাঁচ-ছ'জন সেপাই বসে আছে। উঠোনের একটা খুঁটিতে ফজলকে, অন্য একটা খুঁটিতে রজ্জিকে বেঁধে রেখেছে। মা উনুনের কাছে বসে পুলিশের লোকগুলোর জন্যে চা তৈরী করছে। গঙ্গা ও সরস্বতীকে

ভেতরে আসতে দেখেই মা একটু চম্‌কে উঠল, তারপর ওড়নায় আড়ালে মুখ ঢেকে উনুনে ফুঁ দিতে লাগল।

গঙ্গা তুমতুম করে পা ফেলে উনুনের কাছে গেলো। একেবারে মা-র কাছে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মা, কে এই পুলিশের লোকগুলোকে ডেকে এনেছে ?' মা কোনো জবাব দিলো না। সে আরও ফুঁ দিতে লাগল উনুনে।

হাবিলদার হীরাসিং হেসে বলল, 'আরে পাগলী, পুলিশের লোককে আবার ডাকবে কে, ওরা তো বিনা নেমন্তন্নেই অতিথি হয়। শুনলাম, তোমাদের বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে আছে। তাই আমি বললাম, চলো, সেই আনন্দ-উৎসবে আমরাও যোগ দিই। আমরা পুলিশের লোকেরা কি মানুষ নই ?'

গঙ্গা বেশ তেজের সঙ্গেই জবাব দিলো, 'মানুষ হলে ও বেচারাদের অমন করে খুঁটিতে বেঁধে রাখতেন না।'

'ও, এই কথা ? এক্ষুনি দড়ি খুলে দিচ্ছি। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, গঙ্গা মিসরাণী, তোমার অতিথিরা আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল। ভাবলাম, যদি ওরা পালিয়ে যায় আর গঙ্গা মিসরাণী এসে দেখে, ঘর ফাঁকা, তাহলে সে আমাদের ওপর ক্ষেপে যাবে। তাই এদের বেঁধে রেখেছি। শুধু তোমার জন্যেই। বলো না, এক্ষুনি দড়ি খুলে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, খুলে দিন।' গঙ্গা মেজাজ দেখিয়েই বলল।

হাবিলদার সেপাইদের চোখ টিপে বলল, 'দাও ভাই, ওদের ছেড়ে দাও।'

সেপাইরা ফজল ও রজ্জির বাঁধন খুলে দিলো। চারপাশে দু'তিনজন সেপাই ওদের ঘিরে দাঁড়াল।

হাবিলদার হীরাসিং মৌলবীর দিকে চেয়ে বলল, 'আরে মৌলবী সাহেব যে! মাফ করবেন, লক্ষ্যই করিনি আপনাকে। ওহো, মঞ্জুর ভাইকেও দেখছি! নম্বরদারের ছেলে! অবশ্য এ বাড়িতে আসার হক তোমারও আছে।'

সরস্বতী বলে উঠল, 'তার মানে ? কি বলতে চাইছেন হাবিলদারজী ?'

'না না, কিছু না। এই দু'চারটে সুখ-দুঃখের কথা বলছিলাম আর কি, সরস্বতী মিসরাণী! আরে, তুমি কত বড হয়ে গেছ। এই সে দিনও তো আমার কোলে চেপে খেলা করতে!'

সরস্বতী সচকিত হয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলো।

হাবিলদার বলল, 'আচ্ছা ভাই, আচ্ছা। এই সেপাইরা, ওখানে ঐ বারান্দায় চলে যাও তোমরা সবাই। আর আপনি, মৌলবীজী, এ-বার বিয়ে পড়ানো শুরু করে দিন।'

সবাই অবাক হয়ে হাবিলদারকে চেয়ে দেখতে লাগল।

হীরাসিংকে দেখে কোনো এক বৃহৎ ঘটনাবহুল নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে মনে হচ্ছিল। সে খাটিয়া থেকে উঠে বুক ফুলিয়ে উঠোনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হাতের রিভলবারটা ছড়ির মতো নাচাচ্ছে। এক সময় থেমে বলল, 'হ্যাঁ, বিয়ে হবেই মৌলবী সাহেব। আমি ঠাট্টা করছিনে, সত্যিই অন্তর থেকে বলছি —বিয়ে অবশ্যই হবে। কারোর মন ভেঙে দেওয়া পাপ। তাতে আমার চাকরি চলে যায়, যাবে।'

সরস্বতী, গঙ্গা, মঞ্জুর —সবাই স্তব্ধ। ফজল আর রজ্জি অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মৌলবী দাড়িতে আস্তে আস্তে হাত বোলায়। হাবিলদার হীরাসিং সবাইকে অবাক হয়ে যেতে দেখে বেশ খুশী। সে আবার মৌলবীকে বলে, 'মৌলবী সাহেব, কি দেখছেন আপনি? আপনার কাজ শুরু করে দিন। যতক্ষণ দু'জনের বিয়ে পড়ানো না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি এখান থেকে যাব না।'

মৌলবী ইতস্তত করতে করতে এগিয়ে যায়। বারান্দার একপাশে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে দেয় গঙ্গা, সরস্বতী কম্বল বিছিয়ে দেয়। সেখানে মৌলবী ফজল ও রজ্জির বিয়ে পড়িয়ে দিলো। বিয়ে পড়ানোর পর মৌলবী হাবিলদারকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

হাবিলদার বলল, 'সরস্বতী, মিষ্টিমুখ করাবে না?'

সরস্বতী আর গঙ্গা দু'জনেই ঘরে ঢুকল মখনা, খুরমা আর আখরোট আনার জন্যে। অমনি হাবিলদার এক সেপাইকে ইশারা করতেই সে গিয়ে দরজার শেকল তুলে দিলো।

মা উনুনের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হীরাসিং তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয় নেই মিসরাণী, তোমার মেয়েদের এতটুকু আঁচ লাগবে না। আমি ঠাকুর, রাজপুত —কথার নড়চড় হবে না।'

তারপর সে ফজলের দিকে ঘুরে বলল, 'আমি যা কথা দিয়েছিলাম, রেখেছি। এ-বার চলো!'

ফজল জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

হাবিলদার বলল, 'মোরগ, হতে হবে।'

'মোরগ?'

'হ্যাঁ।' হাবিলদার সেপাইদের ইশারা করল। সেপাইরা ফজলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফজলের সারা শরীরে রক্ত টগ্‌বগ করে ফুটতে লাগল। তার গাল দুটো এমন টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল যে, সেখান থেকে যেন রক্ত ঝরছে।

হীরাসিং চিৎকার করে বলল, 'মোরগ হতে আর যদি এক মিনিট দেরি করো, আমি গুলি করে দেবো বলে দিচ্ছি।'

ফজল মাটিতে উবু হয়ে বসল, পায়ের ফাঁক দিয়ে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে কান ধরল।

'সাবাস!' হীরাসিং চিৎকার করে উঠল, 'এ-বার ওর পিঠে দু'মণি এক পাথর চাপিয়ে দাও।' সেপাইরা বাইরে থেকে একটা পাথর নিয়ে এল।

সরস্বতী আর গঙ্গা ভেতর থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে— 'দরজা খুলে দাও! দরজা খুলে দাও!' মঞ্জুর দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেলো। একজন সেপাই তাকে বাধা দিতে যেতেই সে তাকে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। অমনি আর একজন সেপাই ছুটে গেলো। তারপর দু'জনে মিলে তাকে মাটিতে ফেলে কিল-চড়-লাথি মারতে শুরু করল।

হাবিলদার হেসে বলল, 'একটু দেখেশুনে মেরো, নম্বরদারের ছেলে।'

মৌলবী থরথর করে কাঁপছিল, সে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা, আমি যাই তাহলে?'

'তুই এখন যাবি কোথায়?' হীরাসিং তার সাদা দাড়ি ধরে টান মারল। মাথায় দুই গাঁট্টা কষিয়ে দিয়ে বলল, 'এ-বার তো জেলখানায় যেতে হবে, মৌলবী বুড়ো! আক্কেলের মাথা খেয়েছ, ফেরারী আসামীদের সঙ্গে যোগসাজশ করতে এসেছ? বিয়ে পড়াচ্ছ তাদের···? এই মাখ্‌খনসিং, এই মৌলবীটাকে একটু দলাই-মলাই দিতে হবে।'

মাখ্‌খনসিং মৌলবীকে মাটিতে ফেলে মারতে শুরু করল।

'দরজা খোলো! দরজা খোলো!' সরস্বতী আর গঙ্গা ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করছে।

হীরাসিং মাকে বলল, 'এ-বার যাব আমরা। আমাদের যাওয়ার একটু পরেই দরজাটা খুলে দেবে।'

ভেতর থেকে গঙ্গার চিৎকার ভেসে এল, 'কি করছেন হাবিলদারজী!'

হাবিলদার হীরাসিং দরজার কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'দেখো মিসরাণী, ব্রাহ্মণী, আমি রাজপুত, ঠাকুর। তোমাদের গায়ে হাত তুলতে পারিনে। তবে মুসলমানের মাল আমার মাল। আমরা এখান থেকে গিয়েই ফজলকে রাজা করম আলির কাছে পাঠিয়ে দেবো। ফজলকে দেখলে তিনি খুব খুশী হবেন। বাকী রইল মৌলবী আর মঞ্জুর। তা ওদের জেলে ঐ দু'চারদিন রেখে একটু ভালোরকম দলাই-মলাই দিয়েই ছেড়ে দেবো। আর বাকী থাকছে রজ্জি, তা আমার জন্যে ঐ যথেষ্ট।'

গঙ্গা ঘরের ভেতর থেকে জোরে চিৎকার করে উঠল, 'না না, এ রকম করবেন না হাবিলদারজী। আপনারা নিজেরাই তো ওদের বিয়ে দিলেন!'

হাবিলদার খুব নরম গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বিয়ে দিলাম যাতে ও ফজলের বউ হয়, তবে আজ রাতটুকু ও আমার কাছেই থাকবে। নইলে জীবনের মজাটাই বা কি! কুমারী মেয়ের ইজ্জৎ তো তার নিজেরই ইজ্জৎ, কিন্তু বিবাহিতা মেয়ের ইজ্জৎ বাড়ির সকলের ইজ্জৎ হয়ে দাঁড়ায়, তারই বেইজ্জতী করতে মজা। সে জন্যেই তোমাদের রেহাই দিয়ে গেলাম। নইলে এতক্ষণ কখন···'

ভেতর থেকে যেন অবিরাম দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা চলছে। গঙ্গা আর সরস্বতী তাকে চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে।

হাবিলদার হেসে বলল, 'চলো ভাই, মিসরাণীরা অসন্তুষ্ট হচ্ছে। কয়েদীদের হাজতে নিয়ে চলো। আচ্ছা মা, আমরা আসি তাহলে। দেখো, ভয় পেও না। আবার কিছু হলে আমাদের খবর পাঠিয়ে দিও। আবার আসব আমরা। আর, মিসরাণী, চা-টা ভারি চমৎকার বানিয়েছিলে। ঐ নতুন চা-পাতা কোত্থেকে আনিয়েছ ?'

ঘরের ভেতর থেকে সরস্বতী আর গঙ্গা রঞ্জির আর্তনাদ শুনতে পেল। ফজলের অসহায় গর্জনও কানে এল তাদের, যেমন কোনো অপরাধের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়ে মানুষ হতাশভাবে আর্তনাদ করে। তারপর বাড়ি থেকে তাদের বেরিয়ে যাওয়ার পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। ক্রমশ দূরে যেতে যেতে সমস্ত আওয়াজ এক সময় মিলিয়ে গেলো। চারদিকে গভীর স্তব্ধতা। আর সেই স্তব্ধতায় তারা শুধু বুনো ভেকের ডাক শুনতে লাগল —কুম্ভ …কুম্ভ …কুম্ভ …কুম্ভ —তারা এক হতাশার সুর তুলে অবিরাম ডেকে চলেছে —অনর্থক, অসঙ্গত, বেসুরো, বিরক্তিকর বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ —কুম্ভ …কুম্ভ …কুম্ভ …যেন জীবনের কোনো অর্থ নেই …কুম্ভ কুম্ভ …কুম্ভ —মানুষ জন্মগ্রহণ করে, ভালোবাসে, মেহনত করে, মারা যায়, আর এ সমস্ত ধারাবাহিকতার যেন অন্ত নেই —কুম্ভ …কুম্ভ …কুম্ভ —যেন কোথাও কোনো মানুষ নেই, চারদিকে পশু, চারদিকে বন, আর মধ্যিখানে একটি কালো রঙের শব্দ, যার কোনো অর্থ নেই— কুম্ভ …কুম্ভ…

গঙ্গা রেগে গিয়ে দরজায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল, অমনি দড়াম করে খুলে গেলো দরজা। সরস্বতী ও গঙ্গা দু'জনেই দরজার বাইরে ছিট্‌কে পড়ল। তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল ওরা। এদিক-ওদিক তাকাল। খুঁটিতে দড়ি বাঁধা রয়েছে। খাটিয়ার ওপর মাটির ভাঁড় পড়ে আছে। ওগুলোতে চা খেয়েছে পুলিশের লোকেরা। উনুনে আগুন জ্বলছে। বাছুরটা কাতর চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে। উঠোনের দরজা খোলা। বাড়িতে কেউ নেই। হঠাৎ এক পলকের জন্যে সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপরেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। দরজা পেরিয়ে চথরি ঝোপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাল।

মা ঠাকুরের পায়ে আছাড়-পাছাড় করে কাঁদছে— 'আমি আমার ধর্ম বাঁচাবার জন্যেই এ সব করেছি ঠাকুর! আমি এ সব কিছু তোমার জন্যেই করেছি। আমার মেয়েদের ধর্ম বাঁচাবার জন্যে …হে ভগবান! আমাকে বলে দাও, আমি কোনো মন্দ কাজ করিনি তো ?'

সরস্বতী কোমরে হাত রেখে বলল, 'মা, আজ তুই যা পাপ করলি, গঙ্গাজল দিয়েও তা ধোয়া যাবে না।'

মা চম্‌কে উঠে মেয়েদের দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—পাথরের ভাঁড়টা শুধু হেসেই চলেছে।

সরস্বতী ও গঙ্গা ফাঁড়িতে গিয়ে ফজল, রজ্জি, মঞ্জুর ও মৌলবীকে ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হলো না। ঠাকুর কাহনসিং এই প্রথম গঙ্গাকে দেখল। দেখে তার মনে হলো, জীবনে যেন এই প্রথমবার সে অনেক উঁচু, অনেক দূর, একেবারে আলাদা কোনো বস্তু দেখছে। এক মুহূর্তে সে গভীরভাবে উপলব্ধি করল, নারী শুধু শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার বস্তু নয়। সে এমন কোনো মহান্ দুর্লভ বস্তুও হতে পারে, যা তার নাগালের বাইরে। মুহূর্তে কাহনসিং নিজেকে একেবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও বড় দুর্বল মনে করল, যেন তার শরীরটা প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। গঙ্গার উজ্জ্বল কপালটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল সে —সেখানে সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের গভীর ছাপ।

পরক্ষণেই সে ভাবল, গঙ্গা যদি তাকে প্রেম নিবেদন করে, তাহলে কত না ভালো হয়। এমন এক প্রেম, যে-প্রেমের সঙ্গীত উঁচু পাহাড়ী উপত্যকায় রাখালেরা গেয়ে বেড়ায় —এমন এক সঙ্গীত যার স্বরধ্বনি নিচের উপত্যকা-প্রান্তরে রাখালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, এমন এক সঙ্গীত যা রাজহংসের ডানার মতো নিষ্কলঙ্ক সাদা, প্রবাসীর পদক্ষেপের মতো করুণ ও সুগভীর সরোবরে বিকাশিত ফুলের মতো সুন্দর ও সুরভিত। সে রকম প্রেম তার নিজের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ যে বস্তু হৃদয়ে প্রেম জাগায়, সে বস্তু মরে গেছে। কিন্তু গঙ্গাকে দেখে তার মনে অন্তত এ রকম এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগছে যে, গঙ্গা তাকে প্রেম নিবেদন করুক। যদিও সে একজন বড় পুলিশ অফিসার, দেবতাদের মতো সুন্দর ও অত্যাচারী, তবু গঙ্গাকে দেখে সে প্রচণ্ড দুর্বলতা বোধ করল। মনে মনে বলল —ও আমাকে ভালোবাসবে না। ও তো টিকরী শাহমুরাদের পাহাড়-চূড়ার বরফের মতো, আজ পর্যন্ত যা কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। কথাটা ভাবতেই তার ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসল। সামনে ছড়ানো বাদামী রঙের কাগজের রিপোর্টে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'এ চারজনের একজনকেও ছাড়া যাবে না।'

তারপর সে গঙ্গার দিকে সকাতর চোখে চেয়ে এক সেপাইকে ডাকল, 'শহাব! এই মেয়ে দুটিকে বেশ ভালোভাবে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস।'

শহাব, গঙ্গা ও সরস্বতী চুপচাপ ফাঁড়ি থেকে রওনা হলো। আগে সরস্বতী, তারপর গঙ্গা, সকলের পেছনে সেপাই। মাথা হেঁট করে হাঁটছে তিনজনেই। ফাঁড়ি থেকে নন্দুশাহর বাড়ি ছাড়িয়ে তার মকাইয়ের ক্ষেত অতিক্রম করল তারা। ক্ষেতে এখন মুড়িয়ে নেওয়া মকাইয়ের ডাঁটাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। খোবানির গাছ পেরোল। পেরিয়ে এল যূথিকার গাছ। জ্যোৎস্না রাতে সেখানে গঙ্গা, সরস্বতী, মঞ্জুর ও গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা খেলতে আসত। সামনে ধরেকের গাছ। একবার তার একটা পল্‌কা ডালে ঝোলানো দোলনায় দোল খেতে গিয়ে ডালটা ভেঙে যায়। গঙ্গার কাঁধ ছড়ে যায় অনেকখানি। মঞ্জুর তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার যেখানটায় ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন,

সেই জায়গাটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল গঙ্গা। তারপর তারা ক্ষেতের আল ধরে ধরে অনেকক্ষণ হাঁটল। সামনে একটা আপেল গাছ, তার সাদা আর গোলাপী ফুল-গুলো এমন ঝলমল করে উঠল যে, যেন হঠাৎ এক ঝলক অশ্রুতে চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। হঠাৎ গঙ্গার মনে হলো যেন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। থমকে দাঁড়াল সে। সামনে মঞ্জুরের বিস্তৃত ক্ষেত। তখনও সেখানে বলদ দুটো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কাঁধে লাঙলের জোয়াল। ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা তাদের প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

গঙ্গা চোখ তুলে তার দিদির দিকে তাকাল, তারপর সেপাইটার দিকে, আর তারপর এক অদ্ভুত অনুভূতিতে খুশী হয়ে দৌড়তে দৌড়তে ক্ষেতের মাঝখানে চলে গেলো। লাঙলের মুঠো ধরে লাঙল বইতে লাগল সে। লাঙলের ফলা মাটির গভীরে ঢুকে গেলো। বলদ দুটো হাঁটতে শুরু করলে দু'পাশে ঝুরঝুরে মাটি তুলে লাঙলের ফলা এগিয়ে চলল। এই মাটির সারিতেই বীজ পড়ে, সবুজ অঙ্কুরোদ্গম হয়। লাঙল বইতে বইতে হঠাৎ গঙ্গার চোখ দুটো জ্বালা কোরে আনন্দাশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বড় কোমল এক অনুভূতিতে তার সারা মন ভরে গেলো। যতক্ষণ লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা সম্ভব হয়, যতক্ষণ বীজ বপন করা যায়, যতক্ষণ ঝুরঝুরে ধূসর মাটিতে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত হতাশ হওয়ার কিছু নেই!

* * *

সন্ধ্যার মুখে, আঁধারি হতে না হতেই গঙ্গা ও সরস্বতী মঞ্জুরের সমস্ত জমিটা চষে বাড়ি ফিরল। মা তখন ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটছে আর আক্ষেপ করছে, কেন সে নন্দুশাহর বাড়ি গিয়েছিল! মা-মেয়ে কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলল না। গঙ্গা উনুনের কাছে গিয়ে উনুন জ্বালালো। সরস্বতী নদী থেকে জল আনতে যাবে ঠিক করল। দেওয়ালে লটকানো ফুলতোলা ফেটা মাথায় দিয়ে তার ওপর কলসি বসিয়ে উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। চখরি ঝোপের কাছে এসে হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেলো। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর এগিয়ে গিয়ে চখরি ঝোপ থেকে ঠাকুরের মূর্তিটাকে তুলে নিল। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পায়ে হাঁটা-পথ ধরে নিচে নেমে গেলো।

নিচে নামতেই সেই জায়গাটা, যেখানে ফুলের বিছানায় সে প্রথম আবদুলকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। আবদুলের কথা মনে পড়তেই তার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলো, পরক্ষণেই সে হাসি বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত হলো, চোখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। এখন কি হবে? আবদুল কি বলবে? কি করে আবদুল তাকে আর বিশ্বাস করবে? এই সব ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে অনেকক্ষণ সেই ফুলের পাটাতনের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ভারি বিষণ্ণ পদক্ষেপে নদীতীরের দিকে এগিয়ে গেলো।

নদীর ধারে পৌঁছে সে মাথা থেকে কলসি ও লাল ফেটা নামিয়ে রাখল। সালোয়ারটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পাথরের মূর্তিটা হাতে নিয়ে নদীতে নেমে পড়ল। মূর্তিটাকে ধীরে ধীরে ধীরে সস্নেহে নদীর জলে ফেলে দিয়ে অনেকক্ষণ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল, কারণ সে একান্তই নির্বোধ মেয়ে। চখরি ঝোপ থেকে তাকে তুলে এনে কেন নদীর জলে ফেলে দিলো, সে কথা ঠাকুরকে কি বলে বোঝাবে, ভেবে পাচ্ছিল না। তার মা তাকে দু'চারটে মন্ত্র শিখিয়েছিল, সেগুলো আওড়ানো সত্ত্বেও মনে শান্তি নেই, নির্মল স্বচ্ছ জল, অতখানি গভীর জলের নিচে থেকেও পাথরের মূর্তিটা তার দিকে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হাসছে। সরস্বতী জোড়হাত করে অনেকটা যেন এইভাবে ঠাকুরকে বলল, 'তোমার জন্যেই মা এত বড় পাপ করল, আমি বুঝতে পারিনে কেন তুমি সব সময় শুধু হাসতে থাক! আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কি তোমার ওপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করে না? এখন তুমিই বলো, আবদুল যখন ফিরে আসবে, তখন আমি তাকে কি জবাব দেবো? ভাবছি, এটাই ঠিক, তুমি এখানে এই জলের মধ্যে থাকো, যাতে তোমার ওপর কখনও মা-র নজর না পড়ে। আমার মা খুব ভালোমানুষ, কিন্তু যখনই সে তোমায় ত্যাখে —জানিনে, তার মনটা কি রকম হয়ে যায়! তখন সে আমাকে, গঙ্গাকে, মঞ্জুরকে, সারা পৃথিবীকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। আর যখন সে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে, তখন সে আবার ঠিকভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলে। আমাকে ক্ষমা করো ভগবান! বাধ্য হয়েই নিচমনা হতে হয়েছে আমাকে। কারণ তুমি ঐ চখরি ঝোপে না থাকলে হয়ত মায়ের পরিবর্তন হবে, সে জন্যেই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, এটা খুব ভালো জায়গা। গঙ্গাজলের মতো ঝকঝকে পরিষ্কার কাগানের জল সব সময় তোমাকে নাইয়ে দিয়ে তোমার ওপর বয়ে যাবে। এখানে আমার মা-র কাছ থেকে তুমি অনেকটা দূরে থাকবে, আমার মা আবার ঠিক হয়ে যাবে —এই ভালো হলো, তাই না!'

কিন্তু সরস্বতীর অপরাধী মন পুরোপুরি শান্ত হলো না। সে দেখল, পাথরের মূর্তিটা তার দিকে চেয়ে চেয়ে সমানে হেসে চলেছে, এখন তার সেই হাসি বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সরস্বতী আস্তে আস্তে নদী থেকে উঠে এল। মাথায় লাল বিঁড়ে রেখে কলসিতে জল ভরল সে। কলসির মুখের বাড়তি জলটুকু হাত দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর এক হাত কলসির গলায়, আর এক হাত কলসির নিচে রেখে দু'হাতে জোর দিয়ে কলসিটা যেই মাথায় তুলতে যাবে, এমন সময় একটি পুরুষালী হাত এগিয়ে এল, কলসিটাকে একটা ছোট্ট শিশুর মতো তুলে তার মাথায় বসিয়ে দিলো।

সরস্বতী চাপা গলায় বলল, 'আবদুল!'

আবদুল হেসে বলল, 'আমি রামভরসা, সরো।'

এমন আদর করে 'সরো' বলে ডাকল যে, আবদুল নিজেই বড় আশ্চর্য হলো।

সরস্বতীর সামনে এসে দাঁড়ালে সে বানোকে প্রায় ভুলেই যায়। প্রথমত, সরস্বতী তার সমস্ত রূপরাশি নিয়ে এত কাছে দাঁড়িয়ে, এত কাছে তার উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস, অগ্নিশিখার মতো গাল দুটি, এত কাছে তার আন্দোলিত বুকের সুগঠিত বর্তুলাকার কুচযুগ —অপরদিকে বানো বহু দূরে। তাই সে মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। সরস্বতীও পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হয়। 'সরো' সম্বোধনে ভালোবাসার আওয়াজ সে-ও শুনতে পায়, কিন্তু সেটাকে যেন কোনো জলপ্লাবনের তরঙ্গে একটি ছোট্ট ক্ষীণকায় রঙিন মাছের মতো সাঁতার কাটতে দেখায়। মাছটা ছোটই, কিন্তু সরস্বতীর হৃদয়ে প্রচণ্ড জলপ্লাবনের তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই তরঙ্গ ক্রমে ঘূর্ণাবর্তের আকার ধারণ করছে, রঙিন মাছটি সেই ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে ক্রমশ হারিয়ে যায়। সরস্বতী একটা মৃদু আর্তনাদ করে পেছনে সরে দাঁড়ায়। আবদুলের সম্বিৎ ফিরে আসে। একজন প্রণয়িণী ও একজন অন্য নারীর মাঝখানে মানুষ দশহাজার বছর ধরে যে ব্যবধান গড়ে তুলেছে, সে রকম একটি দূরত্ব উপলব্ধি করে সে। তারপর আবার সবুজ শ্যামল কিশলয়ে তার হৃদয় ভরে উঠতে থাকে। হঠাৎ সরস্বতীর মুখখানিতে ভয় ও আতঙ্ক চোখে পড়ে তার। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার! এমন চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছ কেন?'

'মা ফজল আর রজ্জিকে ধরিয়ে দিয়েছে।' সরস্বতীর মুখ থেকে আচম্‌কা কথাগুলি বেরিয়ে আসে যেন।

আবদুল বিস্ময়ে হতবাক। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, টল্‌তে টল্‌তে কাছের একটা পাথরে বসে পড়ে সে।

সরস্বতী বেদনার্ত কণ্ঠে বলে, 'আমাদের তিরস্কার কোরো না আবদুল। আমি আর গঙ্গা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, থানায় গেছি, কিন্তু ফজল আর রজ্জিকে ওরা কিছুতেই ছাড়ল না। ফজল আর রজ্জিকে তো ছাড়লই না, উপরন্তু আমাদের গাঁয়ের নম্বরদারের ছেলে মঞ্জুর আর মৌলবীজীকেও আটকে রেখেছে ওরা…'

আবদুল স্তব্ধ।

'এখন ওরা তোমাকে ধরার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের ধারণা, তুমি এখানে নিশ্চয়ই আসবে তোমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে। শহাব সেপাইটা বলছিল, আজ রাতে আমাদের বাড়ির চারপাশে পুলিশ-পাহারা থাকবে। শহাব লোকটা খুব ভালো। সে বলেছে, ফজল আর রজ্জির জন্যে সে বড় দুঃখ পেয়েছে, ওদের ছাড়াবার জন্যে সে সব রকম চেষ্টা করবে।'

আবদুল নির্বাক।

সরস্বতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমার কোনো দোষ নেই, আবদুল!'

আবদুল পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ তুলে সরস্বতীর দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে সরস্বতীকে ঘৃণার প্রতিমূর্তি বলে মনে হলো। হঠাৎ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ঘৃণাবোধ টগ্‌বগ্ করে ফুটতে ফুটতে বেরিয়ে এল যেন। আবদুল স্বভাবতঃই ভালো-

মানুষ। বহুদিন আগেই অপবিত্র আবর্জনা ভেবে সে তার সমস্ত ঘৃণাবোধকে বেঁধে-ছেদে মনের এক কোণে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু কে জানে কেমন করে সেই ঘৃণাবোধ ভেতরে ভেতরে ফোঁড়ার মতো পেকে উঠেছে, এখন তা ফেটে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তীক্ষ্ণ তিক্ত গলায় সে সরস্বতীকে বলল, 'তোমরা সবাই নির্দোষ, তোমরা হিন্দুরা সবাই নির্দোষ, দোষী শুধু আমরা মুসলমানেরাই। তোমাদের মহারাজা নির্দোষ, কেন না সে হিন্দু। ঠাকুর কাহনসিং নির্দোষ, কেন না সে হিন্দু। তোমার মা নির্দোষ, কেন না সে হিন্দু—তোমরা সবাই নির্দোষ, কেন না তোমরা শাসক। আর যেহেতু আমরা শাসিত, তাই আমার বাবা খুন হলো, মা বিধবা হলো, আমার বোনকে বেশ্যা বানানো হলো। খোদা তোমাদের সমস্ত হিন্দুকে নিপাত করুক—আমি তোমাদের ওপর দশ হাজার বার, দশ কোটি বার অভিসম্পাত জানাচ্ছি।'

হঠাৎ আবদুল চুপ করে গেলো। কারণ সরস্বতীকে অত্যন্ত অসহায় দুর্বল দেখাচ্ছে। তার চোখ দিয়ে অবিরত অশ্রু ঝরছে। নিজের রূঢ় ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে চুপ করল আবদুল। সে নিচু হয়ে নদীর তীর থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ওপারে ছুঁড়ে দিলো। পাথরটা ওপারে গিয়ে পৌঁছাল না। পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরেই নদীর জলে পড়ে ডুবে গেলো। সরস্বতীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শহরের রাস্তা ধরল আবদুল—ঐ পথেই সে রজ্জির দেখা পেয়েছিল আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল সে।

সরস্বতী চিৎকার করে ডাকল, 'আবদুল!'

কিন্তু আবদুল দাঁড়াল না, সে এগিয়ে চলল। বিমর্ষ ক্লান্ত ভারি পা ফেলে ফেলে হেঁটে চলল। শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সমস্ত মনটা চুনের মতো টগ্‌বগ করে ফুটছে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে—তখন সে ছোট। লালা মীরাশাহের বাড়ি তৈরী হবে, সেই উদ্দেশ্যে কাগানের তীরে চুনের ভাটি দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সে কয়েকটা চুনের ডেলা তুলে নেয়। কি ধবধবে সাদা চুনের ডেলাগুলো! তারপর সে চুন বানাবার জন্যে ডেলাগুলোতে কাগানের জল দিতেই সোঁ-সোঁ করে সেগুলো জলে ওঠে যেন। এমন গরম হয়ে ওঠে যে, তার হাতের তলায় ফোসকা পড়ে যায়। আজ আবদুলের মনে হচ্ছে, শুকনো চুনের মতোই তার অন্তর ভেতর থেকে সোঁ-সোঁ করে ফুলে উঠছে। তার বিশ্বাস, সরস্বতীর কাছে যদি সে আর একটুও অপেক্ষা করত, তাহলে তাকে হয়ত দু'চার থাপ্পড় মেরেই বসত। তাই সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসেছে। ইচ্ছে করছিল একবার পেছন ফিরে সরস্বতীকে দেখে, হয়ত শেষবারের মতোই, কিন্তু বড় কষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করল সে। রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে চলল। আজ বড় সাবধানে যেতে হবে তাকে। বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট ছোট হাঁটাপথ ধরে এগোতে হবে। বনজঙ্গল এড়িয়ে চলা দরকার। জঙ্গলে ভালুক শুয়োর চিতাবাঘ রয়েছে,

কিন্তু জায়গীরদারের সেপাইদের চেয়ে বন্য জন্তু বেশী ভয়ঙ্কর নয়। আবদুল চোখ তুলে পশ্চিম দিকে তাকাল, পাহাড়ের আড়ালে তখন সূর্য ডুবছে।

সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সরস্বতী কাগানের ধারে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ আবদুলকে দেখা গেলো, ততক্ষণ তার মনের ঘূর্ণাবর্তে সেই রঙিন ছোট্ট মাছটা সাঁতার কাটল। এক সময় সূর্য ডুবল, দিগন্তের শেষ সীমারেখায় আবদুল একটা কালো খড়কুটোর মতো দেখা দিয়ে অদৃশ্য হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই রঙিন মাছটাও যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। সরস্বতীর মনে হলো, তার আর কিছুই নেই। তার সমস্ত হৃদয় একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। যেন অশ্রুজলে ভরা কলসি মাথায় নিয়ে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

*　　　*　　　*

আবদুল শহরে প্রবেশ করে তন্দুরি রুটিওয়ালাদের অন্ধকার নোংরা বাজারটার দিকে যখন মোড় নিল, ঠিক সেই সময় জেলখানায় বারোটার ঘণ্টা পড়ল, অমনি নিকটস্থ তোপখানা থেকে কামান দাগা হলো। কামানের আওয়াজ কাছের পাহাড়গুলোতে প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে মিলিয়ে গেলো। খালের সাঁকোটা পেরোবার সময় তার লোহার পেরেকওয়ালা জুতোয় সাঁকোর নীল মেঝেতে খট্‌খট আওয়াজ হচ্ছে। সম্ভবত পাহারাদারের কানে সেটা খুব বিশ্রী ঠেকছিল। সে আবদুলকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘এই রাত বারোটার সময় কোথায় যাচ্ছ?’

আবদুল বড় ক্লান্ত স্বরে বলল, ‘ভাই, আমি মুসাফির, অনেক দূর থেকে আসছি। কাদের আলির দোকানটা যদি খোলা পাই, সেই ভেবে তন্দুরওয়ালাদের বাজারে যাচ্ছি। দু’দিন ধরে না খেয়ে আছি কি-না!’

বিনয়ের সঙ্গে আবদুল জবাব দিলো দেখে সেপাইয়ের ভালো লাগল। হেসে বলল, ‘আচ্ছা যাও। তবে জুতো জোড়াটা খুলে বগলদাবা করে নাও। নইলে এক্ষুনি হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে পুরে দেবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ঘুমোচ্ছিলাম, খামোকা আমার ঘুমটা মাটি করে দিলে।’

আবদুল জুতো জোড়া খুলে বগলদাবা করে নিল।

সাঁকো পেরিয়েই বাজিওয়ালা ফতে আলির দোকান। দোকান বন্ধ। সামনে জম্মুর হিন্দু চামারদের একটা ছোট্ট বাজার। চমৎকার জুতো তৈরী করে ওরা। শহরের অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরা এবং জায়গীরদারেরাই সে জুতো ব্যবহার করে। চামারদের বাড়ির মেয়েরাও সাধারণত বেশ সুন্দরী, তাই ধনী ও জায়গীরদার লোক ছাড়া আর কে-ই বা তাদের ব্যবহার করতে পারে! চামারদের বাজার পেরিয়ে হামিদ পানওয়ালার দোকানের সামনে দিয়ে যায় আবদুল। হামিদ খুব শৌখিন ছেলে, মেয়েদের মতো মাথায় চুল রাখে। শহরের পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ঠাকুর গুরবচনসিং খুব ভালোবাসেন হামিদকে। চমৎকার কওয়ালি গায়, পানও সাজে চমৎকার। এ সব ছাড়াও তার আরও অনেক গুণ আছে, শহরের শৌখিন

মেজাজের লোকেরা গোপনে সে সব আলোচনা করে। ওর আগে এ শহরে পানের কোনো দোকান চলত না। দু'চার বার দোকান খোলার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু পান খাওয়াটা কারোর পছন্দ হয়নি। আর ওতে আছেই বা কি? পাতায় চুন-খয়ের লাগিয়ে মুখে পুরে চিবোনো, যেমন ঘোড়ায় দানা চিবোয় আর কি! কিন্তু হামিদ দোকান খুলতেই পানের মজাটা পুরো বদলে গেলো যেন। পানের পাতাগুলো রসে টস্‌টসে, তেমনি বিচিত্র স্বাদ, চড়া সুগন্ধ আর সামান্য কটু আস্বাদে সবাই যেন মোহিত হয়ে গেলো। যাক সে সব কথা! হামিদের পানের দোকান তখনও খোলা রয়েছে। একজন খদ্দের তাকে দিয়ে অনেক পান সাজিয়ে নিচ্ছে। পুলিশের এক হাবিলদার হামিদের খুব কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে খোশগল্প করছে। হঠাৎ তার নজর আবদুলের ওপর পড়তেই সে তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই, কে তুই?'

আবদুল বড় করুণ গলায় মাথা হেঁট করে বলল, 'মুসাফির, হুজুর। অনেক দূর থেকে আসছি, দু'দিন না খেয়ে আছি। তন্দুরওয়ালাদের বাজারে যাচ্ছি, যদি কোনো দোকান খোলা পাই।'

'তন্দুরওয়ালাদের বাজারে যাচ্ছিস তো ঐভাবে বগলদাবা করে জুতো নিয়ে যাচ্ছিস কেন?' হাবিলদার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

'হুজুর, সাঁকোর পাহারাদার এভাবেই নিয়ে যেতে বলল—আমার জুতোয় না-কি ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে।'

'পাহারাদারের মা-র··· তোর বোনের···! এক্ষুনি জুতো পরে নে, নইলে হাজতে পুরে দেবো।'

'ঠিক আছে হুজুর।'

আবদুল জুতো পরে নিয়ে হাবিলদারকে সালাম জানাল। তারপর সামনে পা বাড়াল সে। হাবিলদার হামিদ পানওয়ালার দিকে ঝুঁকে বলল, 'এমন একটা পান সেজে দাও তো প্রাণেশ্বরী, সারা রাত যেন নেশা না কাটে।'

হামিদ চুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল, 'হাবিলদারজী, অমন পানের জন্যে অনেক পয়সা চাই!'

'ওরে, পয়সার কথা ভাবছিস কেন!' হাবিলদার ঠন্‌ঠন করে টাকা বাজিয়ে বলল, 'তোর জন্যে আর তোর পানের জন্যে সারা দুনিয়ার ধন ঢেলে দিতে পারি, প্রাণেশ্বরী!'

* * *

তন্দুরওয়ালাদের বাজারটাও বন্ধ হয়ে গেছে। হামিদের দোকান থেকে বাজারটা ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে, তাই আবদুল এখান থেকেই বাজারের সমস্ত দোকান-পাট দেখতে পাচ্ছিল। চড়াইয়ের ওপরে কেবল একটি মাত্র দোকানের দরজা একটু খোলা আছে, সেখান দিয়ে ভেতরের আলো এসে পড়ছে বাইরে। আবদুল

খোদার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাল। ক্লান্ত পা দু'খানিকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলল সে, তন্দুরওয়ালাদের বাজারে যাওয়ার জন্যে চড়াই ভাঙতে শুরু করল। চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে তার দম বেরিয়ে যাচ্ছে। কারণ সত্যি-সত্যিই সে দু'দিন ধরে কিছুই খায়নি, খিদেয় প্রাণ কণ্ঠাগত। কাদের আলির দোকানে পৌঁছেই তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো। হাঁপাতে হাঁপাতে সে একটা অব্যবহৃত খস্‌খসে কালো বেঞ্চের ওপর গিয়ে পড়ল।

তখন দোকানে অন্য কেউ ছিল না। শুধু কাদের আলি আর তার চাকরটা দোকান সামলে সবে খেতে বসেছে। এমন সময় একজনকে দোকানের ভেতরে এসে ঐভাবে পড়ে যেতে দেখে দু'জনেই খাবার থেকে হাত গুটিয়ে নিল। কাদের আলি তড়াক করে উঠে আবদুলকে ঘাড় ধরে ওঠাল. 'আরে আবদুল, তুমি! কবে এলে?'

কাদের আলি তন্দুরওয়ালার পুরনো খদ্দের আবদুল। ওখানেই খায় সে, কখনও ধার বাকী চায় না। সেটা কাদের আলির খুব পছন্দ। তাছাড়া ওর কথাবার্তা ভারি মিষ্টি, স্কুলে পড়ানো গরিব শিক্ষকেরা যেমন হয় সাধারণত।

আবদুল বলল, 'শীগ্‌গীর আমার জন্যে খাবার নিয়ে এস।'

কাদের আলি বলল, 'খাবার তো নেই এখন। খানিকটা দুধ বেঁচে গেছে, খেয়ে নাও। গুল্লা, ঐ গেলাসটায় করে দুধ নিয়ে আয়।' তারপর সে আবদুলকে বলল, 'দুধটুকু খেয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গেই বসে যাও।'

দোকানের এক পাশে ঘুমিয়ে ছিল একটা লোক, গোলমালে ঘুম ভেঙে গেলো তার। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? কি ব্যাপার? এমন হাট বসিয়েছ কেন?'

কাদের আলি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'না না, কিছু না জহমত ভাই। এই বেচারা আবদুল, টোরিয়া স্কুলের মাস্টার, ছেলেপিলেদের পড়ায়, গ্রাম থেকে আসছে, খায়নি কিছু —তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি এখুনি ওকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে ওর শোয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি— মাফ করো, জহমত ভাই।'

এত অল্প সময়ের মধ্যে কাদের আলির এমন সবিস্তারে কথা বলার কারণ, সে জহমত আলিকে খুব ভয় পায়। শুধু কাদের আলিই তাকে ভয় পায়, তাই না, শহরের তা-বড় তা-বড় লোক, এমন কি জায়গীরদারেরাও ভয় পায় তাকে। জহমত আলির আসল নাম রহমত আলি, কিন্তু সে নিজেও তার নাম রহমত আলি বলে না, বলে জহমত আলি, এবং লোকে তাকে ঐ নামে ডাকলেই সে খুশী হয়। বেঁটে চেহারা, মজবুত গড়ন, ফরসা রঙ। সে না-কি তার বাবার সন্তান নয় এবং সে কথা বুক ফুলিয়ে সকলের সামনে বলে বেড়ায়। বলে, 'আমি আমার আব্বার ছেলে নই, দাদার (ঠাকুর্দার) ছেলে।' লোকে যখন বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে যে সেটা কি করে সম্ভব, তখন সে খুব মেজাজ নিয়ে বিশদভাবে জানায়, 'আমরা পাঁচশো বছর ধরে জগাঁপরাদা গাঁয়ের নম্বরদার আর জায়গীরদার।

আমাদের ওখানে রেওয়াজ হচ্ছে, বাপ নিজের স্ত্রী ছাড়াও বড় ছেলের বউকেও নিজের বউ বলে মনে করে। —সেটা কি করে? আচ্ছা, আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছাখো, এই যেমন আমার দাদা এখনো বেঁচে আছেন, আর খোদার ফজলে (কৃপায়) তিনি নিজেকে আমার চেয়ে তাগড়া জোয়ান বলে মনে করেন। তাঁর বড় ছেলে, মানে আমার আব্বাও বেঁচে আছেন, আমি তাঁরই ছেলে। আবার আমারও ছেলে আছে। এখন ব্যাপার হলো, আমার দাদা আমার আব্বার স্ত্রীর সঙ্গে, মানে আমার মা-র সঙ্গে নিজের স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করেন, আমার আব্বা আমার বউকে নিজের বউয়ের মতো দেখেন। আবার আমিও আমার ছেলের বউকে আমার বউয়ের মতোই দেখব। সেই হিসেবে, আমার দাদাই আসলে আমার বাবা। আমি তাঁর ছেলে। আবার আমার যে নাতি হবে, আসলে সে আমারই ছেলে।'

তার কথা শুনে একবার কাদের আলি তন্দুরওয়ালা তিরিক্ষে মেজাজে বলেছিল, 'তা হলে বলো না, তোমাদের সারা বংশকে বংশটাই হারামজাদা।'

সে কথা শুনে জহমত আলি ক্ষেপে গিয়েছিল, ছুরি বার করেছিল সে। কিন্তু কাদের আলিও খুব তাগড়া। তবে বেশী দূর গড়ায়নি, অন্য পাঁচটা কথাবার্তা এসে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেয়। কাদের আলি আর জহমত আলির মধ্যে আবার জমাট ভাব হয়ে যায়। জহমত আলি ও তার বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডা তন্দুরওয়ালার দোকানেই। এর আগে সে পুলিশের হাবিলদার ছিল, কিন্তু কড়া মেজাজের জন্যে চাকরিতে বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেনি। হিন্দুর সেবা করাটা মোটেই পছন্দ নয় তার। একবার একটা সামান্য কথায় সে পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের মাথায় চাঁটি মেরেছিল। তিনি আবার জাতে রাজপুত। সেই অপরাধে ছ'মাস জেল খাটতে হয় তাকে। জেল থেকে ফিরে এসে তার মনের শুধু একটিই অভিপ্রায়, যেমন করে হোক হিন্দু রাজার রাজত্ব খতম করো। 'তাজ্জব ব্যাপার বন্ধুগণ! পাঁচশো বছর ধরে আমরা এ দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করে আসছি। সব কিছু ছিল আমাদের মুঠোয়! আর বর্তমানে কাফেররা কি-না মহারাজা গুলাবসিংয়ের আমল থেকেই সব কব্জা করে রেখেছে। এইসব কাফেরদের এখান থেকে তাড়াতে হবে' —জেল খেটে আসার পর জহমত আলি খাঁ-র এই একটাই ধুয়ো। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে সে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। রাজ্যের বাইরের লোকের কাছেও সে পরিচিত। তারাও তাকে মেনে চলে। শহরের এবং শহরের বাইরে গ্রাম-গঞ্জের জায়গীরদার ও খোজা জাতের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সাও আদায় করে। ইতিমধ্যে চারটে বিয়ে করেছে, অবশ্য প্রথম স্ত্রী তার বাবার কাছে থাকে, বাকি তিনটে তার কাছেই রয়েছে। ছেলের বয়সও বারো-তেরো বছর হলো। তার ইচ্ছে, আর দুটি বছর কোনো রকমে কেটে গেলে সে ছেলের বিয়ে দিয়ে বংশের প্রাচীন প্রথা রক্ষা করবে। প্রথাটির ওপর তার অখণ্ড বিশ্বাস। সে বলে,

'এই প্রথার ফলেই আজ পাঁচশো বছর ধরে আমাদের বংশের ধারা অটুট আছে। আর আমাদের বংশের দুর্ভাগ্যই বলো আর যাই বলো, একশো বছরের ওপর বয়স না হলে কেউ মারা যায় না।'

জহমত আলি আবদুলের নাম শুনে একটু চমকে উঠল। লেপ থেকে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। সোনালী চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালে এসে পড়েছে। আবদুল থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গেলাস তুলে ঢকঢক করে দুধ খাচ্ছিল। জহমত তাকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে গেলাসটা কাঠের বেঞ্চের ওপর ঠক করে নামিয়ে রাখল আবদুল। তারপর মৃদু হেসে ভয়ে ভয়ে জহমত আলিকে সালাম করল। কাদের আলি বলল, 'এস, এ-বার আমাদের সঙ্গে খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সব।'

কাদের আলি আর তার চাকর জাঁবাজের সঙ্গে খেতে বসল আবদুল। জহমত আলিও বসে গেলো ওদের সঙ্গে। যদিও সে বেশ ভালোরকম খাওয়া-দাওয়া সেরেই ঘুমিয়েছিল, তবু সে বেশ বড় একটা গ্রাস নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তোমার বাড়ি থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি খবর ওখানকার?'

'সব ঠিক আছে।'

'মিথ্যে কথা বলছ তুমি।'

'কেন?'

'কারণ, আমি জানি, তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।'

আবদুল চুপ করে গেলো।

জহমত আলি দ্বিতীয় গ্রাসের জন্যে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'জায়গীরদার করম আলি তোমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে, তোমার বোন রজ্জি আর তার হবু-বর ফজলকে ঠাকুর কাহনসিং গ্রেপ্তার করেছে—সব খবর আছে আমার কাছে।'

আবদুল খাবার থেকে হাত গুটিয়ে নিল।

জহমত আলি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'না না, খাও, খেয়ে নাও—আমি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবো না, নিশ্চিন্ত থাকো তুমি—আমাকে অমন অমানুষ ভেবো না—আমি মুসলমান।'

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি করতে চান আপনি?'

জহমত আলি একটা বড় হাড় থেকে মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'তোমার ওপর অবিচার হয়েছে! আরও শোনো, তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেও যেতে দেবে না তোমায়। এখন তুমি আর রাওয়ালপিণ্ডিতে পরীক্ষা দিতে যেতে পারবে না।'

আবদুলের মন একেবারে ভেঙে পড়ল। সে অনেক আশা নিয়ে শহরে এসেছিল, কত চেষ্টা-চরিত্র করে এ পর্যন্ত পড়েছে। সে বড় হতে চেয়েছিল, অনেক বড়। তার জন্যে কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল সে, কিন্তু একটি ঝড়েই সমস্ত যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। সে যে নীড় তৈরী করেছিল, খড়কুটোর মতো কোথায় তা উড়ে গেলো। আজ তার কোনো ঘরবাড়ি নেই, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। একটা প্রচণ্ড ঘৃণা তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। না জানি কোত্থেকে তার শরীরে এত শক্তি এল! সে সজোরে জহমত আলির হাত চেপে ধরে বলল, 'জহমত আলি খাঁ, আগে লেখাপড়া শিখে রাজাসাহেবের কাছে চাকরি করতে চেয়েছিলাম, এখন আমি লড়াই করতে চাই —এখন লড়াই করতে চাই আমি। আমায় বলে দাও, কারোর নাম বলে দাও, আমি তার রক্ত চুষে খাব।'

জহমত আলি খাঁ হাসল। বলল, 'ওভাবে নয়, বাবা। ওভাবে কিছু হয় না। যা-ই করতে চাও না, ধৈর্যের সঙ্গেই তা করতে হবে। অনেক দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে হয় তাতে।'

'এখন আমার চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার —বলুন, এখন আমি কি করব, কি করতে হবে আমায়?'

জহমত আলি পরিষ্কার করে মাংস ছাড়িয়ে খেয়ে হাড়খানা দস্তরখানায় (টেবিল ক্লথে) রেখে দিলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ভয় নেই, আমি কাল তোমায় রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। তিনিই তোমার ন্যায্য বিচার করবেন।'

আবদুল বিস্মিত কণ্ঠে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'রেসিডেণ্ট বাহাদুরকে চেনেন আপনি?'

জহমত আলি খাঁ মৃদু হাসল। বলল, 'চেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? কাল রাত দশটার সময় সাহেবের সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবো। সকালেই এখান থেকে আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়। দিনভর ওয়ালিজু নাপিতের ওখানে থাকব, রাতে একসঙ্গে যাব, বুঝলে!'

* * *

স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড প্রধান জায়গীরের রেসিডেণ্ট। শ্রীনগরে যিনি রেসিডেণ্ট রয়েছেন, তাঁর পদ টমাসের চেয়ে অনেক উঁচু, কিন্তু স্যর টমাস হাস্‌ব্যাণ্ড অনেক ভাবনা-চিন্তার পর প্রধান জায়গীরের রেসিডেণ্টের পদটাই বেছে নিয়েছিলেন, কারণ প্রধান জায়গীরের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন। এই প্রধান জায়গীর থেকে বহুসংখ্যক লোক ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। প্রধান জায়গীরের এক চন্দরী তহশিল থেকেই ষাট হাজার লোক সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে যে-কোনো জায়গায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। তাছাড়া প্রধান জায়গীরের সীমা পাঞ্জাব পর্যন্ত। এইসব নানা ব্যাপার

ভেবেচিন্তে স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড, একজন সিনিয়র অফিসার হওয়া সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যের এক জুনিয়র অংশই বেছে নিয়েছেন।

স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড ইয়ং (তরুণ) তো নন-ই, হাস্‌ব্যাণ্ড-ও (পতিও) নন। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সের একজন বিপত্নীক ইংরেজ। বেয়ারার স্ত্রীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রয়েছে। তার ছেলেমেয়েদের চোখ স্যর টমাসের ছেলেমেয়েদের মতোই নীল, তাদের গায়ের চামড়াও তেমনি ঝকঝকে মসৃণ, রঙ ধবধবে ফরসা। এই সম্পর্কের কথা বহুকাল আগে থেকেই বেয়ারার জানা। কিন্তু চাঁদির জুতো আর সাহেবের কৃপাদৃষ্টি তার মুখ বন্ধ করে রেখেছে —রেসিডেণ্ট বাহাদুরের বেয়ারার সম্মানজনক চাকরিতে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। সুযোগ পেলে রেসিডেণ্ট বাহাদুরের তা-বড় তা-বড় সাক্ষাৎপ্রার্থীকেও রীতিমতো ডেঁটে দেয় : 'সাহেবের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়' কিংবা 'সাহেবের সঙ্গে দেখা হতে পারে, তবে কাল আসতে হবে' কিংবা 'আচ্ছা, চেষ্টা করছি, তবে মনে হচ্ছে, বেকার!' ইত্যাদি। লোকে সামনে বেয়ারার তোষামোদ করে, পেছনে গালাগালি দেয়, 'শালা রেসিডেণ্টের বেয়ারা সেজেছে খুব! লম্বা-চওড়া তক্‌মা এঁটে বুক চিতিয়ে হাঁটছে, এ দিকে শালা নিজের বউকে বশে রাখতে পারে না।'

*　　　*　　　*

আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলের সমস্ত রাজা-রাজড়ার হালচাল স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ডের মালুম রয়েছে। তিনি আসামে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন ; নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তরাই অঞ্চলের জায়গীরেও থেকে এসেছেন, কাশ্মীরে। দীর্ঘ পর্যটন সেরে এখন তিনি এখানে এই প্রধান জায়গীরের শহরে বসবাস করছেন।

জনশ্রুতি, প্রথমে এই প্রধান জায়গীরে রেসিডেন্সীর কোনো শাখা ছিল না। কিন্তু শ্রীনগরের বড় রেসিডেণ্টের বলা-কওয়াতে মহারাজা প্রতাপসিংয়ের রাজ্য থেকে এই শাখা খোলা হয়। মহারাজাকে কাশ্মীরের অধিপতি হিসেবে মেনে নিয়েও তাঁকে অনেকগুলি শর্তে রাজি করানো হয়, তার মধ্যে একটি শর্ত ছিল, প্রধান জায়গীরে রেসিডেন্সীর শাখা স্থাপন করা হবে। আর যখন থেকে সেই শাখা স্থাপিত হয়েছে, তখন থেকেই শ্রীনগর ও প্রধান জায়গীরের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথমে প্রধান জায়গীরের মন্ত্রী আসতেন শ্রীনগর থেকে —তারপর পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিস থেকে আসতে শুরু করল। আর কেবল মন্ত্রীই নয়, আদালতের জজ, ডাক্তার, স্কুলের শিক্ষক, এমন কি ছোট ছোট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটও পাঞ্জাব থেকে আনা হতে লাগল। এখন তো নাম-কা-ওয়াস্তে শ্রীনগরের দরবারের একজন তৃতীয় শ্রেণীর উকিল শুধু অবশিষ্ট রয়েছে, সে প্রধান জায়গীরের জমজমাট দরবারে তামাশা ওড়ায় আর ডোগরি ভাষায় নোংরা গালাগালি ঝাড়ে।

স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড ইংরেজ হলেও প্রধান জায়গীরের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে থাকেন। শ্রীনগরের রেসিডেণ্ট রোজই শ্রীনগরের দরবারে সুপারিশ করেন আর এ দিকে স্যর টমাস প্রধান জায়গীরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা করেন। কেন জানিনে, প্রতিবারই কি করে যে শ্রীনগর দরবারকে হেরে যেতে হয় আর প্রধান জায়গীরের বড় রাজাসাহেবের অভিপ্রায় ঠিক কার্যকর হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে, যেমন কাশ্মীরের ডাক-ব্যবস্থা তুলে দিয়ে পাঞ্জাবের পোস্টাল সার্ভিস চালু হয়ে গেলো, কাশ্মীরী শিক্ষাক্রম রদ করে দিয়ে পাঞ্জাবী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হলো, কিংবা সোজা লণ্ডন থেকে এক বার্তা আসে যে, রাজাসাহেবের সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতায় খুশী হয়ে বাকিংহাম রাজ্য একুশবার কামান দেগে সম্মান প্রদর্শন করেছে। তা বলতে গেলে রোজই প্রায় অনেকগুলি করে কামান দাগা হচ্ছে শ্রীনগরের ওপর। তাতে শ্রীনগর দরবারে ভীষণ কানাকানি হয়, লম্পঝম্প হয়, কিন্তু ব্রিটিশ-রাজের সঙ্গে লড়াই করার স্পর্ধা আছে কোনো সামন্ত রাজার! অপমান হজম করে চুপ করে যায়। এ দিকে প্রধান জায়গীরের বড় রাজাসাহেব, যাঁর অন্তঃপুরে সাত রাণী আর দুশো বাঁদী, রাজপুতী গোঁফে তা দিয়ে বলেন, 'যাইহোক, একুশ তোপের স্যালুট তো পেয়েছি। বড় মহারাজার দরবারের লোকেরা জ্বলেপুড়ে মরুক! দুশমনরা জ্বলে মরুক! আমাদের রেসিডেণ্ট খুব ভালো —তাই না মন্ত্রীমশাই?'

মন্ত্রী মাথা হেঁট করে বলেন, 'যথার্থ বলেছেন মহারাজ!'

'তাহলে আমাদের রেসিডেণ্ট সাহেবকে কি ইনাম দেওয়া যায়?'

একটি মূল্যবান স্যুট, দুশো স্বর্ণমুদ্রা, তিনটি বাঁদী আর একখানা তলোয়ার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু স্যর টমাস প্রায়ই বাঁদী গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন আর বড় রাজাসাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেন, 'এরই মধ্যে না-মর্দ হয়ে পড়লেন রেসিডেণ্ট! আমাকে দেখুন, আমার সাত রাণী দুশো বাঁদী তো রয়েছেই, আরও সাত রাণী দুশো বাঁদী রাখতে পারি এখনো। আপনি কি আর করতে পারেন! ব্যস, কেবল ঐ পলন্দরী বেয়ারার বউয়ের আঁচলে ঝাঁপানো!' এই রকম নোংরা কথাবার্তায় দরবারে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ডের মতো সুশিক্ষিত ইংরেজও হলদে হলদে নোংরা দাঁত বের করে হাসেন, যদিও ভেতরে ভেতরে তাঁর ইচ্ছে করে, এই শালা ইণ্ডিয়ানটাকে গুলি করে দিই, কিন্তু বাইরে তাঁকে হাসতেই হয়। আসাম থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপজ্জনক সীমান্ত এলাকার সামন্ত রাজাদের সামনে সর্বদা স্মিতমুখে থাকতে হয়, কারণ সাম্রাজ্যের সীমান্ত সুদৃঢ় রাখা খুব সহজ কাজ নয়। কেবল বন্দুক দিয়ে সে কাজ করা অসম্ভব, এখানে 'যেমন দেশ তেমনি বেশ' কথাটার দিকে লক্ষ্য রেখেই কার্যোদ্ধার সম্ভব, নইলে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র সীমান্ত এলাকাটাই শত্রুর কব্জায় চলে যেতে পারে। এ কারণেই তো ইংরেজ আসাম

থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ স্মিতহাস্য বিছিয়ে রেখেছে। ওপরে স্মিতহাস্য, নিচে বারুদ।

স্যর টমাস নিজের কাজে খুব হুঁশিয়ার। প্রধান জায়গীরের প্রতিটি আনাচ-কানাচও তাঁর নখদর্পণে। এটা তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব যে, তিনি যখন যেখানে থাকেন, সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, যা দেখে স্থানীয় লোকেরাও নিজেদের অজ্ঞানতায় বিস্মিত হয়। তিনি জানেন, প্রধান জায়গীরের রাজাসাহেব শানসিং ওপরে ওপরে তাঁর বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। তার কারণও আছে। রাজা শানসিংয়ের বাবা আনসিং এই জায়গীর এবং তার সমস্ত অঞ্চল মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। এক সময় এমনও হয়েছিল যে, স্বয়ং রাজা শানসিংকে এই অঞ্চলের মুসলমানদের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সে সময় তিনি মুসলমানদের এক-একটি মাথার দাম ধার্য করেছিলেন সাত টাকা। বলেছিলেন, যে সেপাই একজন মুসলমানের মাথা কেটে আনতে পারবে, সে নগদ সাত টাকা পাবে। এভাবেই তিনি লছমনৃতেন থেকে শুরু করে কোহালে পর্যন্ত সেই বিদ্রোহের আগুন দমন করেছিলেন। সে জন্যেই তিনি এ রাজ্যে তাঁর বংশের কোনো ব্যক্তি ছাড়া কোনো ইংরেজের অধিকার আছে বলে মনে করেন না। কিন্তু কি আর করা যায়! তিনি জানেন যে, তাঁর চেয়েও বড় এক ডাকাত সাদা চামড়া গায়ে দিয়ে দরবারে বসে আছেন, যাঁর রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হয় না, যাঁর সামনে রাজা শানসিং একটা 'কাজ-করা কালো ছোঁড়া' ব্যতীত আর কিছু নয়, একটু মুখ বেঁকালেই স্যর টমাসের হাসিটা বদলে যেতে পারে —হাসির পেছনে সারা সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে যে অসংখ্য সুড়ঙ্গ রয়েছে সলতে আর ডিনামাইটে পূর্ণ, সে সব রহস্য মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই রাজা শানসিং, তস্য পিতা আনসিং, তস্য পিতা রাজা বলবানসিং, তস্য পিতা রাজা ভগবানসিং, তস্য পিতা ···চার হাজার বছর —স্যর টমাস ইয়ং হাস্ব্যাণ্ড, তস্য পিতা ফ্রান্সিস ইয়ং হাস্ব্যাণ্ড, তস্য পিতা উইলিয়ম ইয়ং হাস্ব্যাণ্ড, তস্য পিতা না-জানি কার সামনে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন। চার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় জাগীরদারের বংশাবলীকে তিনশো বছরের প্রাচীন ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের সামনে মাথা নত করতে হয়েছে, যদিও তাঁরা জানতেন না, কি এমন সেই শক্তি যা তাঁদের মাথা নত করতে বাধ্য করছে। রাজা শানসিং শুধু এটুকুই জানেন যে, স্যর টমাস পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক বিপত্নীক ইংরেজ যাঁর হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে ভীষণ ক্ষমতা, যাঁর হলদে দাঁতগুলি ভীষণ কুৎসিত এবং জায়গীরের মধ্যে উৎসারিত প্রতিটি ঝরণা যাঁর নখদর্পণে, হয়ত আজ পর্যন্ত রাজা শানসিংও যা দেখেননি। সে জন্যেই তিনি স্যর টমাসের বন্ধু। স্যর টমাস যখন রাজা শানসিংয়ের দরিয়া মহলে তাঁকে দেখা করতে আসেন, তখন বড় হৃদ্যতায় দু'জনে পুরনো বন্ধুর মতো পরস্পরের সঙ্গে মোলাকাত করেন। রাজা

শানসিং একদিকের সোনালী কার্নিসে রাখা স্যর টমাসের ছবি দেখিয়ে বলেন, 'পৃথিবীতে আমার একান্ত বন্ধু বলে যদি কেউ থাকে, তবে এই ছবিটি।'

প্রথমবার স্যর টমাস যখন রাজা শানসিংয়ের প্রাসাদে নিজের ছবি দেখেন, এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের মর্যাদা ও গর্বে গর্বিত রাজপুতের মুখে নিজের প্রশংসা শোনেন, তখন খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি সেখান থেকে চলে এলেই রাজা শানসিং একজন ভৃত্যকে ডেকে ছবিটা তাঁর জুতো রাখার ঘরে পাঠিয়ে দেন। তারপর থেকে এই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, স্যর টমাস এলে রাজা শানসিং খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কার্নিসে রাখা স্যর টমাসের ছবি দেখান, কিন্তু তাতে স্যর টমাস আর আদৌ পুলকিত হন না, দুঃখিতও হন না, কারণ এখন তিনিও তাঁর রেসিডেন্সির একটি কার্নিসে রাজা শানসিংয়ের ছবি রাখেন, আর রাজাসাহেব চলে গেলে একই পদ্ধতিতে সেটা বিলিতী জুতোর র‍্যাকে চলে যায়। খবরটা এখন রাজা শানসিংয়েরও অবিদিত নেই। কিন্তু দুই বন্ধু সেইভাবেই বড় হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করেন। ওপরে ভালোবাসা, অন্তরে জুতো চালাচালি। কিন্তু পরস্পরের প্রয়োজন রয়েছে দু'জনেরই, তাই পারিবারিক নিয়মের মতো ব্যাপারটাকে দু'জনেই মেনে নিয়েছেন, জুতোর কথা কেউ কখনও মুখে আনেন না, যদিও দু'জনে বেশ ভালোভাবেই জানেন সেটা।

রাতের খাবার খেয়ে স্যর টমাস তাঁর রেসিডেন্সির চমৎকার বাগানে আরাম করছিলেন। বাগানের একপাশে আরাম চেয়ার, তাতে শুয়ে শুয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন তিনি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, চারিদিক আলো হয়ে আছে। রাস্তার খোয়ার ধারে ধারে ফরাসী আঙ্গুরের লতা, কালচে লাল আঙ্গুরগুলো থেকে ভেসে আসছে ফরাসী মদের সৌরভ। স্যর টমাস চোখ বন্ধ করে নৈশ ভোজসভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের কথা ভাবতে শুরু করলেন। রাজা শানসিং! ধ্যাস, ওঁর সম্বন্ধে চিন্তা করা অর্থহীন। চিতাবাঘটা একেবারে বুড়িয়ে গেছে। রাজকুমার সংগ্রামসিং, তার শখ মেয়েমানুষে আর শিকারে—বাবার চেয়ে কম বিপজ্জনক বলেই মনে হয়। বুড়ো চিতাবাঘটা কিন্তু এখনও চিতাবাঘ। বৃদ্ধ কর্নেল ডক এসেছেন শ্রীনগর রেসিডেন্সি থেকে, একটা জরুরি বার্তা নিয়ে। ডকের মেয়ে মলী ···মলীর মা ইটালিয়ান ছিল তো, তাই মেয়েটা অত সুন্দরী। কোনো ইটালিয়ান চিত্রকরের অতুলনীয় চিত্র বলে মনে হয়। রাজকুমার খেতে খেতে শুধু মলীর সঙ্গেই কথা বলছিল। নেটিভ মন্ত্রী জ্ঞানসিং, বৃদ্ধ শিখ সরদার—তাঁর পরিবারবর্গ সেই গদরের সময় থেকেই ইংরেজদের প্রতি বিশ্বস্ত। কিন্তু নেটিভের বিশ্বস্ততাটা কি আর বিশ্বস্ততা! কত বছর কেটে গেছে ইংরেজের সলতে লাগানোতে, বারুদ ছড়াতে, সুড়ঙ্গগুলিকে গোপন করে রাখতে। শাসনকার্য চালানো সোজা নয়! দেড়শো দুশো বছর কেটে গেছে, আরও হয়ত দেড়-শো দুশো বছর এ সাম্রাজ্য টিঁকে থাকবে, তার বেশী সম্ভব নয়। যার কাজ

মাটিতে বারুদ ছড়ানো, সে জানে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোথায় লাভা টগবগ করে ফুটছে, কোথায় উষ্ণ প্রস্রবণ নিঃসৃত হচ্ছে। খুব কঠিন কাজ —স্যর টমাস মনে মনে ভাবেন। আঙুরের গন্ধের সঙ্গে গোলাপের গন্ধ তাঁর নাকে ভেসে আসছিল। দূরে কোথায় বুলবুল ডাকছে, যেন জ্যোৎস্না গলা ছেড়ে ডাকছে, সে আওয়াজ চারপাশে তরলাকারে ছড়িয়ে পড়ছে মনে হয়। মলীর গলায় সোনার হারখানা কত সুন্দর দেখায়! ইতালীয় রক্ত যে! তাঁর দেশে ইংরেজ মহিলাদের অমন গ্রীবা, অমন বুক কোথায়! নিজের মেমসাহেবটিকে তো একেবারে জবাই করা ছাগল বলে মনে হতো। তাঁর কুৎসিত মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে স্যর টমাসের। ল্যাঙ্কাশায়ারের এক কসাইয়ের মেয়ে, বেজায় গরিব ···মলী···মলী···সে ঐ নেটিভের বাচ্চা রাজকুমারটার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে কি করে! ডককে সাবধান করে দেওয়া উচিত! কিন্তু ডক কি বুদ্ধু! তাঁর তো জানা উচিত ছিল। হয়ত জানেনও ব্যাপারটা —তাহলে তিনি মলীকে এ রকম একটা ডাটি জায়গায় নিয়ে এলেন কেন? কি উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন? যে বার্তাটি এনে তাঁকে দিয়েছেন, সেটি ছাড়াও কি অন্য কোনো বার্তা বয়ে এনেছেন? কোনো গুপ্তচরবৃত্তির কাজ কি? কিন্তু সেটা ভারি কদর্য ব্যাপার! যদি সে রকম কিছু হয়, তাহলে আমি ইস্তফা দিয়ে দেবো —স্যর টমাস মনে মনে বললেন। ঝামেলা কি করে সামলাতে হয়, সে সম্বন্ধে ডকের তো কোনো জ্ঞানগম্যিই নেই। ভুটানে তিনি তো সব মাটি করে ফেলেছিলেন, যদি যথাসময়ে স্যর টমাস না পৌছাতেন —ওহ্ গড! ···তিনি চোখ খুলে তাকালেন —হেড বেয়ারা সামনে দাঁড়িয়ে।

'কি খবর গুলাম?' স্যর টমাস পাহাড়ী ভাষায় গুলামকে জিজ্ঞেস করলেন। বিশ-পঁচিশটি ভাষায় তিনি বেশ রপ্ত, আবার সময় মতো নীরবতার ভাষাও ব্যবহার করতে পারেন যা অনেকেই জানে না।

বেয়ারা বলল, 'জহমত আলি খাঁ এসেছে —সঙ্গে একটি যুবককে নিয়ে এসেছে —নাম আবদুল।'

'আসতে দাও।'

হেড বেয়ারা চলে গেলো। তিনি তাকে বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলেন। বাগানটা বেশ খোলামেলা, চমৎকার মদ, বুলবুল ডাকছে। স্যর টমাস আবার চোখ বন্ধ করলেন। মলী তার চিত্তচাঞ্চল্যকারী রূপ নিয়ে আবার তাঁর চোখের সামনে এসে হাজির হলো —একটি দুলতে-থাকা সোনালী নৌকোর মতো তাঁর মস্তিষ্কের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচতে লাগল যেন। কে জানে কি ব্যাপার, যতই তিনি দিনদিন বুড়ো হচ্ছেন, ততই নিজের চেয়ে কম বয়সের মেয়ে নিয়ে দারুণ চিন্তা-ভাবনা করে চলেছেন। ব্যাপারটা খুব মারাত্মক —স্যর টমাস মনে মনে ভাবলেন। দেখছি, পেন্‌শন পাওয়ার পর আমায় আঠারো বছরের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। ঠিক আছে, পেন্‌শন-প্রাপ্ত বহু ইংরেজই তো সেটা করে থাকে,

তাতে আর দোষ কি ! সত্তর বছর অতিক্রম করেই মানুষ সাধারণত মেয়েদের মতিগতি বুঝতে পারার মতো যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু তাহলে এই বেয়ারার বউটার কি দশা হবে ! এইসব ছেলেপিলের —গুড্ গড, কাজটা দারুণ ভুল হয়েছে। আচ্ছা দেখা যাবে ···এখন তো··· মৃদু মৃদু পদশব্দ কানে এল। স্যর টমাস চোখ মেলে তাকালেন। হেড বেয়ারা জহমত ও আবদুলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। ···বেয়ারাটা কত বিশ্বাসী ! সাহেবের বিশ্বাসের ওপর নিজের বউকেও ছেড়ে দিয়েছে। নেটিভরা খুব ইমানদার হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, ইজ্জতের তো প্রশ্নই নেই। ঠিক কুকুরের মতো বন্ধু হয়ে ওঠে, চুপচাপ লেজ নাড়তে থাকে, কখনও কোনো অভিযোগের একটি শব্দও মুখ দিয়ে বার করে না। এইসব মানুষদের নিয়েই তো আমাদের সাম্রাজ্য টিঁকে আছে, নইলে এতদিন কোথায় ভেসে যেত সব।

স্যর টমাস হাসলেন। কিন্তু জহমত আলি খাঁ সে রকম নয়। ওপরে তোষামোদ, ভেতরে বিষ। বেজায় শয়তান, তেমনি বিপজ্জনকও। কিন্তু লোকটা কাজের, আগুন লাগাতে ওস্তাদ। দাম্ভিক, মিথ্যেবাদী, বেইমান, দেশভক্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্যে দেশকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে চিবিয়ে খাবে ! জহমত আলি খাঁ, আমি তোকে ভালো করেই চিনি —তোর আর আমার মধ্যে দোস্তি অনেক দূর গড়াবে !

কিন্তু ঐ যুবকটি কে —হ্যাঁ —আবদুল ! আবদুলকে দেখে স্যর টমাস চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। যে কথাটা কানে এসেছিল —উত্তর অঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহ। রজ্জি, ফজল, রাজা করম আলি ···এক-একটি দৃশ্য স্যর টমাসের চোখের সামনে ভেসে গেলো, কিন্তু আবদুলের চেহারাটা একটু অদ্ভুত ধরনের। এক সাদাসিধে ইমানদারি ও সততা তার চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে। আবদুলের চেহারাটা স্যর টমাসের পছন্দ হলো না। এ ধরনের লোক পৃথিবীতে কেন জন্মায় ! রাজনীতিতে এ সব লোকের কাজ কি ! কিন্তু এখনও বয়সে তরুণ, হয়ত আস্তে আস্তে পেকে যাবে। কিংবা চেহারায় এমনি সাদাসিধে ইমানদারি ও দেশভক্তি, ভেতরে শিরায় শিরায় বিশ্বাসঘাতকতা। এ ধরনের লোকও হয়, তবে কদাচিৎ চোখে পড়ে, অনেক মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া যায়, আর পাওয়া গেলে মন্ত্রীর পদের নিচে কথা বলে না। আবদুলের চেহারা লক্ষ্য করতে করতে স্যর টমাস ভাবেন —ওকে এখন কিছু বলা উচিত নয়। কোনো গোপন কথা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব ওকে দেওয়া যায় না, তাতে জহমত আলি খাঁ কিছু বলুক আর না বলুক।

আবদুল, জহমত আলি খাঁ ও বেয়ারা সাহেবকে অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোতে দেখল। ওরা সেলাম জানিয়ে তাঁর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। স্যর টমাস আরাম চেয়ারে শুয়ে শুয়ে আধ-বোঁজা চোখে ওদের চেয়ে চেয়ে দেখছেন। ওদের

সেলামের জবাব দিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন আবদুলের মনে হলো যে, সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঠিক তখনই স্যর টমাস হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বসো!' কথাটা শুনেই আবদুল চমকে উঠল।

আবদুল ও জহমত আলি খাঁ সাহেবের পায়ের কাছে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। হেড বেয়ারা চলে গেলো।

* * *

জহমত খুশীতে দু'হাত জোড় করে বেশ জোরে ঘষলো, তারপর হাতে ফুঁ দিতে দিতে' বলল, 'সাহেব, তহশিল দাগেও মৌলভীরা রাজাসাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে।

সাহেব কিছু বললেন না।

জহমত বলে যেতে লাগল, 'কনেতর গাঁয়ের নম্বরদারও এখন আমাদের পক্ষে। তহশিল মান্দরেও কাজ শুরু হয়ে গেছে।'

সাহেব আবদুলকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

জহমত একটু থেমে বলল, 'সাহেব, একে নিজের লোক বলেই মনে করবেন, এর নাম আবদুল।'

আবদুলও সাহেবকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবা কৃষক-বিদ্রোহে মারা গেছে?'

আবদুল বলল, 'না হুজুর, তিনি কোনো বিদ্রোহ করেননি।'

জহমত বলল, 'রজ্জি ওর বোন।'

'রজ্জি কোথায়?' সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'জানিনে।' আবদুল জবাব দিলো।

জহমত বলল, 'আর এখন শুনছি, ওকে না-কি স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। দশ ক্লাসের পরীক্ষাতেও না-কি ওকে বসতে দেওয়া হবে না। পরশু হাইস্কুলের ছেলেরা রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছে, পরীক্ষা দিতে! সাহেব, এই গরিব বেচারার জন্যে একটা কিছু করুন।'

সাহেব বললেন, 'ভেব না আবদুল। পরশু ছেলেদের সঙ্গে তুমি পরীক্ষা দিতে যাবে।'

আবদুলের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কৃতজ্ঞ চোখে স্যর টমাসের দিকে তাকাল সে।

'বাকী রইল তোমার চাকরি' —সাহেব নিজের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললেন, 'এখনই তোমায় চাকরিতে বহাল রাখাটা হয়ত সম্ভব নয়, তবে একেবারে বের করে দেওয়াও হবে না, বড় জোর কিছুদিনের মতো সাসপেণ্ড করা হতে পারে —পরে দেখব।'

কথাটা বলেই স্যর টমাস খুব আদরের ভঙ্গিতে আবদুলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবদুল দু'হাতে তাঁর হাত চেপে ধরল। বুকটা দারুণ টিপটিপ

করছিল। আজ পর্যন্ত সে কোনো ইংরেজের সঙ্গে দেখা করেনি। এই প্রথম সাক্ষাতেই সে ইংরেজের দয়ায় মুগ্ধ হলো, চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তার।

স্যর টমাস বললেন, 'রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরে এসে অবশ্যই দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

জহমত বলল, 'বেচারা গরিব মুসলমান ছেলে—হে আল্লা! মুসলমানের দিন কবে ফিরবে…'

স্যর টমাস বললেন, 'ভেব না, তোমাদের দিনও ফিরে আসবে। সরকার খুব মন দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি লক্ষ্য করছেন।'

'আমি পাঞ্জাবের কয়েকটি কাগজেও এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করেছি' —জহমত সামান্য লেখাপড়া জানা লোক, তাই কথাবার্তায় কঠিন কঠিন শব্দ ও বিশেষ বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করার দিকে ঝোঁক তার। স্যর টমাস তার এই দুর্বলতার কথাটা জানেন, এবং তাই নিয়ে বেশ মজা উপভোগ করেন। এ সময়েও তাঁর চোখে-মুখে কৌতুক খেলে গেলো, তিনি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নিয়ে 'পর্যালোচনা' করেছ? আচ্ছা আচ্ছা, আবদুল, তুমি এস। জহমত, তুমি বসো এখন।'

*   *   *

আবদুল সেলাম জানিয়ে চলে গেলে স্যর টমাস জহমতকে তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি খুব অসাবধান হয়ে কাজ করো। আবদুলকে যত ভালোমানুষ বলেই মনে হোক, কারোর সামনে এ রকম কথা বলা তোমার উচিত নয়। আমি তোমাদের মুসলমানদের সাহায্য করছি, তার মানে এই নয় যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের অসন্তুষ্ট করে তুলব, তাদের মনে কোনো সন্দেহ জাগতে দেবো। সে রকম সন্দেহ জাগলে সেটা তোমার পক্ষে বিশেষ লাভজনক হবে না, তোমাদের গোটা সম্প্রদায়েরই ক্ষতি হবে তাতে। আমার কি! এতে আমার তো কোনো লাভ নেই—আমার কাজেও কোনো উপকারে আসবে না—আমি শুধু তোমাদের ভালোর জন্যেই এ সব করছি।'

জহমত কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল, তারপর সাহেবের চেয়ারের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'হুজুর, এ সব কি শুনছি! ইংরেজ সরকার না-কি বড় মহারাজের কাছ থেকে গিল্‌গিট এলাকাটা চেয়েছে!'

স্যর টমাস বললেন, 'সামরিক ব্যাপারে গিল্‌গিট আগে থেকেই ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বে রয়েছে। কেবল ডোগরা সরকারের মন্ত্রী ওখানে সিভিল, বেসামরিক আর পৌরশাসন ব্যবস্থার জন্যে রয়েছে। আমি তো এ খবরটা শুনিনি। তবে হতে পারে, সরকার হয়ত ভেবেছেন যে, এক এলাকায় দুটি সরকার থাকলে কি করে ভালোভাবে কাজ করবে, তাই সম্ভবত ওঁরা ঠিক করেছেন যে এলাকার পুরো কর্তৃত্বটা ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হোক, যাতে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।'

জহমত মাথা নেড়ে বলল, 'তাতে কি সন্দেহ আছে। যদি সামরিক ও বেসামরিক দু'রকম কর্তৃত্বই বড় মহারাজের হাতে কিংবা ইংরেজ সরকারের হাতে থাকে, তাহলে নয়ম্ ও নস্‌ক্-এর (রাজনীতির) চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো যেতে পারে।'

'এই 'নয়ম্ ও নস্‌ক্' কথাটার মানে কি?'

হাসতে হাসতে জহমত বলল, 'যাকগে, ছেড়ে দিন। আপনিও বোঝেন, আমিও আপনাকে বুঝি। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, আমি মনে করি, আমাদের এলাকা বিদ্রোহের জন্যে তৈরী, আপনি সেটা মনে করেন না, তাই আমি নাচার। নইলে কালকেই তক্ত উল্‌টে দিতে পারি।'

ধীরে ধীরে স্যর টমাসের চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'এখন না জহমত! এখনও সময় হয়নি।'

* * *

অন্য কোথায় বুলবুল ডাকছে। শূন্যে গিল্‌গিটের মানচিত্র উড়ছে পৎপত করে। মলীর গলায় সোনার কণ্ঠহার। বেয়ারার ছেলেপিলের চোখের রঙ নীল। অনেক ব্যাপার যেন একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেলো। হাসি এবং ডিনামাইট! জুতো এবং ছবি! জায়গীরদারি ও পুঁজিবাদ। মাঝখানে আবদুলের চেহারা স্যর টমাসকে অস্থির করে তুলল। কখনো কখনো সমস্যা আপনা থেকে বিশ্লেষিত হয় না, তাকে বিশ্লেষণ করে নিতে হয়, এবং যতই তা বিশ্লেষিত হয়, ততই যেন নাগালের বাইরে চলে যায়। আবদুলের চেহারা স্যর টমাসের যৌবনের ছবি। এখন মনে পড়ছে, কেন ঐ চেহারা দেখে তিনি অমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ঐ রকমই বয়স ছিল তাঁর, এবং জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে বুঝতেন অকৃত্রিম সততা ও ইমানদারি, যা আবদুলের চোখে-মুখে ঝিলিক দিচ্ছে, এক সময় তাঁরও চোখে-মুখে তার অভাব ছিল না। আজ সে কথা তাঁর মানসপটে উঁকি দিচ্ছে আর থেকে থেকে অস্থির করে তুলছে তাঁকে, যেমন হাল্‌কা উদাস লয়ে পিয়ানোর একটি মিষ্টি-মধুর দীর্ঘ সুর এসে মনটাকে আনচান করে তোলে। সেই পিয়ানোর চাবি কোথায়? সারা জীবন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরনো পিয়ানোতে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে কাটিয়ে দিলেন। আজ তাঁর আঙুলগুলো বুড়িয়ে গেছে, রক্ত ঝরছে আঙুলগুলো থেকে, কিন্তু সেই পিয়ানোর চাবি কোথায়, এখনও তার সন্ধান করতে পারলেন না। সুরগুলি পৃথক পৃথক, পরস্পরের বিপরীত—জ্ঞানসিং, জহমত, আবদুল! গিল্‌গিট—সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ব! মলী আর রাজকুমার সংগ্রামসিং! বড় এলোমেলো সুর। তিনি কোনো-না-কোনোভাবে ঠেকা দিয়ে এসেছেন তাতে—আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। কিন্তু আজ পর্যন্ত হিমালয়ের তাল লয় সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর চক্ষুপল্লবের নিচে হিমালয়ের পুষ্পাচ্ছাদিত উপত্যকা-সমূহ তার তুষারাচ্ছন্ন গিরিচূড়াগুলি এক মহান্ পিয়ানোর

সুরধ্বনির মতো উন্মোচিত হয় আর তাদের অবিনশ্বর অবিলীয়মান সঙ্গীত তাঁর কানের পর্দা ভেদ করে মস্তিষ্কের গম্বুজে পেটাঘড়ির মতো অনর্গল ঘোষণা করতে থাকে ···ঠন ···ঠন ···ঠন —আমরা অবিনশ্বর —ঠন ···ঠন ···ঠন —আমরা অবিলীয়মান ···ঠন ···ঠন ···ঠন —তুমি কখনও আমাদের পরাভূত করতে পারবে না ···কখনও না —যে সেই পিয়ানোর চাবির সন্ধান জানে, একমাত্র সেই পারে আমাদের পরাভূত করতে! কিন্তু চাবি কোথায়? চাবি কোথায়? হিমালয়ের লক্ষ লক্ষ সুর পাক দিতে দিতে লাফাতে লাফাতে তাঁর মস্তিষ্কের পর্দায় এসে আঘাত করে, হাসতে হাসতে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকে, আর তিনি রাগে-ক্ষোভে অস্থির হয়ে সজোরে হাতের মুঠি পাকিয়ে চড়া মেজাজে বলে ওঠেন, 'নো নো ···সেটা হতে পারে না ···চাবি পাওয়া যাবে ···অবশ্যই চাবি পাওয়া যাবে!'

জহমত চমকে উঠে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের হুজুর?'

স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড, পঁচিশটি ভাষায় পণ্ডিত, তিরিশজন সামন্ত রাজার রেসিডেণ্ট, পঞ্চাশ বছরের ঝানু ইংরেজ চোখ মেলে তাকান, খানিকটা অসহায়ভাবে কোমলকণ্ঠে বলেন, 'কিছু না জহমত ···কিছু না ···আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

সাত

সন্ধ্যা হয়ে এলে বানো দেখল, নিচের উপত্যকা থেকে ধোঁয়া পাক দিতে দিতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সারা দিনের ক্লান্তির পর পাখি তার সোনালী ডানা মেলে দিয়ে বনের দিকে উড়ে আসছে বিশ্রামের জন্যে। আকাশের মতো নীল ইঞ্জ ফুলগুলি সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে, সবুজ পাতার মধ্যে তাদের কমনীয় মুখ লুকোচ্ছে। একটা আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে বানোর শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে গেলো, সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেলো, আগের চেয়েও বেশী অবসাদ, অস্থিরতা ও বিমর্ষতা ছড়িয়ে পড়ল। বানো বুঝতে পারে না —তার কি হয়েছে, কেন ঐ নদীর উপরিভাগে সাদা ও সোনালী তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ দেখে তার মনটা বারবার আনচান করে ওঠে!

বানোর জীবনে ভালোবাসা এসেছে আচমকা। অরণ্যে শিকারীরা সতর্ক পায়ে হাঁটে, সে রকম পা টিপে-টিপে সে ভালোবাসা তার হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে এমনভাবে ঢুকে পড়েছে যে চমকে উঠতে হয়েছে বানোকে। সে ভেবেই পায় না কি করবে, কোথায় যাবে! রাতের অন্ধকারে যে উদ্গত অশ্রু তার দুই গণ্ডদেশ সিক্ত করে তোলে, সে অশ্রুর কথা কাকে বলবে সে! ভালোবাসায় কি এমনই মিষ্টি-মধুর দুঃখ জড়িয়ে থাকে! এমনি সারা মন উথাল-পাথাল করে দেওয়া আনন্দ থাকে, যা সে এই মুহূর্তে বোধ করছে!

আবদুলের মনের মধ্যেও কি কেউ বসে বসে ভিজে কাপড় নিঙড়ানোর মতো করে মোচড় দিচ্ছে? ভারি অদ্ভুত অনুভূতি! তার মনে হয়, আবদুল তাকে যতই ভালোবাসুক না কেন, তার মনে ভালোবাসার যে উষ্ণতা, কোমলতা ও যন্ত্রণার অনুভূতি জেগে উঠছে, আবদুলের মনে তা জাগতে পারে না। কারণ নারী বীজকে আশ্রয় দেয়, তাকে কোমলতা, আর্দ্রতা ও রক্ত সরবরাহ করে, তার নতুন কচি শেকড়গুলিকে নিজের মধ্যে ছড়িয়ে নেয়, দিনরাত শক্ত করে তোলে সেগুলিকে, সে জন্যে সে নিজেকে এমন কোমল করে তোলে যাতে সেই শেকড়গুলি তার ভেতরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে, ছোট্ট শিশু অন্ধকারে যেমন করে তার মা-র বুক হাতড়ায়। বানোর হৃদয়ে ভালোবাসার এমন এক বিচিত্র অনুভূতি, যার ওপরে আকাঙ্ক্ষার আবরণ, কিন্তু ভেতরে সৃষ্টির বাসনা। এমন পূর্ণ গভীর অনুভূতি যা শুধু ধরিত্রীর বুক আর নারীর হৃদয়ই উপলব্ধি করতে পারে, যে বীজকে আশ্রয় দেয়, তাকে উষ্ণতা দান করে, তার শেকড়গুলোকে এমন শক্ত করে তোলে যাতে তার কোমল অঙ্কুর ধরিত্রীর বুক চিরে একদিন বাইরে বেরিয়ে আসে, তার নবীন সবুজ পাতাগুলি ঝলমলে সূর্যকিরণ দেখে আনন্দে ডগ্‌মগ করতে থাকে। আবদুল কি এ রকম কিছু অনুভব করতে পারে—সে আজও এল না কেন? কেন সে তার হৃদয়ে এক কম্পমান দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেলো—আজও এল না কেন সে? বীজ কেন ধরিত্রীর অতল গভীর অস্থিরতার কথা বোঝে না? বানোর কাছে প্রশ্নটি এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি—ভীষণ অস্পষ্ট, ঝাপসা-ঝাপসা। শিশু যেমন জলভরা চোখে কোনো চমৎকার দৃশ্য দেখে, ঠিক তেমনি। বানো বুঝতে পারে না তার কি হয়েছে! কখনো সে খুব খুশী হয়ে ওঠে, কখনো একেবারে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এক আশ্চর্য বস্তু হয়ে উঠেছে সে—কখনো চঞ্চল, কখনো দারুণ ভাবুক, কখনো শান্ত, কখনো আগুনের মতো দাউদাউ করে ওঠে, কখনো নদীর বুকে দুলতে থাকা নৌকো, কখনো গভীর রহস্যপূর্ণ নীল আকাশ, কখনো বা পৃথিবীর মতো সন্ত্রস্ত, পরিশ্রান্ত! কখনো সে বন্য হরিণীর মতো লাফাতে লাফাতে অরণ্যের মধ্যে ছুটে যায়, নানা বিচিত্র রঙের ইন্দ্রধনু হয়ে ওঠে, যেমন মেঘের বর্ষণ ক্ষান্ত হলে দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আকাশে রঙের মনোরম জয়মাল্য খচিত হয়।

কাদর বউ তার মেয়ের হাবভাব আর ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ-ঢঙ পাল্টাতে দেখে চিন্তিত হয়। এক-আধটু সে বুঝতে পারে বৈ-কি! যেটুকু বুঝতে পারে, তাতেই প্রচণ্ড রেগে যায়। কিন্তু সে নিতান্ত অসহায়, ধরিত্রীর সামনে ক্রোধ সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই সে নিজেই নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, বানোকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

* * *

আধো ঘুম আধো জাগরণে রাত কাটে বানোর। আজকের রাতটাও সেই একই

রকম। কখনো সোহাগ করে চাপড় দিতে দিতে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, কখনো বা আচম্‌কা জাগিয়ে দেয়। এক সময় তার মনে হয় সে যেন তার মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, আবার পরক্ষণেই অচেনা কেউ যেন তার বুকে হাত রাখছে। হে আল্লা! বুকটা এত জোরে টিপটিপ করছে কেন ···তোমার জন্যে আবদুল! তুমি কোথায়, তুমি আসছ না কেন! ···দেখো, তুমি যখন আসবে, একটি কথাও বলব না তোমার সঙ্গে। আমি তোমার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করব। আমি তোমার কাছে নদী হব—শান্ত গভীর, ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়া নদী। আমি তোমার কাছে হাওয়ার পরশ হব—মৃদু, ঠাণ্ডা, কোমল। যখন সন্ধ্যা হবে, রাত্রি ক্রমশ গভীর হবে, যখন দেবদারু গাছগুলির মাঝখানে আমাদের ছোট্ট তাঁবু রূপোর মতো ঝক্‌ঝক করে উঠবে, তখন আমি তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্যে মাথার কালো চুল বিছিয়ে দেবো, কস্তুরির গন্ধে তোমার কোল ভরে দেবো, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে গন্ধ, নমনীয়তা, কোমলতা ও সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু থাকবে না। ও কে গাইছে, এমন দরদভরা সঙ্গীত ছড়িয়ে দিচ্ছে উপত্যকায়—

গড্ডী আঈ মাহী ওয়ালী,
ওয়ে টিকট ন দেঈ বাবু,
সাড়ী রাত জুদাঈ ওয়ালী!

হঠাৎ বানো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল, তার ফোঁপানি ক্রমশ বাড়তে লাগল। দুর্ভাবনায় ঘুম ভেঙে গেলো কাদর বট্টের। সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো মা?'

সে বানোর মাথায় অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে দেয়, বানোর ফোঁপানি আস্তে আস্তে কমে আসে। কাদর বট্ট আবার জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছিল মা? ভয় পেয়েছিলি?'

'না আব্বা।'

'তাহলে?'

বানো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'মা-র কথা মনে পড়ছে।'

কিন্তু তার এই জবাবে কাদর বট্ট সন্তুষ্ট হলো না। অনেকক্ষণ জেগে রইল সেও। বানো ঘুমিয়ে পড়লেও সে বহুক্ষণ জেগে থেকে বানোর মুখ-চোখ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকল।

আকাশে তারা জ্বলতে থাকে, আস্তে আস্তে তাদের দীপ্তি ফ্যাকাশে হয়, আকাশের রঙ নীলচে সাদা হয়ে আসে। তারপর সূর্যের এক ঝলক কিরণ এসে বানোর মুখ-চোখ ছুঁয়ে যায়, অমনি ধড়মড় করে উঠে বসে সে, যেন আবদুল তার ঠোঁটে চুমো খেয়েছে, কিন্তু কই, কেউ তো নেই সেখানে! বানো মুহূর্তের জন্যে বিমর্ষ হয়ে পড়ল, আর তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেলো সে।

ঢালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, গোলাকার কাঠের কুঁদোগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে, নদীর ওপরেও সেই হাল্‌কা হাল্‌কা ধোঁয়ার আস্তরণ। তার পায়ের কাছেই নীল ইণ্ড ফুল এমনভাবে ফুটে আছে, যেন কোনো শিশুর জলে ভব্‌ভব করা চোখ। ভোরের হাল্‌কা হাল্‌কা কুয়াশা সেই ফুলগুলির ওপরেও কাঁপছে। তার পায়েও জড়িয়ে আছে কুয়াশা। বানো চোখ তুলে দিগন্তের পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকাল, যার ওপাশে পাঞ্জাব, সেখানেও চাপ-চাপ কুয়াশা চোখে পড়ল তার। সে অনেকক্ষণ ধরে আরও দূরে লক্ষ্য করতে থাকল। কুয়াশা, স্বপ্ন, থর্‌থর করে কাঁপতে-থাকা ইণ্ড ফুল —সে আস্তে আস্তে হাত তুলে নিজের বুকে রাখল।

* * *

আবদুল তার খচ্চরটাকে দাঁড করিয়ে পেছনে তাকাল। সাবরের ঢালে খচ্চরের এক লম্বা সারি আসছে পেছনে পেছনে, খচ্চরের পিঠে ছেলেরা বসে আছে, রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে। আবদুল সাবরের মাথায় এসে পৌছে গেছে। এখানে কোথাও কোথাও ডুমুর গাছ, জায়গায় জায়গায় স্তূপীকৃত বরফ, সামনে পলন্দরীর পাথুরে উপত্যকা, পেছনে তরাটখিলের ঘন জঙ্গল, আরও দূরে তাদের দেশের নীল পাহাড়শ্রেণী। আবদুল কপালে হাত দিয়ে পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করল, হঠাৎ তার মনে পড়ল, বানোকে সে পেছনে কত দূরে ফেলে রেখে এসেছে!

* * *

'বানো!' বানো পেছন ফিরে দেখল, তার আব্বা ডাকছে। বুকের কাছে হাতখানা উঠে এসেই আবার নিচে নেমে গেলো, ভীষণ ক্লান্ত বিমর্ষ পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে তার আব্বার কাছে এসে দাঁড়ল।

তার আব্বা নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'বানো, ইচ্ছে করলে কাল তুই তোর মা-র কাছে চলে যেতে পারিস। করমদাদ তোকে গাঁয়ে রেখে আসবে।' কাদর বট্ট তার নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বানোর দিকে তাকাল। রাতে তার মাকে মনে পড়ার কথায় কাদর বট্ট আদৌ খুশী হয়নি। তারপর তার নীল চোখে ক্রোধের লক্ষণ দেখা গেলো, ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে তার লোমশ বুকের ওঠা-পড়া দেখা যাচ্ছিল।

বানো বলল, 'না আব্বা, তোমার কষ্ট হবে, আমি যাব না। আমি এমনিই কাঁদছিলাম —শুধু শুধু।'

কাদর বট্টের আর কিছুই করার ছিল না। সে চোখ নিচু করে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা মা, তোমার যা ইচ্ছে!'

বানো একেবারে আচম্‌কা হরিণের মতো ছুটে পালাল। তার চোখে পলক পড়তে দেখে আর তার ছোট ছোট টুক্‌টুকে ঠোঁট দুটোকে চক্‌চক করে উঠতে দেখেই কাদর বট্ট এমন ভয় পেয়ে গেলো যে, সে আর কিছু বলতেই পারল না।

কিছুক্ষণ পর সে নিজেই মনে মনে বলল, 'এমন সুন্দরী মেয়ে খোদার দেওয়া বালাই। খোদা করুক, আল্লাদাদ তাড়াতাড়ি পাঁচশো টাকা যোগাড করে নিয়ে চলে আসে, তো মেয়ের গায়ে হলুদ দিই। প্রভু, তোমার মর্জির ওপরেই আমার মানমর্যাদা নির্ভর করছে।'

কাদর বট্ট আকাশের দিকে তাকাল, তারপর করাতের দিকে চলে গেলো। কাঠগুঁড়োর ওপর লক্ষ লক্ষ শিশিরবিন্দু ঝক্‌মক করছে। কাদর বট্ট হাত বুলিয়ে সেগুলোকে মিলিয়ে দিলো। তারপর সে এক মুঠো কাঠগুঁড়ো তুলে নিল—বরফের মতো কন্‌কনে ঠাণ্ডা—মাটিতে বসে কাঠগুঁড়ো দিয়ে পা সাফ করতে লাগল সে। ঠাণ্ডা কাঠগুঁড়োর হিমেল স্পর্শ তার শরীরের সমস্ত ক্রোধ ধীরে ধীরে দূর করে দিলো। মুচকি হেসে মনে মনে বলল, 'ইস, আমিও কেমন সন্দেহবাতিক! খামোকা আজেবাজে কথা ভাবছি।'

* * *

পুরো দলটা সাবরের মাথায় এসে পৌঁছাল। পেছনে তরাটখিলের উপত্যকা, সেখানে ঘন জঙ্গল। সামনে পলন্দরীর পাথুরে উপত্যকা—সেখানে শক্তি, তলোয়ার আর ঘোড়সওয়ারীর সঙ্গেই ভালোবাসা। সেখানে পাহাড়ী কবির ভাষা বড় কোমল, কিন্তু হাত খুব মজবুত, মন নির্ভীক। দলটা সাবরের চুড়ো থেকে এখন আবার নিচে পলন্দরীর উপত্যকার দিকে এগিয়ে চলেছে। আবদুল লক্ষ্য করল, পথের পাথরগুলির রঙ কালো, মাটির রঙ লাল, তাতে বজরা ও ভুট্টা ছাড়া আর কিছু ফলে না। মাটির রঙ যেমন লাল, তেমনি সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙও লাল—ডালিমের মতো টুক্‌টুকে, সোনার মতো হলদেটে নয়, তামার মতো তামাটে নয়, বরং টক্‌টকে লাল।

দলটা এগোতে এগোতে পলন্দরীর উপত্যকায় এসে পৌঁছাল। সূর্য মাথার ওপর। অনেক উঁচুতে চিলেরা পাক দিয়ে দিয়ে চিৎকার করছে। রাস্তার মোড়ে সুবেদার জানমহম্মদের ছেলে আহম্মদ আলি রয়েছে ঘোড়ার পিঠে, মাথায় রেশমী পাগড়ি আর লম্বা টুপি, পরনে বিরজস আর শিকারী কোট, সঙ্গে পিস্তল-কার্তুজ নিয়ে খুশী মনে এগিয়ে আসা দলটিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তার সহপাঠীরা তাকে দূর থেকেই চিনে ফেলল। অনেক ছেলে একসঙ্গে 'আহম্মদ আলি, আহম্মদ আলি' বলে চিৎকার জুড়ে দিলো, খচ্চর ছুটিয়ে তার কাছে এসে হাজির হলো। খচ্চর-গুলোকে গাছের সঙ্গে বাঁধল তারা। সেখানে আহম্মদ আলি দলটার জন্যে যে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিল, তার সদ্ব্যবহার করা হলো। তারপর দলটি আবার রওনা হলো।

আহম্মদ আলি তার সাদা ঘোড়াটাকে আবদুলের খচ্চরের কাছাকাছি নিয়ে এল। আবদুল বলল, 'তুমি শুনেছ বোধহয়, মিলিটারী দিয়ে আমাদের কাছ থেকে 'লগান' আদায় করা হচ্ছে।'

আহম্মদ আলি চোখ লাল করে বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। কাফেরদের দিন এ-বার শেষ হয়ে এসেছে।'

'আমার তো পরীক্ষা দিতেও ইচ্ছে করছে না।'

'সেটা কোন শুয়োরের ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে রাজার গলা টিপে ধরি। তুমি গ্যাখো না, কিছুদিনের মধ্যেই—আর বেশী দেরী নেই।'

'তুমি কি করে জানলে?'

আহম্মদ আলি তার দিকে ঝুঁকে বলল, 'আব্বা বলেছেন আমাকে।'

আবদুল বলল, 'একটা গোপন কথা বলছি, আমি রেসিডেণ্ট বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

আহম্মদ আলির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'রেসিডেণ্ট বাহাদুর খুব ভালোমানুষ। তিনি আমাদের দেশকে আবার আমাদের হাতে তুলে দিতে চান। দেখো, একদিন আমাদের বংশের লোকেরাই আবার পলন্দরীর সর্দারি করবে। পলন্দরী আর বেশী দিন ডোগরা-রাজের গোলামী সহ্য করবে না।'

আহম্মদ আলির সাদা ঘোড়া বারবার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, বারবার আহম্মদ আলি তার লাগাম টেনে ধরে তাকে আবদুলের খচ্চরের সঙ্গে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। অবশেষে তার বিরক্তি ধরে গেলো। বলল, 'চলো আবদুল, একটু তেজ কদমে এগিয়ে যাই। এ রকম টিকিয়ে-টিকিয়ে দলের সঙ্গে যেতে আর ভালো লাগে না।'

'হেডমাস্টার কি বলবেন?'

'হেডমাস্টারের নিকুচি করেছে—আমি সামলে নেব, তুমি আমার সঙ্গে এস।'

আবদুল তীক্ষ্ণ চোখে আহম্মদ আলির দিকে তাকাল। আহম্মদ আলি লাল হয়ে উঠল।

আবদুল মুচকি হেসে বলল, 'আমি জানি, অন্য কোনো ব্যাপার আছে।'

'যখন জেনেই ফেলেছ, তখন আর ও নিয়ে ভাবছ কেন?'

'কোথায় রয়েছে সে?'

'এখান থেকে মাইল দুয়েক আগে। জুব্বা গলীর মোড়ে একটা ঝরণা পড়বে। সেখানে বসে বসে সে নিশ্চয় আমার প্রতীক্ষা করছে।'

আবদুল তার খচ্চরটাকে তক্ষুনি সামনে হাঁকিয়ে বলল, 'তাহলে চলো।'

আহম্মদ আলি তার সাদা ঘোড়ার পেটে এড়ি মারল। আগে আগে সাদা ঘোড়া, পেছনে পেছনে আবদুলের খচ্চর দৌড়ে চলল। পেছনে লালমাটির ধুলো উড়তে শুরু করল। হেডমাস্টার সহ অন্যান্য সহপাঠীরা পেছন থেকে তাদের গালাগালি দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে লাগল।

জুব্বা গলীর মোড়ের নিচে সবুজ পত্র-পল্লবে ভরা একটি কাউ গাছ। আহম্মদ আলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিচের সেই গাছটির দিকে ইশারা করে বলল, 'আবদুল,

তুমি এদিকে-ওদিকে লক্ষ্য রেখ আমি এক্ষুনি আসছি। যদি কাউকে ঐ গাছটার দিকে যেতে ছাখো চট করে আমায় সাবধান করে দেবে।' কথাটা বলেই আহম্মদ আলি ঘোড়া হাঁকিয়ে নিচে ঢালের আড়ালে ঝরণার দিকে চলে গেলো।

একটু পরেই ফিরে এল সে। মুখ-চোখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, ঘোড়াটাও পা ফেলছে ধীরে ধীরে।

'কি ব্যাপার?'

'আসেনি।'

আবদুল হেসে বলল, 'আসেনি?'

আহম্মদ আলি বলল, 'ফের হাসলে গুলি করে দেবো কিন্তু।'

আবদুল তবু হাসল। বলল, 'এস, এগিয়ে যাই।'

'আমার আর পরীক্ষা দিতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে, ওকে খুন করব, তারপর নিজে মরব।'

আস্তে আস্তে আহম্মদ আলি ও আবদুল এগিয়ে চলল। নিচে জঙ্গল, ওপরে জঙ্গল, মাঝখানে কাঁচা রাস্তা, ধারে ধারে প্রশস্ত কালো পাথর জায়গায় জায়গায় এমনভাবে খাড়া হয়ে আছে, যেন প্রহরী। আহম্মদ আলি বারবার নিচে মেষ-ছাগলের পালের দিকে তাকায়, সেগুলো যারা দেখাশোনা করছে, তাদের দিকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে, কিন্তু সে যে-বস্তুটি খুঁজছে, সেটি তার নজরে পড়ে না কোথাও। সামনের মোড়ে গিয়ে এ উপত্যকাটি শেষ হবে, ঐ গ্রামখানাও পেছনে ফেলে রেখে যেতে হবে, ভালোবাসার পদক্ষেপ পড়ে থাকবে পেছনে। আহম্মদ আলি হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখার মতো সুর তুলে গাইতে শুরু করল, যেন সে উচ্চকণ্ঠে উপত্যকার প্রত্যেকটি রাখাল ছেলেমেয়েকে, পালের প্রত্যেকটি ছাগল-মেষকে, রাস্তার কাঁকরকে, গাছের শুক্‌নো পাতাগুলোকে তার দুঃখগাথা শোনাচ্ছে—

কে বলতে পারে ওগো তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে?
না-কি তুমি স্রোতের টানে এসেছিলে হঠাৎ আমার কাছে,
আমার মনে ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছেগুলি জাগিয়ে দিয়েছিলে,
তারা এখন বুকের ভেতর প্রজ্জ্বলিত শিখা হয়ে নাচে।
কে বলতে পারে—
ওগো আমার চাঁদ!

তার কণ্ঠস্বর উপত্যকার চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে থেমে যায়। রাখাল ছেলেমেয়েরা তার দিকে চেয়ে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। মেষগুলো একবার কান খাড়া করে আবার ঘাস খেতে শুরু করে; কেন না, ভালোবাসার চেয়েও বেশী জরুরি পেটে দানাপানি দেওয়া। একটি ঝরণার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল একটি রাখাল মেয়ে, সে ঘোড়সওয়ারের মনের দুঃখ যথার্থই বুঝতে পেরেছিল, কারণ সেটা তার নিজেরই মনের দুঃখ। যে ঝরণার ধারে যাওয়ার জন্যে সে দু'দিন

থেকে অস্থির হয়ে আছে, সেখানে সে যেতে পারেনি। এখন অতদূর থেকে প্রেমিকের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সেই লম্বা টুপি আর সাদা ঘোড়া। দেখতে অমন সুন্দর পৃথিবীতে আর কেউ নেই বুঝি —তুমি জানো না, কেন আমি জুব্বা গলীর ঝরণায় যেতে পারিনি, কিন্তু হৃদয়খানা পড়ে ছিল সেখানে, তুমি নিশ্চয়ই সেখানে ঝরণার প্রতিটি তরঙ্গে তার স্পন্দন শুনেছ। রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে যাওয়া, গান গাইতে থাকা মানুষটি, আমার জবাবটাও শুনে যাও।

রাখাল মেয়েটি রাস্তার দিকে পেছন ফিরে বসে পড়ল, নইলে সে গাইতে পারছিল না—নিজের প্রেমিককে সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে সে গাইতে পারছিল না, কারণ সামনে তার মা, তার ছোট ভাই, তাদের কাছে সে মনের ভাব কিছুতেই লুকোতে পারছিল না। তার চোখের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে সবাই, সেই ভয়ে সে পেছন ফিরে বসল, উঁচু গলায় জবাব দিতে শুরু করল। গানের জবাব দেওয়াটা খারাপ নয়। পাহাড়, উপত্যকা আর জঙ্গলের নিঃসঙ্গতায় এটাই রীতি। মুসাফিরের গানের জবাব দেওয়াটা প্রয়োজন, তাই রাখাল মেয়েটি উঁচু গলায় গাইল—

নতুন কোনো পেয়ালাতে চুমুক দেওয়ার মতো
তোমায় আমি পেয়েছিলাম, পাইনি তোমার মন—
সে যে তেমনি মুক্ত তেমনি চপল রয়েছে অনুক্ষণ।
কখন তুমি আসবে সখা ভাবতে ভাবতে হায়
পেরিয়ে গিয়েছিল সময় তোমার প্রতীক্ষায় ;
আমায় তুমি দিয়েছিলে এক পলকের সুখ,
তাই যে আমি অঞ্জলিতে নিয়েছিলাম তুলে একটি ফুলের মতন।
আর আজকে যবে তুমি ওগো চলে যেতে চাও
আমি তোমার সাদা ঘোড়ার পায়ে দিলাম চুমু
বলি —বিদায়, বন্ধু···বিদায় !
ওগো আমার চাঁদ !

আহম্মদ আলির মুখ-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলল, 'এ সে-ই, এ সে-ই ! ইনশায়াল্লা (ঈশ্বরের ইচ্ছে হলে), এ-বার আমি পরীক্ষায় পাশ করবই !'

কথাগুলো বলে আবদুলের কথাও আর খেয়াল রইল না তার, সাদা ঘোড়ার পেটে জোরে এড়ি লাগাল, ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকিয়ে নিয়ে সামনের মোড়টা পার হয়ে গেলো সে। সাদা ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে আবদুলও তার খচ্চরটাকে পেছন পেছন ছোটাল, মনে মনে বলল, 'আর আমি ? বানো ! আমি ? আমাকেও আশীর্বাদ করো, আমিও যেন পরীক্ষায় পাশ করতে পারি।'

*　　　*　　　*

পাহাড়ের ঢালুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বানো গোলাপী মেঘের আড়ালে সূর্যকে ডুবতে দেখল। উত্তর-দক্ষিণের পাহড়শ্রেণীর ওপারে বড় শহর, সেখানে আবদুল পড়ে, তার চেয়েও দূরে বিশাল বিস্তৃত মাঠে-ভরা পাঞ্জাব, সেখানে আবদুল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাবে। সে দেশটা কত বড়, কি রকম, কেমন তার লোকজন, বানো খুব কষ্টেই সে সব কল্পনা করতে পারে। সে দেশের অনেক গল্প শুনেছে সে। গাঁয়ের লোকের মুখে সেই সব গল্প শুনতে শুনতে শীতের রাতে আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মতো মজা পাওয়া যায়। শুনতে শুনতে দম বন্ধ হয়ে আসে, গাল দুটো রাঙা হয়ে ওঠে, গভীর আবেগে চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে—তবু বানো সে দেশটি সম্পর্কে খুব সামান্যই কল্পনা করতে পারে—গোলাপী মেঘের ক্রমাগত রঙ পাল্টানোর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে বাস্তবতা, এখানে এই ঢালুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কখনও তা বুঝতে পারেনি সে। তার দৃষ্টি যেন ঐ দুলতে থাকা মেঘের রঙিন পর্দাটাকে চিরে ফেলতে চায়, কিন্তু সেই পর্দা, সেই অবগুণ্ঠন, পৎপত করে উড়তে থাকা পতাকার মতো, রাজাসাহেবের বিশাল জমকালো প্রাসাদের মতো তার মনের অবস্থা দেখে শুধু হাসতে থাকে যেন। ঐ মেঘ মেঘদূতের মতো অলকা-পুরীতে বসবাসকারিণী বিরহিণী সুন্দরী যক্ষপ্রিয়ার বার্তাবাহক হতে পারে না, কারণ মেঘকে ভাষা দেন কবি, কিন্তু সে তো কবি নয়। সে অসহায়ভাবে ঢালুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যকে ডুবে যেতে দেখে আর তার মনে হয়, সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাও যেন ডুবে যাচ্ছে।

বানো গভীর আত্মমগ্ন হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একটা লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু তার পায়ের শব্দটুকুও সে শুনতে পেল না। সুদূর মেঘের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে, তন্ময় হয়ে আছে। লোকটা তার দিকে এগিয়ে এল, অথচ তার ছায়াটাও সে লক্ষ্য করল না। নিজের কোমল আবেগের তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সে—বানোর গোলাপী মুখখানি আর যৌবনোচ্ছল দেহখানি দেখে লোকটার মন কি রকম উথাল-পাথাল করছে, তার মনের নানা রকম ভাবাবেগের ছায়া পড়ছে তার মুখে, কিন্তু সে সব কিছুই বানোর চোখে পড়ল না।

আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বানো তো? নিশ্চয়ই তুমি বানো!' তারপর তার খুব কাছে এসে ডাকল, 'বানো!'

বানো আস্তে আস্তে ফিরে তাকাল। তখনও তার চোখে সুদূরের হাতছানি, মুখে গভীর চিন্তার ছায়া। আগন্তুক তাকে এমন গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখছে যে, বানো ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? —আমায় চিনলে কি করে?'

'আমার নাম সওকত, আল্লাদাদের দোস্ত, তোমার হবু বরের সঙ্গী।'

বানো অস্থির তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত সওকতকে চেয়ে চেয়ে দেখল। ওকে

খুব খারাপ লাগল তার। সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আব্বা ওদিকে করাতের কাছে আছে বোধহয়।'

সওকত একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল, 'তুমি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।'

কাছে এসে দাঁড়াতেই বানোকে তার খুব ভালো লাগল। একেবারে আস্ত একটি মুরগির মতো। ইচ্ছে করছিল, বানোর পালকে হাত বুলিয়ে আদর করে। নরম নরম পালকের ওপর খুব আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আচমকা তার ঘাড়টা ধরে মটকে দেয়, তার সমস্ত রক্ত পান করে নেয়। নিজের এই চিন্তা ভাবনায় নিজেই ভয় পেয়ে গেলো সে। চোখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। তারপর সে ভাবল —মুরগি আর যাবে কোথায়!

বানো বলল, 'চলো।'

* * *

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে কাদর বউ আর সওকত দু'জনে কাছাকাছি বসল। সওকত কাদর বউকে সমস্ত কথা খুলে বলল —আল্লাদাদের খুন হওয়া, আবদুলের পালিয়ে যাওয়া। বানো চুপচাপ দাঁড়িয়ে দম বন্ধ করে শুনছে।

সওকত বলল, 'আল্লাদাদ মারা যাওয়ার সময় আমাকে বলেছে যে, আমি তো মারা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি বানোর আব্বার কাছে যাবে। যদি তোমার মেয়ে পছন্দ হয় তাহলে ওর আব্বাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ওকে বিয়ে করবে, কারণ মাঁগনির সাড়ে তিনশো টাকা আমি আগেই দিয়েছি। আমি মৃত্যুকালে সে টাকার হক তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি।'

কাদর বলল, 'টাকা আল্লাদাদের, সে মারা গেছে। সেইসঙ্গে তার মাঁগনিও ভেঙে গেছে।'

'মাঁগনি না-হয় ভেঙে গেলো, কিন্তু টাকা?'

'আল্লাদাদের টাকা, সে মারা যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তার হক তো আমাকে দিয়ে গেছে, এই কাগজটা ছাখো।'

কাদর বউ অছিয়তনামা দেখল। উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে বলল, 'আমি এ সব কাগজ-টাগজ বুঝিনে। আমি মানুষের জবান বুঝি। আল্লাদাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে মারা গেছে, এখন আমার মেয়ে স্বাধীন।'

বানো মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সওকত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি আমায় চেনো না। আমি রামপুরের পাঠান।'

কাদর বউ বলল, 'আমি কি করে জানব তুমি পাঠান না মুচি! বাইরে থেকে যারা আসে, তারা সবাই নিজেকে পাঠান বলে। তুমি তো আমাদের দেশের লোক নও যে, তোমার কথার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করব! আচ্ছা, ধরেই নিলাম, তুমি পাঠান। এ-বার কি বলছ বলো…'

'বেশ বলছি ...,' :সওকত চোখ কোঁচকালো, 'ব্যাপারটা হলো এই যে আমার হক সবার আগে। আমার কাছে আল্লাদাদের সরকারী অছিয়তনামা আছে। আমার পকেটে পাঁচশো টাকা আছে, আমি বানোকে বিয়ে করতে চাই। আমিও কিছু ফেলনা নই, পুলিশে চাকরি করি, ভেবেচিন্তে জবাব দাও।'

কাদর বট্ট উঠে পায়চারি করতে লাগল। পায়চারি করতে করতে এক সময় থেমে সওকতের দিকে চেয়ে বলল, 'কোথায় পাঁচশো টাকা, বের করো।'

বানোর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

একটা ভারি জিনিস এক হাত থেকে আর এক হাতে গেলো।

তারপর কাদর বট্টের কথা শোনা গেলো, 'আমি তোমাকে চিনিনে, কিন্তু খোদার ইচ্ছে হলে আমার মেয়ে তোমারই হবে।'

বানো মুখে হাত চাপা দিলো, নইলে তার মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে পড়ত। অনেকক্ষণ সে পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। অবশেষে, কিছুক্ষণ পর তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। তপ্ত অশ্রু, অসহায় ক্রোধের অশ্রু।

সওকত জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে কবে হবে ?'

কাদর বট্ট বলল, 'জঙ্গলের কাজ সামনের মাসে শেষ হচ্ছে। সামনের মাসের শেষ দিকে জ্ঞানশাহ এখানে আসবে, তার মালপত্র তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরব, তখন তোমার জিনিসও তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। খোদার যখন ইচ্ছে, তখন তাই হবে। কিন্তু বিয়ের যা খরচ-পত্তর, সেটা সব তোমার।'

'কেন ?'

'খোদার ইচ্ছে।'

'খোদার ইচ্ছেতে কত খরচ হবে ?'

'সাড়ে সাতশো।'

সওকত লাফিয়ে উঠল, 'তুমি আমার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছ !'

'আমি কি আমার হবু জামাইয়ের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে পারি, বিশেষ করে যে রামপুরের মুচি !' কাদর বট্ট বুক চিতিয়ে কথাগুলো বলল।

সওকতের চাকু বিজলির মতো রাতের কালো অন্ধকার চিরে ফেলল, কিন্তু কাদর বট্ট দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের বুক বাঁচাল। চাকু তার ডান হাতের পেশীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, সেখান থেকে রক্তের ধারা বইছে। এখন সওকত চাকু নাচাতে নাচাতে দ্বিতীয় আক্রমণের জন্যে এগিয়ে আসছে। এমন সময় বানোর চিৎকারে করমদাদ, নূর এবং ওয়ালিজুর ঘুম ভেঙে গেলো। তারা তিন জনেই কাদর বট্টকে সাহায্য করার জন্যে এসে পড়ল। ওদের আসতে দেখেই সওকত পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু চারজনে চারদিকে ঘিরে ফেলল তাকে দু'পাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, যেন ওরা শিকারী আর সওকত জঙ্গলের জানোয়ার। সওকত ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো চারদিকে তাকাল

এবং দেখল, তার পালানোর কোনো পথ নেই। সে এদিক-ওদিক একটু চেষ্টা করতেই তারা ওকে চারদিক থেকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল। এখন চারজনেই ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে—শান্তভাবে, কিন্তু দারুণ সতর্কতার সঙ্গে—দূরত্বটা আস্তে আস্তে কমিয়ে আনছে ওরা। ওদের নীরবতার মধ্যেও যেন এক হিংস্র চিৎকার, যেন ওরা মানুষ নয়, জঙ্গলের জানোয়ার।

সওকত চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'তোমরা চারজন, আমি একা।'

নূর বলল, 'তোমার কাছে চাকু আছে, আমাদের খালি হাত।'

'এটা বাহাদুরি নয়, আমাদের দেশে একজনের মোকাবিলা একজনেই করে।'

করমদাদ বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে যখন মুখোমুখি লড়াই হয়, তখনই।'

নূর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এস, একজন তো একজনই, আমার সামনে এগিয়ে এস—কিন্তু পালাবে না, নইলে এই তিনজনেই তোমাকে কাবু করে ফেলবে। আমরা জঙ্গলে বাস করি, জানোয়ার ঘিরে ধরার কায়দা জানা আছে আমাদের নইলে তোমার মতো জানোয়ারে এতদিনে আমাদের খেয়ে ফেলত!' নূরের লম্বা লম্বা শীর্ণ হাত, হাতের থাবাও বেশ বড় বড়, ভীষণ অস্থির। হাত দুটো সওকতের দিকে এগিয়ে চলেছে। নূরকে দেখে সাধারণত মনে হয়, লোকটার ঐ হাত দু'খানি ছাড়া আর কিছুই নেই। নূর প্রথম হামলাটা বেশ সহজেই সামলে নিল, কিন্তু পরের বারেই তার হাত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল কিন্তু তবুও সে এগিয়ে চলেছে।

সওকত নানা রকম পাঁয়তারা কষে আক্রমণ চালায়, কিন্তু নূর এগিয়ে চলে। নূর যতই কাছে এগিয়ে আসে, ততই সওকতের আক্রমণ ভোঁতা হয়ে যায়। অবশেষে এক ঝটকায় নূর হাতখানা এমন জোরে চেপে ধরল যে চাকু তার হাত থেকে ছিট্‌কে মাটিতে গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নূরের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দারুণ ক্ষিপ্রতায় তার ঘাড়ের ওপর চেপে বসল, আঙুলগুলো দিয়ে সে যেন সওকতের প্রত্যেকটি শিরা ও ধমনীর সন্ধান করছে।

হঠাৎ কাদর বট্ট চিৎকার করে উঠল, 'না ···না ···না··· ।'

'কিন্তু ও তোমায় খুন করত!' নূর তার লম্বা লম্বা আঙুলে সওকতের ঘাড়টাকে ক্রমশ চেপে ধরতে ধরতে বলল।

'করলে তা খোদার ইচ্ছেতেই করত। কিন্তু এটা পাপ।'

করমদাদ বলল, 'মানুষকে মারা পাপ, কিন্তু যে মেহমান (অতিথি) সেজে বাড়িতে এসে ধোকা দেয়, সে মানুষ নয়, জানোয়ার। আর জানোয়ারকে মারা পাপ নয়।'

নূর বলল, 'তুমি ভেবো না কাদর বট্ট! এক মোচড়েই ওর ঘাড়টা মটকে দেবো—তাতে ওর বেশী কষ্ট হবে না!'

কাদর বট্ট বলল, 'না····নূর ···ওটা পাপ কাজ!'

নূর তার হাত টেনে নিয়ে বলল, 'খোদা জানে আমাদের গাঁয়ে এই মৌলভীটা জন্মাল কি করে!' কথাটা বলেই নূর তার লম্বা লম্বা হাতে সওকতকে এমন খুণাভরে ওপরে তুলে নিল, যেন সে একটা তুচ্ছ পোকা-মাকড়, আর তারপরই তাকে সজোরে মাটিতে আছড়ে দিলো। 'আমি ওকে দু'চারটে আছাড় দেবো কাদর বট্ট, আর তারপর ওর হাতের আঙুলগুলো মটকে দেবো, যাতে ও আঙুলের ব্যথায় আর কখনও চাকু চালাতে না পারে। শয়তানটা জানে না যে, আমাদের কাশ্মীরীদের গায়ে রক্ত খুব বেশী নেই।'

কথাটা বলেই নূর সওকতের ঘাড় ধরে আবার তাকে ওপরে তুলে নিল, দ্বিতীয় আছাড় মারতে যেতেই কাদর বট্ট বাধা দিয়ে বলল, 'না নূর, আপদ্টাকে ছেড়ে দে। জায়গীরদারের আপনার লোক ও।'

'ওহো, তবে আর রক্তের দাম কি বুঝবে ও!' নূর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল।

'তাছাড়া আমাদের মেহমানও বটে।'

'বিসমিল্লাহ্ (ঈশ্বরের নামে) !' করমদাদ গম্ভীর গলায় সওকতকে বলে।

'তাছাড়া বানোকে বিয়ে করার জন্যে পাঁচশো টাকাও নিয়ে এসেছে।'

নূর তার হাত দু'খানা কোমরে রেখে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'আপনার জন্যে কাশ্মীরী কফি বানাব, না বিলেতি চা!'

তারপর সে সওকতের মুখে এক জোর ঘুষি কষালো, তাতে সওকতের মুখ ফেটে একেবারে রক্তাক্ত হয়ে পড়ল। নূর চিৎকার করে বলল, 'কাদর বট্ট তোর জান বাঁচিয়ে দিলে ···নইলে ···এখন সোজা রাস্তা ছাখ। যদি আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াস, তাহলে হয়ত কাদর বট্টও তোর জান বাঁচাতে পারবে না।'

সওকত হাঁপাতে হাঁপাতে, মুখের রক্ত আর ঘাম মুছতে মুছতে, গালাগালি দিতে দিতে ঢালের আর একদিকে দৌড়তে শুরু করল। হঠাৎ সে থেমে বলল, 'আমার সেই পাঁচশো টাকা?' তারপর সে প্রশ্নটা নিরর্থক ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলো।

কাদর বট্ট মৃদু হেসে বলল, 'বানোর বিয়ের জন্যে আমার টাকা-পয়সার কত দরকার ছিল, আল্লা দেনেওয়ালা!'

যখন তারা চারজন তাঁবুর দিকে ফিরল, তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, বানো উনুন জ্বালিয়ে কফি তৈরী করছে, আর ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্যে হলুদ, পেঁয়াজ আর ধুড়ির শেকড় পিষে একপাশে রেখে দিয়েছে। হাসতে হাসতে চারজন পরস্পরের দিকে তাকাল, সেই মুহূর্তে চারজনেরই মনে হলো, বানো কত বুদ্ধিমতী —যার ঘরে যাবে, সে কত সুখী হবে! যতদিন বেঁচে থাকবে, তার সেবাযত্ন করবে! মারা গেলে বিধবা হয়ে বানো তার কবরে রোজ ফুল দেবে, প্রতি বছর নিয়াজ (নৈবেদ্য) দিয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করবে! বানোর মতো বুদ্ধিমতী স্ত্রী খোদা যেন প্রত্যেককে দেয়! কাদর বট্ট ভাবছিল, যে বানোকে বিয়ে করবে,

নিশ্চয়ই তার খুব সৌভাগ্য, কিন্তু ওকে বিয়ে করার জন্যে বড় মেহনত করতে হবে তাকে। মাঁগনির সাড়ে সাতশো আর বিয়ের পাঁচশো দিতেই হবে— এখন এই যে পাঁচশো টাকা মুফতে হাতে এল, তা দিয়ে আর একখানা ধানের ক্ষেত কেনা যেতে পারে।

বানো কাদর বটের ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিতে শুরু করল। কাদর বট মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বানো, বড় লক্ষী মেয়ে তুই আমার !'

* * *

'আমার বানো বড় লক্ষী।' আবদুল তার সঙ্গী আহম্মদ আলিকে কথা প্রসঙ্গে বলল, 'মনে হয় অমন সুন্দরী মেয়ে সারা কাশ্মীরে নেই।'

আহম্মদ আলি ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার প্রেয়সীর চেয়েও ভালো ?'

আবদুল একটু থেমে বলল, 'না, ওর কথা আলাদা। আমার প্রেয়সী আর তোমার প্রেয়সী কাশ্মীরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।'

আহম্মদ আলি খুশী হয়ে বলল, 'তুমি আমার সবচেয়ে ভালো দোস্ত। এস, বাজি রেখে একটু ঘোড়া দৌড়াই।'

আবদুল আপসোস করে মাথা নেড়ে বলল, 'ভাই আহম্মদ আলি, ঘোড়া আর খচ্চরের মধ্যে কি তুলনা হয় !'

'এস না তুমি !' আহম্মদ আলি তার সাদা ঘোড়ায় এড়ি কষালো।

ঘোড়া দৌড়তে দৌড়তে ওর ভুতিয়া গাঁ-র কাছে এসে পৌছাল। গ্রামখানা নিচে উপত্যকায়। ওরা ওপরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। নিচে ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছে। দুটি মেয়ে ঝরণা থেকে কলসিতে জল ভরে নিয়ে আসছে। তিনটি মেয়ে শূন্য কলসি নিয়ে ঝরণায় যাচ্ছে। একটা মোষের পিঠে কাক বসে তার চামড়ায় ঠোকরাচ্ছে। রাখাল ছেলেরা গুলতি নিয়ে পাখির দিকে তাক করছে। একটি মেয়ে ভেড়া-ছাগলগুলোকে ফেলে রেখে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখছে। সে বানোর মতোই, কিংবা আহম্মদ আলির প্রেয়সীর মতোই দেখতে সুন্দরী —যেন পৃথিবীতে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মেয়ে আছে, তারা ছাগল-ভেড়ার পাল চরায়, ক্ষেতে কাজ করে, ঝরণায় জল আনতে যায়, ঘাস কাটে, রান্নাবান্না করে, ছেলেপিলের মা হয়, আবার অবকাশ মুহূর্তে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করতে থাকে। আবদুল ভাবে, আমার দেশের মাটি কত ভালো —এত দারিদ্র্য অশিক্ষা বেকারী ও অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও আমার দেশের আকাশে কি সুন্দর মেঘ ! আবদুল চারদিকের দৃশ্যটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। ঐ গাঁ-ঘর, মাঠ-ঘাট, গাছপালা, টিলে-পাহাড় পার হয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় নদীতীরে যেখানে লছমনপতনের সাঁকো রয়েছে, যার এ পারে তার দেশ, ও পারে আর একটি নতুন দেশ —পাঞ্জাব।

যেখানে আবদুল ও আহম্মদ আলি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ওপরে, যে টিলার

ওপর দিয়ে রাস্তাটা এসেছে, সেখানে একটি আলুবোখারার গাছ দাঁড়িয়ে, সর্বাঙ্গে কোথাও একটি সবুজ পাতা নেই, কিন্তু তার প্রত্যেকটি ডালপালা সাদা সাদা ফুলে ভরে গেছে। সে দিকে চেয়ে আবদুলের মনে হলো, সে যেন তার আব্বার সাদা দাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে, তার চারদিকে তৃপ্তি, সুখ আর শান্তির ছায়া।

ভুতিয়া থেকে লছমনপতন পর্যন্ত রাস্তাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, সোজা ও সমতল। এর একটা কারণ আছে। কয়েক বছর আগে পি. ডব্লিউ. ডি. বিভাগে এক ইংরেজ ইঞ্জিনীয়র থম্প্‌সন চীফ ইঞ্জিনীয়র হয়ে এসেছিল। বিভিন্ন এলাকা দেখেশুনে শেষে সে একটি পরিকল্পনা দাখিল করে। লছমনপতন থেকে জায়গীরের কোনো বড় শহর পর্যন্ত মাত্র পনেরো লক্ষ টাকা খরচে একটি মোটর-রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব। লছমনপতনের ওপারটা পাঞ্জাব। ও দিকে সহালা পর্যন্ত রেল-ব্যবস্থা আছে, সহালা থেকে কহোটা পর্যন্ত মোটর-রোড, আর কহোটা থেকে লছমনপতন অশ্বারোহণে মাত্র দেড় দিনের রাস্তা, বলতে কি, ভালো অশ্বারোহীর পক্ষে একদিনই যথেষ্ট। তাই বড় শহর থেকে লছমনপতন পর্যন্ত প্রধান জায়গীরে যদি মোটর রাস্তা নির্মাণ করে, তাহলে পাঞ্জাবের মধ্য পর্যন্ত যাতায়াতের এক উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রেসিডেণ্ট বাহাদুর পরিকল্পনাটি সমর্থন করেন, কিন্তু কাশ্মীর দরবারের উকিল মহোদয় সম্পূর্ণ আলাদা একটি পরিকল্পনা পেশ করে। তাতে সে বলে যে, বড় শহর থেকে উড়ি পর্যন্ত একটি মোটর-রাস্তা নির্মাণ করা হোক। উড়ি কাশ্মীরের মহারাজার খাস এলাকা। উকিল সাহেব আরও প্রস্তাব দেয় যে, সড়ক নির্মাণের অর্ধেক খরচ বহন করুক প্রধান জায়গীর, আর অর্ধেক খরচ কাশ্মীর দরবার। কিন্তু বড় মহারাজা পরিকল্পনাটি নস্যাৎ করে দেন। ও দিকে চীফ ইঞ্জিনীয়র থম্প্‌সনের তত্ত্বাবধানে লছমনপতন থেকে শহর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কর্মসূচী ঘোষিত হয়ে যায় এবং লছমনপতন থেকে শহরের দিকে আবার শহর থেকে লছমনপতনের দিকে —উভয় দিকেই রাস্তা নির্মাণও শুরু হয়। এ দিকে শহর থেকে ছয় মাইল রাস্তা আর ও দিকে লছমনপতন থেকে ভুতিয়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করতেই পনেরো লক্ষ টাকা সাবাড়, আর চীফ ইঞ্জিনীয়র থম্প্‌সন কয়েক লক্ষ টাকা হজম করে দেশ থেকে বেপাত্তা হয়ে যায়। পরে জানা যায় যে, পাকা মোটর-রাস্তা তৈরী করতে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার কম খরচ হতো না। তাই রাজাসাহেবও ভাবলেন যে, অল্পের ওপর দিয়েই গেছে। তাছাড়া এটাও ঠিক যে সামন্ত রাজার পক্ষে কোনো ইংরেজের গায়ে হাত তোলা রীতিমতো দুঃসাহসের ব্যাপার, তাতে সে চোর গুণ্ডা বদমাশ কিংবা চারশো বিশ যা-ই হোক না কেন! রাজাসাহেব নিজেও একজন এক বিশাল চারশো বিশ সংস্থার ক্ষুদে সদস্য, যে সংস্থার সঙ্গে শত বছরের পুরনো মুনাফার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে তিনি জড়িত। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম যে, চোর এসে চোরের ওপর বাটপাড়ি করে গেলো। কিন্তু আসল ব্যাপারে কোনো গোলমাল বাধেনি বলে মামলাটা ওখানেই চাপা পড়ে যায়। সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন

হিসেবে এই ভাঙাচোরা মোটর-রাস্তাটা এখনও বিদ্যমান। সেই মোটর-রাস্তা ধরেই দলটা এখন এগিয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও উপত্যকায় চমৎকার নীল পাথরের সাঁকো তৈরী করা হয়েছিল, সাঁকোর নিচে কয়েক শো ফুট ঐ পাথরেরই খাড়া দেওয়াল। অনেক দূরে দুই ঢালের মাঝখানে পুঞ্চ নদী তুমুল গর্জন করতে করতে বয়ে চলেছে।

ঝক্‌ঝকে সোজা রাস্তা পেয়ে ছেলেরা তাদের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সকলের আগে আহম্মদ আলির ঘোড়া, তারপরে ঠাকুর মানসিংয়ের ঘোড়া। ওদের পেছনে অন্যান্যরা। ঠাকুর মানসিংয়ের বাবা ঠাকুর জারনেলসিং জায়গীরের সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার। ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছে, এই খুশীতে জারনেলসিং তার ছেলেকে সেনাবাহিনীর আস্তাবল থেকেই ঘোড়াটি দিয়েছে। আহম্মদ আলির বাবা আগে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সেপাই ছিল, সেপাই থেকে পদোন্নতি করতে করতে সুবেদার হয়, তারপর সুবেদারি থেকে পেন্‌সন পেয়ে এখন পলন্দরীতে নিজের বাড়িতে বাস করছে। সুবেদার জান-মহম্মদজানের ধূসর গোঁফ, বেঁটেখাটো চেহারা, টক্‌টকে লাল রঙ, মাঝবয়েসী। টাকা-পয়সা বিশেষ ছিল না, কিন্তু ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাই চীফ ইঞ্জিনীয়র থম্‌প্‌সন যখন মোটর-রাস্তা নির্মাণ শুরু করে, তখন লছমনপতন থেকে গোরাহ্ পর্যন্ত সড়ক তৈরীর ঠিকেদারিটা জানমহম্মদজানের হাতেই আসে। শোনা যায়, সেই কারবারে পেন্‌সনভোগী সুবেদার লক্ষপতি হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলে যে, সুবেদারের সঙ্গে যোগসাজশ করেই সাহেব সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে। আবার কেউ কেউ বলে যে, সাহেব বেচারার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি—সমস্ত টাকা জান-মহম্মদজান একাই হজম করেছে। সাহেবকে নিরাশ হয়ে জায়গীর থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। সে যাইহোক, সুবেদার জানমহম্মদজানের ছেলে আহম্মদ আলির সাদা ঘোড়া সেনাবাহিনীর আস্তাবলের ঘোড়ার চেয়ে কম যায় না। দুটিতে দারুণ পাল্লা দিয়ে চলেছে। কখনো মানসিংয়ের ঘোড়া আগে, কখনো আহম্মদ আলির ঘোড়া। দু'জন ঘোড়সওয়ারই লছমনপতনের চুঙ্গি অফিস পর্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে গেলো। অবশেষে ওরা যখন একেবারে সাঁকোর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন আহম্মদ আলির সাদা ঘোড়াটাই আগে। তাতে দলের মুসলমান ছেলেরা খুব জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগল, হিন্দু ছেলেরা ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হয়ে উঠল।

ঠাকুর মানসিং বলল, 'তোমার ঘোড়াটা এগিয়ে যাবে না কেন, এ জায়গাটা তো আগেই কয়েকবার ঘুরে গেছে, তোমাদের দেশের ভেতরেই পড়ছে এলাকাটা!'

আহম্মদ আলি বলল, 'সরকারী ফৌজের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তোমার ঘোড়ারও এ সব রাস্তা চেনা-জানা হয়ে আছে।'

'আমার ঘোড়া তো ঘাস-ভুসি দানা-টানা যখন যা পায় খায়। তোমার ঘোড়ার মতো ওর তো আর খাওয়া-দাওয়ার ইংরেজী ব্যবস্থা নেই!'

আহম্মদ আলি বুঝতে পারে যে, মানসিং তার বাবাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে। কান পর্যন্ত তার সারা মুখখানি লাল হয়ে ওঠে। বলে, 'ঘোড়া ঘাসই খাবে, মাংস তো আর খাবে না। হার-জিতটা ঘোড়ার নয়, ঘোড়সওয়ারের ওপরেই নির্ভর করে। তুমি সওয়ারীর হিম্মতটা বুঝতে পারনি। আমি যদি তোমার ঐ ফৌজী ঘোড়ায় চড়ি আর তুমি আমার ঘোড়াটা নাও, তবু আমিই জিতব, হিম্মতই জিতবে, ঠাকুর নয়…'

মানসিং তার চওড়া বুক টান করে বলল, 'তখন সেই হিম্মত কোথায় গিয়েছিল শুনি? মাত্র ক'জন ডোগরা রাজপুত এসে যখন তোমাদের পুলন্দরীর এক-একটা দুর্গ দখল করে নিল তখন বাহাদুরীটা কোথায় সেঁধিয়েছিল?'

শানসিং বলল, 'আজও তোমাদের মাটিতে ডোগরাদের রাজত্বি —সেটা ভুলে যেও না আহম্মদ আলি!'

সরদারসিং ফোড়ন কাটল, 'আর ডোগরারাই রাজত্বি করবে চিরকাল, চিরকাল তোমাদের হিম্মতীকে মাথা হেঁট করতে হবে। তা সে জানমহম্মদজানের বেটাই হোক আর যেই হোক।'

আহম্মদ আলি পিস্তল বের করল। ঠিক সেই মুহূর্তে হেডমাস্টার মাঝখানে এসে পড়লেন। হেডমাস্টার পাঞ্জাবের অধিবাসী, গোলাম সরওয়ার কাদিয়ানী। চোখে মোটা কাঁচের চশমা, রোগা-পাতলা চেহারা। ভীষণ দরিদ্র ও সৎ। শরীরের মতো মনের দিক দিয়েও দুর্বল। নিজের স্কুলের ছেলেদের ওপর তাঁর ভারি স্নেহ। মুসলমানদের জন্যেও তাঁর মনে বড় কষ্ট, কিন্তু তিনি স্যর সৈয়দের শিক্ষানীতির দ্বারাই তাদের উন্নতি করতে চান। তিনি মনে করেন যে, ডোগরা সরকারের অভ্যন্তরীণ আইন-কানুনের ওপর দাঁড়িয়েই উন্নতি করা উচিত। তাই মাঝামাঝি এই লিবারাল পলিসিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, ছেলেদের কাছেও তিনি খুব প্রিয়পাত্র। এ রকম পরিস্থিতিতে তিনি যদি সঙ্গে না থাকতেন, বরং অন্য কোনো শিক্ষক থাকতেন, তাহলে নির্ঘাৎ রাস্তায় দু'একটা খুন হয়ে যেত। গোলাম সরওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে আহম্মদ আলির হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিলেন। বললেন, 'এটা তো তোমার আব্বার পিস্তল!'

'জী!' আহম্মদ আলি মাথা নিচু করে বলল।

'তাহলে তুমি এটা সঙ্গে করে এনেছ কেন?'

আহম্মদ আলি একেবারে চুপ।

'এই পিস্তল, এই কার্তুজ —সবই তোমার আব্বার লাইসেন্সের ওপর, তুমি নিজে এ সব নিয়ে বেড়াতে পারো না। ইচ্ছেটা কি? রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছে আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করাতে চাও না-কি?'

আহম্মদ আলি বলল, 'আমি এ সব কিছুই জানতাম না। আব্বার পিস্তল নিয়ে আমি তো প্রায়ই ঘুরে বেড়াই!'

গোলাম সরওয়ার বললেন, 'আমাদের জায়গীরের কথা আলাদা; সেখানে লাইসেন্সের ব্যাপার নেই। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের এলাকায় যে বিনা লাইসেন্সে পিস্তল নিয়ে ঘোরে, তার সাত বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।'

আহম্মদ আলি চুপ করে গেলো। গোলাম সরওয়ার তার কার্তুজের পেটিটাও খুলে নিলেন। পিস্তল কার্তুজ উভয়ই চুঙ্গি অফিসারের কাছে দিয়ে বললেন, 'এগুলো সুবেদার জানমহম্মদজানের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।' তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ-বার থেকে যদি কেউ এভাবে মারপিট করে, তাহলে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেবো না…'

* * *

লছমনপতন থেকে কহোটা পর্যন্ত এলাকাটা বলতে গেলে খুব খারাপ ধরনের এলাকা। এখানে প্রধান জায়গীরের ও ইংরেজ এলাকার দাগী বদমাশ, চোর-ডাকাত আর গুণ্ডাদের ঠাঁই। দু' এলাকাতেই লুটতরাজ খুন-খারাবি করে আবার এখানেই ফিরে আসে। একা কিংবা দু'জনের পক্ষে দিন-দুপুরেও এখানে যাওয়া-আসা করাটা নিরাপদ নয়। পথ ভীষণ বাঁকা-চোরা, পাথুরে। সূর্যের তাপ প্রখর, জলের ঝরণা খুব কম, আর গাছপালার বদলে এখানে-ওখানে শুধু ধূসর মৃত্তিকা চোখে পড়ে। রোদ্দুরে দলটার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। রাস্তায় দু'জন যাত্রীর লাশ দেখতে পাওয়া গেলো, তাদের বুকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন। খুনী তাদের খুন করে জিনিসপত্র লুটে নিয়ে পালিয়ে গেছে। পাঞ্চালে পৌছাতেই রাত হয়ে গেলো, কিন্তু দলটা পথে কোথাও বিশ্রাম না নেওয়াই ঠিক করেছিল। সবাই বলতে শুরু করল, 'একেবারে কহোটাতে গিয়ে আমরা থামব, তাতে রাতভর যদি হাঁটতে হয় তো হোক।' রাত বারোটায় তারা কহোটায় পৌছাল, প্রধান জায়গীরের ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিল তারা। সকালবেলা হেডমাস্টার দু'খানা লরির ব্যবস্থা করলেন। ছেলেরা সেই লরিতে চেপে সুব্যবস্থায় সহালা রওনা হয়ে গেলো। এই প্রথম ছেলেরা লোহার ঘোড়া দেখল, পেট্রোলের জলে চলে, ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী। দেখে অবাক হয়ে গেলো তারা। এ পর্যন্ত তারা এ ঘোড়ার শুধু ছবিই দেখেছে, আজ সেই ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ হলো তাদের। সহালায় পৌছে তারা প্রথম রেলগাড়ি দেখল। অনেকগুলি ঘরকে সারিবদ্ধভাবে একটি কালো ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়তে দেখে কয়েক হাজার বছরের চিন্তা-ভাবনা হঠাৎ ভেঙে খানখান হয়ে গেলো। তাদের প্রাচীন মানুষের মধ্যে এক নতুন মানুষ জন্ম নিল। হঠাৎ তাদের মনে হলো, নিজেদের দেশটা কত পেছনে, কত নিচে; অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের ধুলো আর কুয়াশায় জড়িয়ে আছে। নিজের দেশে বাস করে তারা এটা অনুমান করতেও পারেনি। বইয়ে পড়ে তাদের মনে অবশ্যই একটা

অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাদের বিশেষ আস্থা ছিল না, বিশ্বাসও ছিল না। বিংশ শতাব্দীর ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু যখন পেট্রোল দিয়ে চালানো লোহার ঘোড়া দেখল, রেলের ইঞ্জিন দেখল, তখন যেন ধরাধরি করে আলমারিতে রাখতে গিয়ে চীনেমাটির একখানা বিশাল থালা হঠাৎ নিচে পড়ে ছত্রখান হয়ে গেলো, আর ওরা বিস্ময়ে আনন্দে পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্ধকার ঘর থেকে লাফ মেরে বিংশ শতাব্দীর আলোভরা উঠোনে এসে হাজির হলো।

ছেলেরা রাতের গাড়িতে সহালা স্টেশন থেকে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হলো। তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় ছাগল-ভেড়ার পালের মতো ঘেঁষাঘেষি করে বসে পড়ল তারা। কখনো গাড়ির ছাদে লাগানো বিজলিবাতির দিকে তাকায়, কখনো জানালার বাইরে ছুটে যাওয়া দৃশ্য দেখে। খুব একটা দীর্ঘ যাত্রা নয়। লরিতে ভীষণ ঝাঁকানি লাগে, কিন্তু এখন ওদের মনে হচ্ছে ওরা যেন ঘরেই বসে রয়েছে। কৃষক-পরিবার থেকে আসা অনেক ছেলের ঘর রেলগাড়ির কামরার চেয়েও ছোট, তাই তারা অবাক হয়ে কাঠের এই ঘর লক্ষ্য করছিল। গাড়ির সঙ্গে এ রকম কত ঘর রয়েছে, তাতে শত শত যাত্রী বসে আছে। এই রেলগাড়ি ব্রিটিশ সরকারের অবদান, এর কথা বইয়ে পড়েছে তারা। বাঃ বাঃ, কি মজা! ঝিক্‌ঝিক করে আর চলে!

* * *

রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছে হেডমাস্টার গোলাম সরওয়ার তাদের রাজাবাজারের লোকাল পুঞ্চ হাউসে নিয়ে গিয়ে তুললেন। এখানে প্রধান জায়গীরের দুটি অতিথিশালা রয়েছে। একটা সিভিল লাইনে, সেখানে রাজাসাহেব ও বড় বড় অফিসাররা এসে ওঠেন। অন্যটা এই রাজাবাজারের মাঝখানে, একটা পচা ক্যানভাসের ছাউনির তলায়! 'আলু নেবে গো, শালগম নেবে গো' ইত্যাদি আওয়াজ দিনভর কানে আসে। এক্কা, মোটর, গাড়িঘোড়া হরদম সশব্দে রাস্তা দিয়ে ছুটে যায়। এমন সুন্দর সুন্দর দোকান, এমন সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, চারদিকে বিজলি তার —রাতে শহরটিকে দেখে মনে হয় পরীদের রাজ্য। সবাই ধোপাকে দিয়ে কাচা কাপড় পরে, এখানে সবাই যেন রাজা। আবদুল আহম্মদ আলিকে বলল, 'ইস, কত বড় শহর! আমাদের শহর তো এর কাছে একটা গ্রামও নয়।'

আহম্মদ আলি বলল, 'তাছাড়া কি! তবে কতটুকু আর দেখেছ? আব্বা বলেন, যদি কখনো লাহোর দেখো, জীবনে ভুলতে পারবে না। এত বড় শহর না, এক মুড়ো থেকে হাঁটতে শুরু করলে আর এক মুড়োয় পৌঁছাতে দু'দিন লেগে যায়।'

'আমার তো রাওয়ালপিণ্ডি দেখেও তাই মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আব্বা বলেন, লাহোরের মতো নয়।'

'তাহলে চলো, পরীক্ষা দিয়ে লাহোর হয়ে ফিরব।'

'যাব কি করে? লাহোর অনেক দূর, ভাড়া লাগবে —টিকিট চাই!'

'কিন্তু হেডমাস্টার তো এমনিই টিকিট কিনেছেন। কেউ তো আমাদের কিছু জিজ্ঞেসও করলে না!

'আবদুল, তুমি একটা বুদ্ধু! আরে, আমরা যখন গাড়ি থেকে নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন গেটে গুনে গুনে টিকিট দিলেন —মনে নেই?'

'হ্যাঁ, তাতে আর কি! আমরা চুপিচুপি গাড়িতে উঠে বসে যাব। লাহোরের কাছাকাছি এলেই লাফিয়ে পড়ব গাড়ি থেকে।'

'এ গাড়ি তোমার পাহাড়ী খচ্চর নয় যে দৌড়নো অবস্থায় লাফিয়ে পড়বে!'

'তাহলে লাহোর দেখার কোনো উপায় নেই?'

আহম্মদ আলি আপসোস করে মাথা নেড়ে বলল, 'আব্বা আমাকেও লাহোর যাওয়ার জন্যে পয়সা দেননি —নইলে আমিও যেতাম। এখন রাওয়ালপিণ্ডি ঘুরে দেখা ছাড়া উপায় কি —আর রাওয়ালপিণ্ডিও কিছু কম নয় —তুমিও জানো!'

'কি আছে এখানে?'

'আমি, শের আলি, জগজীৎ, কাদরা, গুল্লা, মোহমত আর দাদকে বলেছি। আজ রাতে আমরা সবাই বেশ্যাপট্টিতে যাব —গান শুনতে।'

আবদুল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। আহম্মদ আলির সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলো সে। ছেলেদের মধ্যে কানাঘুষোতে সে কয়েকবার এ রকম বাজারের নাম শুনেছে। পাঞ্জাবের বড় বড় শহরে না-কি এমন বাজারও রয়েছে যেখানে আলু, গম, কাপড়, বইপত্তরের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও বিক্রী হয়। সে সব মেয়ে খুব সুন্দরী, চমৎকার কাপড়-চোপড় পরে বাজারে বসে থাকে। এ ধরনের বাজার দেখার ইচ্ছে, কে জানে কবে থেকে আবদুলের মনের গহনেও লুকিয়ে ছিল, এই মুহূর্তে হঠাৎ ফোয়ারার মতো জেগে উঠল যেন, সে জোরে আহম্মদ আলির হাত চেপে ধরল, 'আমাকেও নিয়ে চলো, আমিও সঙ্গে যাব।'

* *

রাতে বেশ্যাপট্টিতে বড় হৈ-চৈ। ফুলওয়ালারা ফুল আর ফুলের মালা বিক্রী করছে। মাতাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে পেচ্ছাব করছে। বাড়িতে বাড়িতে দাগ ও মীরের গজল চলছে। কাবাবের লঙ্কার কড়া ঝাঁজাল গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে; কোথাও-বা বড়া ভাজা হচ্ছে। এক জায়গায় একটা লোক সিঁড়িতে সিটিয়ে থাকা একটি মেয়ের চুমো নিচ্ছে। এক জায়গায় বেশ অন্ধকার, সেখানে এক ভিখেরী একজন সেপাইয়ের কানে কানে কিছু গোপন খবর জানাচ্ছে। কয়েকটি বেশ ভালো জামা-কাপড় পরা শহুরে ছেলে এইসব পাহাড়ী জংলী ছেলেদের দেখে জোরে কাসল, —'এসে গেছে পাহাড়ী উল্লুরা। পরীক্ষা দিতে এসেছে।' আহম্মদ আলি, জগজীৎ, দাদ আর আবদুল মারামারি করার জন্যে রুখে দাঁড়াল, কিন্তু কাদরা তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে থামাল। অবশেষে আহম্মদ আলি একটা বেশ ভালো বাড়ির কাছে এসে থামল। সবাই মিলে ওপরে উঠে গেলো। সেখানে একটু

বসে একটি টাকা সেলামী দিয়ে আর একটা বাড়িতে চলে গেলো। এইভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। রাত যত গভীর হয়, ততই তারা নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ছিল, সেটা ক্রমশ দূর হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই তারা শহুরে লম্পটদের মতো রীতিমতো দরদাম করতে শুরু করে। কাছে তো টাকা নেই আদপেই, তাই বাগাড়ম্বরটা বেশী, কাজের কথা কম। দু'তিন জায়গায় মার খেতে খেতে বেঁচে গেলো। আবদুল প্রথম প্রথম বেশ আগ্রহের সঙ্গে বাড়িগুলোর ভেতরে যাচ্ছিল, এমন ঝকমকে নীল আলো, এমন স্নো-পাউডার মেখে থাকা এমন টুক্‌টুকে মেয়ে সে নিজের এলাকায় কোথাও দেখেনি। মেয়েগুলির চোখ আর দাঁত কেমন ঝক্‌ঝকে, চোখের দৃষ্টিতে নিবিড় উষ্ণতা, তবু সে অস্থির হয়ে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। সে বুঝতে পারে, বেশ্যাদের অধিকাংশই এসেছে তার নিজের এলাকা থেকে। কোথাও কোথাও দু'একটা পাঞ্জাবী ও পাঠান মেয়ে হয়ত চোখে পড়ে, তবে বেশীরভাগ মেয়েই তার নিজের জন্মভূমির —এসেছে ভুতিয়া থেকে, পলন্দরী থেকে, গোরাহ্-মান্দর-হরনী-উড়ী-শ্রীনগর-মজফ্‌ফরপুর-জম্মু থেকে —যেখানে যেখানে চাষীরা অতি দরিদ্র, উপোসে দিন কাটায়, সেইসব জায়গা থেকেই এই সব বনহরিণীরা, এইসব বনবালারা নিজেদের পিত্রালয়, নিজেদের স্বামী-সন্তান, নিজেদের সঙ্গীত পরিত্যাগ করে একদানা গমের জন্যে, এক গজ কাপড়ের জন্যে, এক মুহূর্তের শান্তির জন্যে পালিয়ে এসেছে। তারা এখন এই সব বিশাল বিশাল বাড়িগুলির শোভা-সৌন্দর্য। নূরাঁ, রেশমাঁ, বেগমাঁ —এক-একটি কাব্যিক নাম সে শুনে যায়। তাদের রঙে-ঢঙে, গজলে-গানে, নতুন আদব-কায়দায় সেই কাশ্মীর-দুহিতাটিকেই তার চোখে পড়ে —যে তার মা ছিল, বোন ছিল, স্ত্রী ছিল, প্রেয়সী ছিল —কিন্তু আজ সে একজন বেশ্যা মাত্র। তার মনে দেশের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড ঘৃণা জেগে ওঠে। যারা তাদের দেশটাকে ভাগবণ্টন করে নিয়ে শাসন করছে, সেইসব পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের দেশটাকে লুটেপুটে নিয়েছে সেইসব ডোগরাদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের অগ্রগতিতে যারা বাধা সৃষ্টি করেছে, সেইসব হিন্দুদের বিরুদ্ধে তার মনে এক প্রচণ্ড আক্রোশ জন্মায়। মনে মনে ভাবে, সমস্ত দুর্গত নিপীড়িত মুসলমানদের নিয়ে সে এক বিশাল বাহিনী তৈরী করবে, যাতে সে নিজের এলাকা থেকে সমস্ত হিন্দু পাঞ্জাবী ও ডোগরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, বেছে বেছে প্রত্যেককে খুন করতে পারে ; আর এই রকম কাজেই সে তার জীবনটাকে সমর্পণ করবে। হঠাৎ তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল। ছ'সাতটা বাড়িতে যাতায়াত করেই সে নিচে বাজারে এসে দাঁড়াল। বিমর্ষ চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা লোক এসে তার কাঁধে হাত রাখল। রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'বলো না ইয়ার, সত্যি করে বলো, কাশ্মীরী মেয়ে তোমার পছন্দ তো ! —ডব্‌কা ছুকরী হলে আরও ভালো,

তাই না? ধবধবে ফরসা আর মিষ্টি-মিষ্টি —ঠিক আপেলের মতো, যেমন মিষ্টি, তেমনি দিলখোলা। আমাদের পাঞ্জাবী মেয়েরা তো দারুণ মারকুটে…'

আবদুল রাগে লোকটার হাত তার কাঁধ থেকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো। লোকটার মুখ থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

আগন্তুক মাতালটি তার অন্য হাতখানা আবদুলের কাঁধে রেখে বলল, 'সে জন্যেই তো সব জায়গায় কাশ্মীরী মেয়ে এনে রেখে দিয়েছি ইয়ার। আর ইমানদারী কথা বলতে গেলে, সস্তাও বেশ, এক টাকা দু' টাকাতেই হয়ে যায়। কিন্তু কোনো পাঠান কিংবা পাঞ্জাবী মেয়ের কাছে যাও, পাঁচ টাকার কমে কথাই বলবে না, ঠিক বলছি কি-না ইয়ার!'

আগন্তুক মাতালটি তাকে জড়িয়ে ধরল। আবদুল জোরে এক ধাক্কা মারল তাকে। মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিল। মাতালটা টলতে টলতে বলল, 'তোমাকে দেখেও তো আমার পাহাড়ী দাঁড়কাক মনে হচ্ছে! কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? নিজের বোনের দালালী করছ তাই না! কোথায় তোমার বোন?'

আবদুল তাকে এক জোর ঘুষি কষাল। আগন্তুকটা টল্‌মল করতে করতে সামলে নিল নিজেকে। দু'দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি পাঞ্জাবী পালোয়ান। কসরতের সময় এমন কত ঘুষি খেতে হয় চেলাদের কাছে —হা-হা-হা —তুই কি ভেবেছিস আমায়! পাহাড়ী দাঁড়কাক —বল তোর বোন কোথায়? তার কাছে নিয়ে চল আমায়…'

আবদুলের বাহু দুটিতে যেন একশোটি বাহুর ক্ষমতা ভর করেছে। সে পালোয়ানকে এলোপাতাড়ি তিন-চার ঘুষি কষিয়ে দেয় আর প্রত্যেক ঘুষির সঙ্গে বলে যায়, 'এই নূরাঁর জন্যে, এই রেশমাঁর জন্যে, এই বেগমাঁর জন্যে —নে, নে, নে, আর এই নে কাশ্মীরের বেইজ্জতীর জন্যে…'

পালোয়ান জোরে চিৎকার করে ওঠে, 'আরে, তুই কাশ্মীরী!'

আবদুল চিৎকার করে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি কাশ্মীরী, আমার বাপ কাশ্মীরী, আমরা দু' হাজার বছর থেকে…' কথাটা বলতে বলতে সে আর এক ঘুষি ঝাড়ে।

মোষের গায়ে ঢিল ছুঁড়লে যে রকম, ঘুষিগুলো পালোয়ানের গায়ে যেন তেমনি লেগেছে। সে পকেট থেকে একটা বোতল বের করে মুখে লাগাতে লাগাতে বলে, 'তুই কাশ্মীরী তো আমি সোলন হুইস্কি নম্বর ওয়ান!' তারপরই পালোয়ান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

* * *

দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ্যাপট্টি থেকে বেরিয়ে এল আবদুল, কিন্তু তখনও তার রাগ পড়েনি। তাই সে বেশ্যাপট্টি থেকে বেরিয়ে এসেও জোরে জোরে পা চালিয়ে এক বাজার থেকে অন্য বাজারে, এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় হেঁটে চলেছে আর

তার দু'চোখে কল্পনা ও বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন ছবি এসে জড়ো হচ্ছে, একটির সঙ্গে আর একটি গুলিয়ে যাচ্ছে, একটি আর একটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে। উঁচু আকাশচুম্বী অট্টালিকায় সে তার দেশের ঢেউ-খেলে-যাওয়া ধানক্ষেত দেখতে পায়, বাজারের হাস্যোজ্জ্বল চেহারার ওপর একটা মানুষের সাঁকো তার চোখে পড়ে। বড় কাঁচের ভেতরে সাজিয়ে রাখা রঙচঙে রেশমী কাপড়ের ওপরে সে চাবুকের দাগ লক্ষ্য করে। হোটেলে কথা বলতে বলতে খাওয়া-দাওয়া করছে যে মানুষগুলো, তাদের ওপর যেন কাগান নদী বয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবী যুবকের চড়া গলার আওয়াজে সে যেন হঠাৎ পিস্তলের গুলি চালানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সজোরে হাতের মুঠি পাকায় আবদুল। চোখ লাল করে দ্রুত পা ফেলে লোকজনের মাঝখান দিয়ে সে হেঁটে যায়।

অনেকক্ষণ তার কোনো খেয়ালই রইল না সে কোনদিকে হাঁটছে, কোথায় যাচ্ছে! ক্রমশ তার মনে হলো, যেন আলো নিভে আসছে, ভিড়-ভাড়াক্কা কমে আসছে, লোকজন-কথাবার্তা শব্দ এক এক করে তার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আর তারপর চারদিক হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো, তার মনে হলো, শহরের বাইরে একটা রাস্তা ধরে সে হাঁটছে। নিঃসঙ্গ একাকী সে, রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। শরীর শিরশির করে উঠল, আকাশের দিকে চোখ তুলে ছোট ছোট নীল তারা দেখল, তারপর হতবুদ্ধি হয়ে সাদা রঙে মাইল লেখা পাথরের ওপর বসে পড়ল সে। রাস্তার ধারে বজরার ক্ষেত, বজরার সবুজ সবুজ পাতা থেকে এক অদ্ভুত সুগন্ধ ভেসে আসছে। এই সুগন্ধ, এই স্তব্ধতা, এই একাকীত্ব তার রাগটাকে ধীরে ধীরে প্রশমিত করে দিলো, সারা শরীরে অবসাদ অনুভব করতে লাগল সে। হঠাৎ ধড়মড় করে পাথরটা থেকে উঠে দাঁড়াল, পাথরের গায়ে লেখা আছে—রাওয়ালপিণ্ডি শ্রীনগর রোড। তার ইচ্ছে করল, সে সোজা নাক বরাবর রাস্তা ধরে হেঁটে যায় শ্রীনগরের দিকে, যে দিকে তার দেশ রয়েছে, তার বানো রয়েছে, তার বোন রজ্জি রয়েছে—কোথায় তার সেই বোন! কেমন আছে সে! আছে, না নেই—কিছুই বলা যায় না। তার শুধু মনে হচ্ছে, সে ভীষণ ক্লান্ত, এই মুহূর্তে শ্রীনগরের দিকে পা বাড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পেছন ফিরে ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে শহরের দিকে সে হাঁটতে শুরু করল।

* * *

রাস্তা ভুল করে, আবার একে-ওকে রাস্তা জিজ্ঞেস করতে করতে রাজাবাজারে এসে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে গেলো তার। অতিথিশালার ভেতরে ছেলেগুলো সবাই ঘুমোচ্ছে। কয়েকজন তখনও ফেরেনি। মেঝের যেখানটায় তার বিছানা, সেখানে একটি যুবক কম্বল জড়িয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। আবদুল তাকে বেশ তেড়িয়া মেজাজে বলল, 'এখানে আমার জায়গায় বসে আছ কেন? নিজের বিছানায় যাও।'

যে লোকটা ঝিমোচ্ছিল, তার তন্দ্রা ভেঙে গেলো। অন্ধকারে তার মুখখানা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। হাত দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ভালোই হলো, তুমি এসে গেছ। আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্যে বসে আছি।'

'তুমি কে?'

'আমি তোমার দাদা—গুলাম মহম্মদ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে আবদুল। যুবকটিও কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখে তাকে। তারপর আবদুল চিনতে পেরে দাদাকে জড়িয়ে ধরল; পরম স্বস্তির আওয়াজ বেরোল তার মুখ থেকে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে তখন। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। লক্ষ্য করল, গুলাম মহম্মদের শরীরটাও তার শরীরের মতোই কাঁপছে। আবদুল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'রাজা করম আলি আব্বাকে খুন করেছে, রজ্জিকেও ধরে নিয়ে গেছে। জানিনে পুলিশের হেফাজতে এখন সে আছে কি-না! ওর সঙ্গে ফজলকেও ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ...'

গুলাম মহম্মদ বলল, 'আমি সব জানি। খবরের কাগজে দেখেছি।'

'কাগজে—এখানকার কাগজে ছেপেছে?'

'সব কাগজে নয়, কিন্তু আমাদের কাগজে ছেপেছে।'

আবদুল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল যে, 'আমাদের কাগজ' বলতে গুলাম মহম্মদ কি বলতে চাইছে, কিন্তু আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে, এতদিন পরে দাদার সঙ্গে দেখা, বিশেষত যার সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দাদা কি করে এখানে এল, কি করে খবর পেল যে সে এখানে আছে, জানতে চাইল আবদুল।

গুলাম মহম্মদ জানাল, 'ব্যাপারটা জলের মতো। আমি তোমার খবর পাচ্ছিলাম নিয়মিত। আমাদের লোকজনই সব খবর জুগিয়ে যাচ্ছিল। আমি জানতাম যে, তুমি পরীক্ষা দিতে আসছ।'

আবদুল তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি এতদিন ধরে কোথায় ছিলে?'

গুলাম মহম্মদ তাকে বিশ্বাস করে খুশী মনেই আস্তে আস্তে তার সমস্ত রাম-কাহিনী শোনাল: 'এমনিতে আমি চিরদিনই তুখোড়, তাই বাড়ি থেকে যখন পালিয়ে আসি, তখন এখানে খুব শীগ্‌গীরই একজন কাঠের ব্যবসায়ীর কাছে কাঠচেরাইয়ের কাজ পেয়ে যাই। তারপর কিছুদিন একটা কয়লার দোকানে কাজ করি। তরিতরকারীওয়ালার দোকানেও কাজ করতে হয় কিছুদিন। শেষে বিরক্ত হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ওয়াজিরাবাদ চলে যাই। যাওয়ার কথা লাহোর, কিন্তু রেলগাড়িতে বিনা টিকিটে যাচ্ছিলাম—রাস্তায় কেউ জিজ্ঞেসও করেনি, কিন্তু ওয়াজিরাবাদের কাছে এসে এক টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়ি, ওয়াজিরা-বাদ জংশনে গাড়ি থেকে নামিয়ে নেয় আমাকে। সেখানে দশ দিন হাজতে থাকার পর বিনা টিকিটে ভ্রমণ করার অপরাধে তিন মাসের জেল হয়। জেল থেকে

বেরিয়ে ওয়াজিরাবাদেই এক ছুরি-কাঁচি তৈরীর কারখানায় ঢুকে পড়ি। সে কারখানায় প্রায় দেড়শো শ্রমিক, সবাই মুসলমান। কারখানার মালিক হিন্দু, ভীষণ বড়লোক আর বেজায় গোঁড়া, আমাদের ওপর জুলুম করত খুব। আমরা একদিন কারখানায় ধর্মঘট ডাকি, পুলিশ নিয়ে সে ধর্মঘট ভাঙতে এলে আমরা ওকে মেরে মেরে আধমরা করে ফেলি। তার ফলে আবার এক বছরের জেল হয়ে গেলো আমার। তারপর আমি লাহোর চলে যাই। সেখানে তামার বাসনকোসন তৈরীর এক কারখানায় কাজ জুটে যায়। সেখানেও অধিকাংশ শ্রমিকই মুসলমান আর মালিক হিন্দু। তার সঙ্গে আমাদের প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটত। একদিন কারখানার ভেতরেই তার সঙ্গে আমার ঝগড়া বেধে গেলো, রেগে গিয়ে আমি তাকে তুলোধোনা করে ছেড়ে দিলাম। পুলিশ নিয়ে গেলো হাজতে, তারপর আদালত থেকে তিন বছরের জেল। কিন্তু সে-বারে জেলে যাওয়াটা আমার পক্ষে মঙ্গলই হয়েছিল। জেলখানায় মওলানা হবিব আহম্মদের বাবুর্চী হিসেবে লাগিয়ে দিলো আমায়। রাজনৈতিক বন্দী তিনি। প্রথম দিন তাঁকে পোড়া রুটি খাওয়ালাম, দ্বিতীয় দিন তরকারীতে নুন নেই, তৃতীয় দিন রান্নায় লঙ্কা দিতে ভুলে গেলাম —চতুর্থ দিন তিনি অন্য একজনকে বাবুর্চী রেখে আমাকে তার সহকারী হিসেবে কাজ করতে বললেন। জেলখানায় মওলানা হবিব আহম্মদের দারুণ দাপট ছিল, কারণ জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টও তাঁরই মতাবলম্বী। দু'জনেই হিন্দুদের দেখতে পারেন না, আর তারপর মওলানা সাহেব যখন আমার মনোভাব বুঝতে পারলেন, তখন তিনি আমাকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে দিলেন। তিন বছরে আমি অনেক কিছু শিখে ফেলি, এখনো পড়াশোনা চলছে। আমি এখন 'মুসলিম সেবক সঙ্ঘ'-এর সহ-সভাপতি। বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিয়ে বেড়াই। কাল সন্ধ্যায় এখানে এই রাওয়ালপিণ্ডিতেও লেকচার হবে।'

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'লেকচার কি জিনিস —আমাদের স্কুলে যেমন হয় ?'

গুলাম মহম্মদ হেসে বলল, 'না, সে অন্য জিনিস —লেকচারে কিছু গরম গরম মশলা থাকে —কিছুটা গালাগালি, কিছুটা রাজনীতি, খানিকটা নরম, খানিকটা গরম, তাতে একটু বরফ, একটু রোদ, একটু জ্যোৎস্না —ভারি অদ্ভুত জিনিস এই লেকচার। কাল তুমি শুনতে এস না, আমি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব। আর সম্ভবত কালকেই গ্রেপ্তার হতে হবে।'

'কেন ?'

'এ সব লেকচার আমরা দিয়ে থাকি কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে। আমরা একটা বিরাট আন্দোলন শুরু করতে চলেছি, ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে।'

'সে তো খুব ভালো কথা। তাহলে আমাকেও লেকচার দিতে দাও।'

'না, তুমি এখন পড়াশোনা করো, এগিয়ে যাও…'

'ম্যাট্রিকের পর কি পড়ব, আমাদের ওখানে কলেজই নেই!'

'তুমি পাঞ্জাবে চলে এস, আমি পড়াব তোমায়।'

'আমি কক্ষনো পাঞ্জাবে আসব না। এখানকার লোকে আমাদের ঘেন্না করে —দেহাতী মনে করে, জানোয়ার বলে ভাবে।'

'না, ও কথা ঠিক নয়। সব পাঞ্জাবীই এমন নয়। বিশেষ করে পাঞ্জাবী মুসলমানরা আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। এই আন্দোলনের জন্যে তারা আমাদের কয়েক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। খবরের কাগজও আমাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবির কথা লিখছে। আর ইংরেজকেও আমরা আমাদের সপক্ষে টেনে নিতে পেরেছি। তাদের খবরের কাগজ 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট'-ও কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীনতার কথা লিখেছে। এই তো গতকালই লিখেছে যে —মহারাজা সাহেবের পদত্যাগ করা উচিত।'

আবদুল খুশী হয়ে বলল, 'আরে, তাই না-কি!'

গুলাম মহম্মদ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি দেখো না, এই সব জুলুমবাজদের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে। কাশ্মীরে যদি হিন্দুর বংশ থাকে তো আমার নাম গুলাম মহম্মদ নয়।' গুলাম মহম্মদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে যেতে লাগল, 'যেখানে যাও, সেখানেই দেখবে ওরা আসন গেড়ে বসে আছে। বাজার, অফিস, সংবাদপত্র, সরকার, স্কুল, মিলিটারী —সব জায়গায় ওরা সকলের আগে। বেচারা মুসলমানদের কেউ পাত্তা দেয়?'

আবদুল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, 'সে ঠিক। আমাদের জায়গীরটাই ছ্যাখো না। বড় বড় অফিসার সবাই হিন্দু। কোথাও দু'একটা মুসলমান চোখে পড়লেও তারা কাশ্মীরের নয়, পাঞ্জাবের।'

'এতে পাঞ্জাব কাশ্মীরের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই আবদুল। এটা স্রেফ হিন্দু আর মুসলমানের ঝগড়া।'

'নেই কেন? তুমি এখানে এসে কাঠচেরাইয়ের কাজ করেছ, আর ওরা আমাদের দেশে গিয়ে মন্ত্রী বনে যায় —চোখে দেখতে পাও না দাদা!'

'তুমি কিছু জানো না। আকাট মূর্খ তুমি। পাঞ্জাবের মুসলমানদের সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে ডোগরা শাসন উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজেরও সাহায্য দরকার আমাদের —এই কথাই মওলানা হবিব আহম্মদ আমাকে বলেছিলেন, সেই জেলখানায়। কিন্তু শুনছি না-কি ইংরেজ সরকার ও আমাদের মহারাজার মধ্যে ভেতরে ভেতরে বোঝাপড়া আছে। কিন্তু ও সব বোঝাপড়া শিকেয় তোলা থাকবে। দেখে নিও, আগামী ছ'মাসের মধ্যে আমাদের পার্টি 'মুসলিম সেবক সঙ্ঘ' স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে সারা পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের সমস্ত জেলখানা ভরে ফেলবে। তার ফলে কাশ্মীরের মহারাজাকে আপনা থেকেই পদত্যাগ করতে হবে। তখন আমাদের দেশে আমাদেরই শাসন কায়েম হবে। আমাদের মুসলমানদের…'

'ইনশায়াল্লা!' আবদুল মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করল। দুই ভাই স্তব্ধ হয়ে বসে বসে অনেকক্ষণ নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তারপর এক সময় আবদুল জিজ্ঞেস করে, 'ওরা তোমায় মন্ত্রী করবে, তাই না!'

গুলাম মহম্মদ জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, আমি মন্ত্রী হব।'

'আমিও মন্ত্রী হব!'

'হতে পারো।'

'তারপর আমরা গাঁয়ে বেশ বড় দেখে একটা বাড়ি তৈরি করব। নম্বরদার, তহশিলদার আর লালা মীরাশাহের বাড়ির চেয়েও বড় বাড়ি?' আবদুল জিজ্ঞেস করে।

গুলাম মহম্মদ বলে, 'হ্যাঁ।'

'আর ধানের জমি কিনে নেব অনেক?'

'হ্যাঁ।'

'আর যখন আমরা পুঞ্চের বাজার দিয়ে হেঁটে যাব, তখন লোকে মাথা হেঁট করে সালাম করবে আমাদের?'

'কেন করবে না! না করলে শালাদের জেলে পাঠিয়ে দেবো না!'

আবদুল মৃদু হাসে। সে সজোরে গুলাম মহম্মদের হাত চেপে ধরে। জিজ্ঞেস করে, 'জেলে খুব কষ্ট হয়?'

'হ্যাঁ, হয়ই তো। জেলখানা জেলখানাই, নিজের ঘরবাড়ি তো আর নয়!'

আবদুল মৃদুকণ্ঠে বলে, 'সেটা কিছু না ···আমি সব সয়ে নিতে পারব···'

* * *

পরদিন সন্ধ্যেয় আবদুল পুঞ্চ-হাউসে আর ফিরল না। তৃতীয় দিন সকালে 'ইনক্লাব' সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লেখা ছিল—

'কাশ্মীরের সত্যাগ্রহীদের কারাবরণ'

তারপর সংবাদ ছাপা হয়েছে—

> 'মুসলিম সেবক সঙ্ঘের সভাপতি মওলানা হবিব আহম্মদ, সহ-সভাপতি মওলানা গুলাম মহম্মদ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছেন। পুলিশ জনসমাবেশের উপর লাঠি চালনা করে। জনতা 'ডোগরা সরকার মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকিলে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া লরিতে উঠাইয়া লয় ···কাশ্মীরের মুজাহিদ (ধর্মযোদ্ধা), জিন্দাবাদ··· !'

আদালত গুলাম মহম্মদকে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলো, আবদুলের হলো ছ'মাস, আর মওলানা হবিব আহম্মদের পনেরো মাস। আদালত সুপারিশ করল যে, যেহেতু অভিজাত মহলের সঙ্গে মওলানার সম্পর্ক রয়েছে এবং সমাজে তাঁর যথেষ্ট মান-মর্যাদা, সেহেতু তাঁর জন্যে কারাগারে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হোক —অন্যান্য বন্দীদের ক্ষেত্রে সাধারণ অপরাধীদের মতোই······

যে দিন রাওয়ালপিণ্ডিতে আবদুস গ্রেপ্তার হলো, সেই দিনই ওয়াজিরাবাদ, লালামুসা, লাহোর, অমৃতসর, শিয়ালকোট, জম্মু, শ্রীনগর, মরী, কোহালে, পুঞ্চ, মজফ্ফরাবাদ প্রভৃতি জায়গায় মিছিল, বেরোল, সভাসমিতি হলো, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শত শত মুসলমান কারাবরণ করল। ইংরেজ সরকারের আধা-সরকারী সংবাদপত্র 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' বড় বড় শিরোনামায় সে খবর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করল, মহারাজাকে কাশ্মীরের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তাব জানাল। হিন্দু সংবাদপত্রগুলি আন্দোলনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করল, ডোগরা সরকারের হিতার্থে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল এবং আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার জন্যে ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি জানাল। ফলশ্রুতি হলো এই, পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম সেবক সঙ্ঘের আন্দোলনে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী এসে যোগদান করতে শুরু করল। হিন্দুদের গালাগালি ক্রমাগত যতই বাড়তে লাগল, মুসলমানদের জোশও বেড়ে চলল ততই। কেবল পরবর্তী মাস তিনেকের মধ্যেই তিরিশ হাজার পাঞ্জাবী মুসলমান ডোগরা সরকারকে ধিক্কার জানাতে জানাতে জেলে গেলো।

আট

অগ্নিকুণ্ডে কাঠ ফাটছে পট্‌পট করে। ঘরের সমস্ত দরজা-জানালায় সবুজ মোটা পর্দা ঝুলছে। সেগুন কাঠের একটি সুন্দর টেবিলের সামনে এডিকং ঠাকুর নওনিহালসিং ঠাকুর মনমোহনসিং ও চৌধুরী সজ্জনদেব 'কাট্‌থ্রোট' খেলছে। মাঝে মাঝে তারা চোখ তুলে রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে। সংগ্রামসিং তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে একটি আরাম চেয়ারে বসে আছে, আরব্য উপন্যাসের একটি ইংরেজি সংস্করণে চোখ বোলাচ্ছে। বইখানির দাম দু'হাজার টাকা, পাতায় পাতায় নগ্ন নারীর সুন্দর সুন্দর ছবি! ছবিগুলি সুন্দর, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে এর চেয়েও সুন্দর সুন্দর ছবি দেখার সুযোগ হয়েছে রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের। তাই কয়েক পৃষ্ঠা উল্‌টিয়েই সে বই বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙল, পা দু'খানা ছড়িয়ে দিলো সুতপ্ত অগ্নিকুণ্ডের ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই উত্তাপ তার পায়ের ইংলিশ জুতোর তলা ভেদ করে গরম পশমী মোজার ভেতর দিয়ে কোমল ত্বক স্পর্শ করল। বেশ আরাম বোধ করল সে, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। শেষ পর্যন্ত গরমটা অসহ্য হয়ে উঠলে অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে পা সরিয়ে নিল, জানালার সবুজ পর্দা সরিয়ে বাইরের বরফ পড়ার দৃশ্য দেখতে লাগল। তারপর সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্থির চঞ্চল দৃষ্টিতে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। সময় হয়েছে, কিন্তু এখনো মলীর দেখা নেই। দূরে অন্য টেবিলের কাছে বসে বসে এডিকং তিনজনেই

তার এই অস্থির অবস্থার কথা বেশ বুঝতে পারছে কিন্তু তারা চুপচাপ তাস চালাচালি করে, মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকে চেয়ে দেখে। ব্যাপারটা এমনি বাঁকাচোরা যে, তাদের পক্ষে এ ব্যাপারে রাজকুমারকে কোনো সাহায্য করা সম্ভব নয়।

রাজকুমার সংগ্রামসিং, তস্য পিতা রাজা শানসিং, তস্য পিতা রাজা বলবানসিং, তস্য পিতা রাজা ভগবানসিং, তস্য পিতা রাজা অমুক অমুকের বংশলতিকা চার হাজার বছরের প্রাচীন। এই বংশলতিকা জীবনে মাত্র চারবার পড়া হয়ে থাকে, কারণ তা পড়তে সময় লাগে কয়েক ঘণ্টা। বংশলতিকাটি প্রথমবার পড়া হয় জন্মদিনে, তারপর বিয়ের সময়, তারপর অভিষেকের দিনে, আর শেষে মৃত্যুর পর। মৃত্যুর পর রাজা নিজেই সেই শেকলের একটি আঙটা হয়ে যায়, তাতে জায়গীরদারের সুনাম জড়িয়ে থাকে। রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের ক্ষেত্রে শুধু একবারই বংশলতিকা পড়া হয়েছে, যখন রাণী তাকে নিজের কোল থেকে দুধ খাওয়াবার জন্যে ধাত্রীর কোলে তুলে দেন। কিন্তু তখন সে জানতও না যে সে সূর্যপুত্র। পরে সে যেমন যেমন বড় হয়, চাটুকারের দল তাকে ক্রমাগত অবহিত করতে থাকে যে, সে শুধু সূর্যেরই পুত্র নয়, সারা পৃথিবীর ঈশ্বরের পুত্র। সংগ্রামসিংও সেটাকে শতকরা একশো ভাগ সত্যি বলেই মনে করে, কারণ সে জায়গীরের উত্তরাধিকারী, দেখতে সূর্যের মতোই সুন্দর তরুণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ-ধনের অধীশ্বর। আজমীরের সদর কলেজের ছাত্র। আজ পর্যন্ত কারোর হিম্মত হয়নি যে, তার কথার অন্যথা করে। তাহলে সে ঈশ্বরের পুত্র নয় কেন? ---মলী —হতচ্ছাড়ী মলীটা এখনও এল না কেন? রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের উজ্জ্বল ললাটে ক্রোধের রেখা দেখা দিলো, সে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার মোটা সবুজ পর্দার দিকে তাকাল। সেখানে মলী দাঁড়িয়ে। পায়ে চকচকে কালো শিকারী জুতো, গায়ে যোধপুরী সাদা বিরজস আর পশমের সাদা কোট। মাথায় পারীর কেরাকুলের টুপি, ঠোঁট দুটো রাঙানো, কানে হীরে। চোখে নীল ঝিলিক নিয়ে মলী —কর্নেল ডকের মেয়ে মলী দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ছোট্ট চাবুক। রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের দিকে চেয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছে।

এডিকং-রা উঠে ধীরে ধীরে তাস গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের রাশভারী সুন্দর চেহারা ফুলের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। মলী বেতস শাখার মতো দুলতে দুলতে হঠাৎ যেন উড়ে গিয়ে রাজকুমারের দুটি বাহুর মধ্যে চলে এল।

রাজকুমার তার সোনালী চুলে খেলা করতে করতে বলল, 'এত দেরী! দু'ঘণ্টা ধরে তোমার প্রতীক্ষা করছি।'

মলী হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখাচ্ছে আমায়?'

রাজকুমার একটুখানি থেমে, সচিত্র আরব্য উপন্যাসের দিকে ইশারা করে বলল, 'এ বইখানায় এ রকম একটাও ছবি নেই।'

'চলো, বাইরে যাই।'

'এই তুষারপাতের মধ্যে ?'

'হ্যাঁ, ঘোড়ায় চড়ব।' সে রাজকুমারের বাহুবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে জানালার পাল্লা খুলে দিলো। হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় বহু তুষারশীতল হিমকণা উড়ে এসে ভেতরে প্রবেশ করল। হিমকণা তার গণ্ডদেশ স্পর্শ করল, তার কেরাকুলের টুপির ওপর পড়ল, তার সাদা পশমের কোটে লাগল।

মলী ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজকুমারকে বলল, 'আজ তুষারপাতের প্রথম দিন। বেড়াতে ইচ্ছে করে না তোমার ?'

'চলো।' রাজকুমার সম্মতি জানিয়ে ঘণ্টা বাজাল। চৌধুরী সজ্জনদেব ভেতরে এল।

রাজকুমার যথেষ্ট শিষ্টাচারের সঙ্গে বলল, 'সজ্জন, আমি আর মলী একটু বেড়াতে বেরোচ্ছি।'

সজ্জনদেব জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যাবেন ?'

'কোন দিকে যাবে ?' রাজকুমার মলীকে জিজ্ঞেস করল।

মলী ঠোঁট কামড়াল। এ ধরনের কথাবার্তায় রাগ হয়ে গেলো তার। কাউকে কিচ্ছু না বলে কোথাও বেরোনোর উপায় নেই, আর গেলে, সামনে-পেছনে খানিকটা দূরে এডিকং, অশ্বারোহী আর সেপাইদের ভিড়-ভাড়াক্কা। বেড়ানোর সমস্ত মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়।

মলী বলল, 'যদি না বলে যেতে হয় তো যাব, নইলে যাব না।'

'কিন্তু মলী, এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, বলো ? এটা তো রাজকীয় প্রথা।' রাজকুমার সংগ্রামসিং ভয়ে ভয়ে বলল।

সজ্জনদেব বলল, 'আপত্তি করবেন না। কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তখন কি হবে, বলুন ?'

'কিচ্ছু হবে না। মলী টেবিলের ওপর সপাং করে চাবুক মেরে বলল, 'আমি একা যাচ্ছি। তুমি রাজকুমারকে তোমাদের গারদে আটকে রাখো।'

'গারদ !' রাজকুমার সংগ্রামসিং সবিস্ময়ে বলল।

'হ্যাঁ গো বুদ্ধু, গারদ না তো কি ! সাধারণ মানুষের মতো তুমি কোথাও যেতে পারবে না। দুশো গজ এ দিকে, দুশো গজ ও দিকে সেপাইদের খবরদারি। ও রকম বেড়ানোতে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।'

মলী আবার চাবুক ঝাড়ল। চাবুকটা টেবিলের ওপর সাপের মতো ফোঁসফোঁস করে উঠল যেন।

সজ্জন সংগ্রামসিংয়ের দিকে তাকাল, সংগ্রামসিং সজ্জনের দিকে। তারপর সংগ্রামসিং মলীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তাই হোক, একাই যাওয়া যাক।

তুমি আর আমি ···দেখো সজ্জন, কথাটা কারোর কানে তুলো না যেন। নাও, এ-বার খুশী তো, মলী!'

রাজার আস্তাবল থেকে মলী নিজের জন্যে সাদা ঘোড়াটাই বেছে নিল। সংগ্রামসিংয়ের পছন্দ 'রূপক' নামের সেই কালো মাদী ঘোড়াটাই। মলী ঘোড়ায় মেয়েদের জিন আটকে নিল, তারপর লোকে যেমন উঁচু সোফায় উঠে বসে, ঠিক তেমনি করে সে তড়াক করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। তাই দেখে মৃদু হাসল সংগ্রামসিং। তারপর ওরা দু'জনেই ঘোড়ার পেটে এড়ী মারল। ঘোড়া দুল্‌কি চালে আস্তাবলের মাঠ পেরিয়ে রেসিডেন্সির দিকে রওনা হলো। ধীরে ধীরে একসঙ্গে যেতে যেতে রাজকুমার মলীর হাত নিজের হাতে তুলে নিল। চমৎকার পশমী কোটের ভেতরে মলীর চেহারাটা কি রকম ছোটখাটো দেখাচ্ছে—ঠিক একটা পুতুলের মতো। সাদা ঘোড়া, সাদা জামা, সাদা কোট, সাদা বরফ—আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো এই শুভ্রতার মধ্যে পরস্পর হাত ধরে দুল্‌কি চালে ঘোড়ায় চড়ে যেতে কত ভালো লাগছে! মলী অন্যান্য মেয়ের থেকে কেমন আলাদা—রাজকুমার মনে মনে ভাবল। এমন মেয়ে তার জীবনে কখনও আসেনি। মাটির তাল নয়, যেন অগ্নিশিখা। বহু মেয়েই ভেড়ার মতো তার শয়নকক্ষে এসেছে, আবার ভেড়ার মতোই মাথা হেঁট করে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে। অনেক মেয়ে কয়েক মুহূর্ত দোটানা-দোমনা ভাব দেখিয়েছে, এক-আধটু ছল-চাতুরি করেছে—চালাকির সঙ্গে তার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ছল-চাতুরি ভেঙে গেছে। সেই সব ছল-চাতুরি রঙ-ঢঙের পেছনে কিছুই না—সেই ভেড়া মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজকুমার বুঝে ফেলেছে সব, তার জীবনের অভিজ্ঞতাই হলো এই যে, পুরুষেরা পুরুষই, মেয়েরা ভেড়া। পুরুষেরা হুকুম করে, মেয়েরা হুকুম মেনে চলে। তা সে-মেয়ে কোনো জায়গীরদারের উঁচু পরিবারেরই হোক কিংবা গ্রামের কোনো চাষীর মেয়েই হোক। মেয়ে আর ভেড়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কোনো কোনো কেতাবে সে প্রেমের কথা পড়েছে, কিন্তু সে-প্রেম চোখে দেখেনি। কখনো কখনো রাজকুমার নিজেও প্রেম করার চেষ্টা করেছে। যার সঙ্গে তার প্রেম, সামনের সেই মেয়েটি তাকে অবাধে প্রেম করার অনুমতি দিয়েছে। রাজকুমারের প্রায়ই মনে হয়, সেই প্রেমও বলতে গেলে এক তরফা জয়লাভ, যেন আদালতের ডিক্রি, সেই ডিক্রি দিয়ে প্রেম লাভ করা যায় না, প্রেম ক্রোক করতে হয়। সে তার প্রেমিকার চোখের দৃষ্টিতে উঁকি মেরে মেরে তার ভেতরটা দেখে, খুব গভীরে প্রবেশ করলে বুঝতে পারে, সেখানে নির্জন পতিত সমতল প্রান্তর, মধ্যিখানে একটি ভেড়া মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন হতাশ হয়ে সেখান থেকে সে ফিরে আসে। তারপর তার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে, প্রেম এক বিভ্রান্তি, এক মরীচিকা, এক প্রবঞ্চনা। আসলে প্রেম কোথাও নেই, রয়েছে শুধু কামশাস্ত্র।

কিন্তু মলী আসার পর রাজকুমারের সেই বিশ্বাসে চিড় ধরে, তার সংশয় সন্দেহ বদলাতে শুরু করে। তাহলে এমন মেয়েও সম্ভব, যে সত্যি সত্যি হুকুম মানে না; যে সমানাধিকারের শুধু দাবিই করে না, যথার্থই সমান যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়ায়। যার দৃষ্টিতে রাজকুমার সংগ্রামসিং কেবল সংগ্রামসিং, রাজকুমার অনেক দূরে; যে বন্ধুর মতো আলাপ করতে পারে, শত্রুর মতো লড়াই করতে পারে, আবার প্রেমিকার মতো মধুর হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু মলীর কব্জিতে দারুণ জোর, সংগ্রামসিং যার পরিচয় পেয়েছে। ভেড়াদের দলে সে নয়—নিঃশঙ্ক নির্ভীক নারীদের দলে, যারা কমনীয় হওয়া সত্বেও নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। সংগ্রামসিং বহু কামশাস্ত্র পড়েছে, কিন্তু তার মনে হচ্ছে, সেই সব কামশাস্ত্র শুধু ভেড়াদের জন্যেই লেখা হয়েছে, নারীর জন্যে নয়। মলী সেই নারী, যার বিদ্যুতের মতো প্রখর ও ছিপছিপে শরীর দেখে সেই সময়কালকে অনুমান করা যায়, যে সময়ে রেলইঞ্জিনের সিটি, মোটর গাড়ির গতি ও উড়োজাহাজের ডানা মেলে দেওয়া শুরু হয়েছে, এমন নারীকে বশীভূত করা রাজকুমারের পক্ষে সত্যিই কঠিন। সে বুঝেছে, এখানে কামশাস্ত্র-পণ্ডিতের তত্ত্ব বেকার—যেন গরুর গাড়ি উড়োজাহাজের সঙ্গে প্রেম করতে চলেছে। তাছাড়া তার মনে হয়েছে, মলীর দৃষ্টিতে অগ্নিশিখা রয়েছে, ফুলও রয়েছে; মুক্তা রয়েছে, অশ্রুও রয়েছে; হাসি আছে, তুষারও আছে। কিন্তু কোথাও ভেড়া নেই। এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের শরীর থেকে রাজপুত্রের প্রতাপ খসে পড়েছে, একটা সাধারণ মানুষের পোশাকে মলীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার বুক এমন ঢিপ্‌ঢিপ করে উঠেছে যা আগে কখনও হয়নি। নিজের অসহায়তায় তার চোখ ফেটে জল বেরিয়েছে, তবু মলী রাজী হয়নি। মলী তার সঙ্গে নেচেছে, বেড়িয়েছে, খেলাধুলা করেছে, লাফ-ঝাঁপ করেছে, তার দু'বাহুর মধ্যে ধরা দিয়েছে, কিন্তু বারবার বেরিয়ে গেছে। প্রতিবার বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার তাজা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ঠোঁটে বিদ্রূপ ছড়িয়ে পড়ে, যা দেখে সংগ্রামসিং একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এই বিদ্রূপের কি দরকার?

কিন্তু আজ মলীর ঠোঁটে বিদ্রূপ নেই। আজ মলী তার হাতে হাত দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চুপচাপ তুষারপাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে। সামনে রাস্তাটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। চারদিকে স্তব্ধতা। কোনো পাখি ডাকে না, কোনো লোক রাস্তায় যাতায়াত করে না, বাতাসও নীরব। বাড়িঘরের দরজা বন্ধ। নদীর জলতরঙ্গের শব্দ কানে আসে না। রেসিডেন্সির বাইরে সেপাইরাও আজ ডিউটিতে নেই। তারা দু'জন ছাড়া এডিকং নেই, নেই গোয়েন্দা বাহিনীর কোনো গুপ্তচর। মলীর কোটে বরফের গুঁড়ো স্তরের পর স্তর জমে উঠছে। সংগ্রামসিং হাত দিয়ে এক ঝটকায় মলীর মাথা থেকে বরফ ঝেড়ে দিলো। কোটের কলার বেয়ে বরফ ঝর্‌ঝর করে ঘোড়ার পিঠের অয়েল ক্লথে গিয়ে পড়ল। মলী হেসে অয়েল ক্লথে থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'একেবারে আমাদের আয়ারল্যাণ্ডের মতো!'

সংগ্রামসিং চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'রাজাসাহেব বিলেত যেতে দেন না। প্রতি বছর 'না' করে দিচ্ছেন।'

'এই রাজার গারদ থেকে যদি কখনো বেরিয়ে পড়ো তো বুঝতে পারবে, দুনিয়াটা কেমন।'

'আমি তো তোমাকে ছাড়া কিছুই চাইনে।'

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রামসিং কথাগুলি জোর দিয়ে উচ্চারণ করল যে, তার প্রতি মলী সত্যিই ভালোবাসা বোধ করল। পারিষদেরা রাজকুমারকে যথেষ্ট উন্মার্গগামী করে তুলেছিল, সে কথাটা মলী ভালো করেই জানে। কিন্তু সে যখন থেকে তার সঙ্গে বেড়াতে শুরু করেছে, তখন থেকেই সংগ্রামের চোখের দৃষ্টিতে, গলার স্বরে, চিন্তা-ভাবনায় এক আশ্চর্য অস্থিরতা ও পরিবর্তন অনুভব করছে। তার এখন মনে হয় যে সংগ্রাম বদলাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ কুঠরি থেকে আলোয় বেরিয়ে আসছে।

রেসিডেন্সি পার হয়ে এসেও মলী তার কোনো কথার জবাব দেয়নি। মন্ত্রী মহাশয়ের বাংলোর সামনে দিয়েও চুপচাপ চলে গেলো তারা। পাহাড়ের গায়ে কিছুটা ওপরে বাংলোটা অবস্থিত। নিচে দিয়ে রাস্তা গেছে। ঢালুর ধারে একটি ঝরণা। নিঃশব্দে পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে বরফাচ্ছন্ন মাঠে হারিয়ে গেছে। মলী ঘোড়া থামাল।

সংগ্রামসিং জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

মলী বলল, 'ঝরণা দেখে তেষ্টা পেয়েছে আমার।'

'এই তুষারপাতে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখানকার জল খাবে কি করে? এটা তো ঝীওরদের ঝরণা। বড় নোংরা লোকেরা এখান থেকে জল নিয়ে যায়।'

'তুমি কি করে জানলে যে এটা ঝীওরদের ঝরণা?'

সংগ্রামসিংয়ের মনে পড়ল, একবার সে এখানে একটি খুব সুন্দরী মেয়েকে—ঝীওরদের মেয়েকে যেতে দেখে। তাকে দেখার জন্যে সে কয়েকবার এখান দিয়ে যাতায়াত করে। তারপর একদিন যখন সে মেয়েটিও ভেড়া হয়ে গেলো, তখন সে এখানকার রাস্তা ছেড়ে দেয়। আজ বহুদিন পরে সে এখানে এল। কিন্তু রহস্যটি মলীর কাছে প্রকাশ করতে পারল না। নিজের অতীত দিনগুলির জন্যে এখন সে লজ্জা বোধ করে, যেন সে আবর্জনায় খেলে বেড়িয়েছে। সে মলীর প্রশ্ন এড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এখানকার জল খাওয়া নিষেধ। চলো, মহলে যাই। সেখানে রাজবাড়ির ঝরণা থেকে জল আসে।'

মলী একগুঁয়ের মতো বলল, 'আমি এই ঝরণারই জল খাব, সেইসঙ্গে তোমাকেও খাওয়াব।'

'কথা শোনো, জিদ কোরো না।'

'তুমি ঘোড়া থেকে নামবে, না চাবুক লাগাব?'

রাজকুমার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'কিন্তু কি করে জল খাব? পাত্র-টাত্র তো কিছু নেই!'

'নেই তো ঘোড়ার মতো করে জল খাব, জলে মুখ দিয়ে —চোঁ চোঁ করে!'

'না-না, কেউ দেখে ফেলবে।'

'কে দেখবে? যে দেখতে চায় তাকে ডেকে আনো! সংসারকে এত ভয়! এই ভয় দিয়েই কি দুনিয়াতে শাসন চালাও? রাজার ছেলে ঘোড়ার মতো জল খায়! সেটা ছেড়ে দিলেও, তোমার ভয়-টয় ঘুচে যাবেই, তাতে তুমি যতই তীর-ধনুক চালাও না কেন! তীর-ধনুক আর লাঠি নিয়ে তড়পানোর দিনকাল চলে গেছে। আমায় গ্যাখো, আমি কর্নেলের মেয়ে। কিন্তু যে আজ কর্নেল, পঞ্চাশ বছর আগে সে ছিল মুচি। বুঝেছ! আমি মুচির মেয়ে। আমায় দেখে সত্যি করে বলো তো, তোমাদের রাণীদের মধ্যে কেউ কি এই মুচির মেয়ের চেয়ে বেশী সুন্দরী?'

সংগ্রামসিং মল্লীর দিকে তাকাল, তার চোখের কটাক্ষ, চুলের ঢেউ, পোশাকের নতুনত্ব এবং তার কণ্ঠস্বরের বলিষ্ঠতার মধ্যে এমন এক দৃঢ়তা লক্ষ্য করল, যা এখানকার কোনো নারীর মধ্যে চোখে পড়ে না। ভয়ে ভয়ে বলল, 'বলতে পারছিনে। আমার কাছে তুমি একেবারে নতুন। এমন নতুনত্ব আমি কখনও দেখিনি। যেন আমায় অস্থির করে তোলার জন্যে তুমি অন্য কোনো জগৎ থেকে এখানে উড়ে এসেছ। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, তুমি এখান থেকে উড়তে উড়তে আবার ফিরে যাও।'

'তাই হবে।'

'না-না, আমার কথার মানে কিন্তু তা নয়।'

'বেশ বেশ, আমি তোমার ও সব মানে-টানে বুঝি। এখন আমায় জল খাওয়াও।'

'কি করে খাওয়াই?' —সংগ্রামসিং বিমূঢ় হয়ে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলো তার মাথায়। সে ঝরণার কাছে এগিয়ে গিয়ে আঁজলা ভরে জল তুলল। মল্লী মুখ বাড়িয়ে তার হাতের আঁজলায় ঠোঁট স্পর্শ করল। আঙুলে মল্লীর ঠোঁটের স্পর্শ লাগতেই সংগ্রামের মনে হলো যেন তার শরীরের শিরায় শিরায় তড়িৎ বয়ে যাচ্ছে। হাত কাঁপতে কাঁপতে জল উছলে পড়ল। মল্লী দুষ্টুমি চোখে সংগ্রামের দিকে চেয়ে তার আঁজলা খালি করে দিলো। সংগ্রাম আবার আঁজলা ভরে জল আনল। তৃতীয়বার, চতুর্থবার। যে দিন সে শ্যাম্পেনের পেয়ালা মল্লীর হাতে প্রথম তুলে দিয়েছিল সে দিন সে এত আনন্দ পায়নি। যে দিন সে মল্লীকে হীরের হার উপহার দিয়েছিল সে দিনও তার এত ভালো

লাগেনি —এমন পবিত্র আনন্দ অনুভব করেনি। আজ যেন তার আঁজলায় ঝরণার প্রতিবিন্দু জল গুনগুন করে প্রেমের গান গাইছে, প্রেমের লক্ষ লক্ষ ঝিল্‌মিলে ঢেউ যেন তার আঙুল স্পর্শ করতে করতে ঠোঁটে গিয়ে হাজির হচ্ছে। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁটের স্পর্শ তো শতবার পেয়েছে, কিন্তু আঙুলে এমন ঠোঁটের স্পর্শ কখনও পায়নি, যার প্রতি স্পর্শে হাজার হাজার চুম্বন লুকিয়ে থাকে। তার ইচ্ছে করে, মলী যেন চিরকাল এভাবেই জল পান করে, এই ঝরণা চিরকাল এমনি বয়ে যায়, এই রকম চিরকাল বরফ পড়ে, এ আনন্দ যেন চিরকাল অটুট থাকে। কিন্তু পঞ্চম আঁজলার পর মলী সরে গেলো, তার দিকে চেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? তোমার কপালে ঘাম! গরম লাগছে?'

সংগ্রাম জবাব দিলো, 'আমারও তেষ্টা পেয়েছে।'

'বেশ তো, আমি তোমায় আঁজলা করে জল খাওয়াচ্ছি।'

'না-না।' সংগ্রামসিং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

তারপর সে ঘোড়ার মতো ঝরণার জলে চুমুক দিলো।

মলী হেসে কুটি কুটি।

ধীরে ধীরে তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে রূপোর গাছপালা। সামনে পুরনো দুর্গ, তার ছাদ-কার্নিস-মিনার সমস্ত বরফে বরফে রূপো হয়ে গেছে। উঁচু টিলার ওপর পুরনো দুর্গটা যেন ঘুমিয়ে আছে। দুর্গ-তোরণের কাছে লোহার কামান, সেটাও যেন বরফের ওয়াড়ে ঢাকা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সংগ্রাম ও মলী যেন বেড়াতে বেড়াতে এক অজানা পরীর দেশে এসে হাজির হয়েছে। মলী আস্তে আস্তে ঘোড়ার গতিবেগ কমিয়ে আনল। তারপর দুর্গের কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে বলল, 'কি চমৎকার দুর্গ! ঠিক আইরিশ বলে মনে হয়।'

রাজকুমার চুপ করে থাকে। তার শরীরে রোমাঞ্চ লাগে। এটা তাদের নিজেদের দুর্গ, তার বাপ-ঠাকুর্দার আমলের। তার আগে এই দুর্গে মুসলমান রাজা বাস করত। তাদের পরাজিত করে তার পূর্বপুরুষেরা দুর্গটিকে অধিকার করে। মুসলমান রাজাদের আগে এখানে কে বাস করত কে জানে? হয়ত আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে কোনো একদিন এই রকমই, আজকের মতোই, বরফ পড়ছিল। চারদিকে এই রকমই দৃশ্য। কেউ ধীরে ধীরে ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমারীর সঙ্গে এখানে এসেছিল। সে নিজেদের দুর্গটাকে দেখেছিল, নিজেদের জায়গীর দেখেছিল। তারপর রাজকুমারীর হাত ধরে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমার রাণী হবে?'

অবশেষে সংগ্রামসিংই সেটা জিজ্ঞেস করে বসল।

মলী বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে তার সামনে তর্জনী নাচাতে নাচাতে বলল, 'কোনো রাজকুমারকে বাদ দিয়ে এক মুচিকে বিয়ে করব, সেটা বরং ভালো।'

'কেন?' অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সংগ্রামসিং।

কিন্তু মলী সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। সে ফোয়ারা-শোভিত

বাগানের পথে ঘোড়া ছোটাল। রাজকুমার পেছনে পেছনে তাকে অনুসরণ করল। বরফে ঘোড়া দৌড়ানো বিপজ্জনক। এমন বিপজ্জনক যে, ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার উভয়েরই প্রাণসংশয় দেখা দিতে পারে। সে মলীকে চিৎকার করে নিষেধ করতে লাগল, কিন্তু মলীর মাথায় যেন ভূত চেপেছে। কোনো কথা শুনল না, বরং ঘোড়ার দুল্‌কি চাল আরও বাড়িয়ে দিলো। তারপর ঘোড়াটাকে প্রাণপণ ছুটিয়ে সে সংগ্রামসিংয়ের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলো। পাগলী মেয়ে! সংগ্রামসিং মনে মনে ভাবল। কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই। সে-ও তার ঘোড়াটাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাল। মলী সামনে দিয়ে গেছে। ফোয়ারা-শোভিত বাগানে ডাইনে-বাঁয়ে বরফাবৃত গাছের ডালপালা, রূপোর পাতের মতো ঝক্‌মক করতে করতে চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। অনেক উঁচুতে ওঠা হাস্যোজ্জ্বল জলের ফোয়ারা চোখে পড়ছে, আবার চোখের আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে। গণেশজীর মন্দিরের বিশাল দরজা, দেবতাদের চিত্র খোদাই করা, তীরের মতো পেরিয়ে গেলো। দু'জন বিস্ময়-বিমূঢ় সেপাইকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সংগ্রামসিং, কিন্তু ভাববার অবকাশ নেই। সামনে মলী যাচ্ছে। সাদা ঘোড়াটা খুব তেজী, কিন্তু রূপকও দৌড়তে দৌড়তে তার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। তবু মলী থামল না। রাশ ঢিলে করে দিয়ে সামনে ক্রমাগত এগিয়ে চলল। সাঁকো পেরিয়ে গেলো, টক ডালিমের ঝোপ পেরিয়ে গেলো। একটু আগে ডুমুর গাছে ঘেরা একটি স্বচ্ছ জলের পুষ্করিণী। পুষ্করিণীতে জল থাকে, কিন্তু এখন সারা পুষ্করিণীটা বরফে ঢাকা। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে বরফ। দেখেই মলী ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। রাজকুমারও নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। সংগ্রামসিং লক্ষ্য করল যে, মলী তার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে আটকানো স্কেট্‌স (skates) খুলছে। সংগ্রামসিং বলল, 'করছ কি ? এটা রিক নয়। যদি কোথাও বরফ ভালো করে না জমে থাকে, তাহলে জলে গিয়ে পড়বে।'

কিন্তু মলী তার কথার কোনো জবাব দিলো না। স্কেট্‌স পরে পুষ্করিণীর বরফের ওপর নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে কোটের বোতাম খুলে দিলো।

সাদা টুপি, সাদা কোট, সাদা বিরজস, বিরজসের নিচে ঝক্‌ঝকে স্কেট্‌স। বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, ঘুরতে ঘুরতে পেছন ফেরে, পেছন ফিরে আবার ঘুরতে থাকে। হঠাৎ মলী যেন বরফের ফুল হয়ে গেছে, আকাশে দিগন্তে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে স্তূপীকৃত বরফে বরফে নেচে বেড়াচ্ছে। মলী নাচতে নাচতে তাকে বলল, 'গ্যাখো, এটা ইণ্টারমেজো ! —এখানে সঙ্গীত নেই, তবু তোমায় দেখাচ্ছি। এই গ্যাখো ইণ্টারমেজো নাচ।' সে যেন তার কথাকেই বাস্তবে রূপায়িত করে চলল। ফুলে-ভরা শাখার মতো তার পা দু'খানি শূন্যে ভাসতে ভাসতে কাঁপতে কাঁপতে আবার বরফ স্পর্শ করে। সংগ্রাম ভাবে, সত্যিই ইণ্টারমেজো। এখানে সঙ্গীত নেই, তবু সঙ্গীত রয়েছে যেন। আকাশের পিয়ানো, ধরিত্রীর ঢোলক,

নর্তকীর পায়ে পায়রার পালক। এই হলো ইণ্টারমেজো! হাত দু'খানি রাজহংসের ডানার মতো ছড়িয়ে, এক পায়ে তীরের মতো শূন্যে ভাসতে ভাসতে, অন্য পায়ে বরফের ওপর বৃত্ত রচনা করতে করতে, অস্তগামী সূর্যের দিকে উড়তে উড়তে, পাখির উড়ে যাওয়া দেখাতে দেখাতে, তার সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে ওপরে নিচে ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। এই তীরের মতো সাঁ-সাঁ করে চলে গেলো, আবার কখনো অগ্নিশিখার মতো ধূ-ধূ করতে করতে, আচম্‌কা হাসির মতো ছড়িয়ে পড়ল। অজস্র রেখার ভেতরে রামধনু, রামধনুর ভেতরে বৃত্ত, বৃত্তের ভেতরে ফুল। ফুল নাচতে নাচতে নিজের মধ্যেই হারিয়ে যায়। হঠাৎ সংগ্রামসিং দেখে যে স্কেট্‌স পরা অবস্থায় মলী তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

মলী জিজ্ঞেস করল, 'বুঝলে কিছু?'

সংগ্রামসিং উত্তর দিলো, 'বুঝলাম।'

'কি বুঝলে?'

'এটা ইণ্টারমেজো।'

মলী ঝাঁজালো গলায় বলল, 'কিছু বোঝোনি। এটা ইণ্টারমেজো নয়। এ হলো জীবন-সঙ্গীত, যৌবন-নৃত্য, প্রেমের জ্বালা। চার হাজার বছর, বলতে কি, তারও হাজার হাজার বছর আগে থেকে এখানে বরফ পড়ছে—এই জায়গায়, এইসব ডুমুরগাছে ঘেরা পুষ্করিণীতে, এই সাফ-সুতরো সমতল মাটির ওপর। তুমি কখনো ইণ্টারমেজো নাচ দেখেছ, নিজে নেচেছ কোনোদিন? কাউকে এই নাচের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছ? চার হাজার বছর ধরে কি করছ তুমি? না, ঘোড়া দৌড় করাচ্ছ, মানুষকে শোষণ করছ আর ভেড়ার লোম কামাচ্ছ! কখনো কি চোখ তুলে দেখেছ, বরফ কত উজ্জ্বল, আকাশ কত কাছে, ভালোবাসা কত সুন্দর! আর তুমি কি-না আমায় জিজ্ঞেস করো, তোমায় বিয়ে না করে আমি একজন আইরিশ মুচিকে বিয়ে করব কেন?'

ইণ্টারমেজো?

সংগ্রামের মুখখানা যেন ঝল্‌সে গেলো—যেন অগ্নিতপ্ত লু লেগেছে তাতে। সে তাকাল মলীর দিকে, তার অসাধারণ লাল ঠোঁট দুটোর দিকে, ক্রুদ্ধ চোখের দিকে, আঙারের মতো তপ্ত গণ্ডদেশের দিকে···

ইণ্টারমেজো!

সংগ্রামসিং মাথা নিচু করল। ধীরে ধীরে নিজের লং-বুট পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর হেসে মলীকে বলল, 'তুমি আমার জন্যে ঐ যে স্কেট্‌স এনেছ ওটা নিয়ে এস। আমায় দাও, আমি পায়ে পরে নিই।'

তারপর সে তার জবাবের প্রতীক্ষা না করে নিজেই ঘোড়ার জিন থেকে স্কেট্‌স জোড়া খুলে নিয়ে পায়ে পরে ফেলল। স্কেট্‌স পরে দাঁড়িয়ে হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিলো সে।

মলী মুচকি হেসে সংগ্রামের হাত ধরল।

সংগ্রাম বলল, 'না, ইণ্টারমেজো নয়, সিম্ফনি নয় এ বার একটা হাল্‌কা নাচ হয়ে যাক —হাল্‌কা নাচ একটা।' সংগ্রাম আদরের গলায় খুব মৃদুস্বরে কথাগুলি বলল। সে একটা হাত রাখল মলীর কোমরে, অন্য হাত মলীর হাতে।

মলী বলল, 'আমি তোমায় খুব ভালো নাচ শেখাব, কারণ তোমার পা আজ চার হাজার বছর পরে নাচতে উদ্যত হয়েছে। সে জন্যে খুব হাল্‌কা নাচ হবে—যেন এক প্রজাপতি এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে।'

সংগ্রাম থমকে দাঁড়াল। বলল, 'না, ঠিক যেন একটি প্রজাপতি একটি ফুলের ওপরেই নেচে চলেছে।'

মলী মৃদু হাসল। সংগ্রামের কথাটি ভারি চমৎকার। ওরা দু'জনে নাচতে শুরু করল। চারিদিকে বরফ পড়ছে। ডুমুর গাছের নিচে সাদা ঘোড়াটি ঘাড উঁচু করে কালো মাদী ঘোড়াটার দিকে চেয়ে চিঁ-হি-হি করে ডাক দিলো…

* * *

রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের সঙ্গে মলী বেড়াতে চলে গেলে এক অদ্ভুত ধরনের অস্থিরতা বোধ করতে লাগল সজ্জনদেব। ঠাকুর মনমোহনসিং ও নওনিহালসিংয়ের সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে বুদ্ধুর মতো গোঁয়াতুমিতে পেয়ে বসল তাকে। বাজি ধরার ব্যাপারে এমন বেপরোয়া ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল যে, তাতে নওনিহালসিং ও মনমোহনসিং বেশ মজা উপভোগ করতে লাগল। ওরা এর কারণ জানত। কারণ সজ্জনদেবও জানত। সে এটাও জানত যে, মলী রাজকুমারের জন্যেই এসেছিল, রাজকুমারের সঙ্গেই যাওয়ার কথা, রাজকুমারের সঙ্গেই গেছে। সব কিছু জেনেশুনেও তবু সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই তাস ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর মনমোহনসিং ও নওনিহালসিং হাসতে শুরু করল। সজ্জনদেব 'কাশ্মীর টাইম্‌স'-এ চোখ বোলাতে লাগল। পাঞ্জাবে চল্লিশ হাজার 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' কারাবরণ করেছে। কাশ্মীর আন্দোলন 'পাঞ্জাবে' সুতীব্র। এখানে এই দেশীও রাজ্যেও উত্তেজনার আগুন স্পর্শ করছে। জায়গায় জায়গায় সভা হচ্ছে, বেধড়ক কারাবরণ চলছে। কিন্তু 'কাশ্মীর টাইম্‌স'-এ সে কথাটা নেহাৎ-ই অবহেলাভরে ছাপা হয়েছে শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমে। সজ্জনদেব কাগজটাকে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। মলী ও রাজকুমার এই তুষারপাতের মধ্যে কোথায় গেলো? মনের মধ্যে চিন্তাটা যেন আগুনের মতো ধু-ধু করছে। সে তার অস্থির অবস্থাটা আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। পাৎলুনের পকেটে হাত পুরে নরম গালচের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল সে।

ঠাকুর মনমোহনসিং খবরের কাগজটা দিয়ে পাখা তৈরি করতে করতে ঠাট্টা করে বলল, 'আঃ, কি গরম, সজ্জনদেব! বরফ পড়ছে, তা সত্ত্বেও কেমন গরম লাগছে দেখেছ!'

সজ্জনদেব কোনো জবাব দিলো না। নওনিহালসিং বলল, 'কাশ্মীরের আবহাওয়া বেচারা সজ্জনদেবের কিছুতেই গা-সওয়া হলো না। ছ' মাস বরফ, তিন মাস পাতা-ঝরা, স্রেফ তিন মাস বসন্ত। আর সে-বসন্তও যদি অন্যেরা লুটেপুটে নেয় তো ক্রিকেট-ক্লাবের ঠাকুর কি সেটা সইতে পারে?'

মনমোহন হেসে ফেলল। সজ্জন ওদের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল।

মনমোহন বলল, 'চাকরি-বাকরি যারা করে, তারা যে রাজকুমারের সমকক্ষ নয়, এটা সজ্জনদেব কিছুতেই বুঝতে পারে না। লাহোরের ক্রিকেট-ক্লাবের কথা এক রকম, জায়গীরের রাজদরবারের ব্যাপার অন্য রকম। গভর্নমেণ্ট কলেজে পড়াশোনা করা বিখ্যাত খেলোয়াড় লাহোর ক্রিকেট-ক্লাবে আমাদের রাজকুমারের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু রাজদরবারে বল ক্রিকেট ব্যাট —সবই রাজাজীর হাতে। হিট করলেও রাজাজী, বল করলেও রাজাজী। হার তোমার, জিৎ রাজার। এ রকম খেলা খেলতে হলে কলজে বড় হওয়া চাই।'

সজ্জনদেব হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে খেলা খেলে লাভ কি?'

নওনিহাল বলল, 'দরবারে জায়গা পাওয়া যায়, মাসে পাঁচশো টাকা তনখা পাওয়া যায়, দেবতাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়ার সুযোগ ঘটে। রাতে জোটে মদ আর মেয়ে ···আর —আর কি চাই?'

'ঝুটা খাবার, ঝুটা মদ, ঝুটা মেয়ে।'

মনমোহন বলল, 'অপরপক্ষে, তুমিই বা কি এমন? এক সাদামাটা বি. এ., ক্রিকেট খেলোয়াড়। বড় কষ্টে রেলের কয়েদখানা থেকে একটা চুনোপুঁটি আসামী মেয়ে তোমার জুটতে পারে। রাজকুমারের কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাও। কিন্তু উল্‌টে তুমি নিমকহারামি করছ, রাজকুমারের প্রণয়ে পাল্লা দিতে যাচ্ছ!'

'প্রণয়ে কি সমান অধিকার থাকতে পারে না?'

নওনিহালসিং বিরক্তি প্রকাশ করল, 'তুমি কি কানা হয়েছ, সজ্জন? মলী হলো আমাদের মনিবের মনিবানী, আর তুমি ভৃত্যস্য ভৃত্য। তা সত্ত্বেও তুমি কি ভেবে···'

সজ্জন তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'খেলা উল্‌টে যাবে, মানুষে মানুষে সমান হয়ে যাবে। প্রণয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, খেলাধূলায়, কাজেকর্মে···'

'ওটা বাস্তবতা নয়, কাব্য। মানুষে মানুষে কখনও সমান হয় না।'

নওনিহালসিং বলল, 'হ্যাঁ। মানুষে মানুষে সমান হয়, কিন্তু মানুষে জানোয়ারে সমান হয় না। আমাদের প্রজা তো জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। ওদের কাপড়-চোপড় ছ্যাখো, ঘরবাড়ি ছ্যাখো, যেমন আকাট মুখ্যু, তেমনি চালচলন, কথা বলার ঢঙ। ওদের চেয়ে জঙ্গলের জানোয়ারেরও বেশী বোধবুদ্ধি আছে। তুমি কি ভেবেছ যে মলী কখনও একটা কাশ্মীরী গেঁয়ো ভূতকে ভালোবাসতে পারে?'

সজ্জন জবাব দিলো, 'না।'

'তাহলে তোমাকেও ভালোবাসতে পারে না। তোমাতে আর গেঁয়ো ভূতের মধ্যে যেমন তফাৎ আছে, তেমনি তোমাতে আর রাজকুমারের মধ্যেও তফাৎ।'

'কোন দিক দিয়ে?'

'টাকা-পয়সার দিক দিয়ে।'

'টাকা!' সজ্জনদেব চুপ মেরে গেলো।

মনমোহন বলল, 'হ্যাঁ, টাকা আর পদমর্যাদা। সে সূর্যের সন্তান, তুমি মানুষের সন্তান। তার চার হাজার বছরের প্রাচীন বংশলতিকা আছে, আর তুমি তো জানোই না তোমার ঠাকুদার ঠাকুরদা কোত্থেকে এসেছিল। ওরা চার হাজার বছর ধরে শাসন চালিয়ে আসছে, আর তোমরা চার হাজার বছর ধরে হুকুম পালন করে আসছ। আজ তুমি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও, কিন্তু ও রকম বেয়াড়াপনা চলবে না। যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমরা তার গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নিই, সেটা আমাদের এখানকার পুরনো দস্তুর। চাষীরা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন এই দস্তুর হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে যায়।'

সজ্জনদেবের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। সে একইভাবে পাৎলুনের পকেটে হাত পুরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, জানালা খুলে তুষারকণার নীরবে ঝরে পড়া দেখতে শুরু করল। তার পিঠ নওনিহালসিং ও ঠাকুর মনমোহনসিংয়ের দিকে। ওরা দু'জনেই রাজকুমারের এ. ডি. সি. ও তার নিকটাত্মীয়। বড় জায়গীরের ভেতরে ওদের ছোট ছোট জায়গীরও রয়েছে, রাজকুমার তাদের ওপর যেমন কঠোর শাসনকার্য চালায়, তেমনি ওরাও নিজেদের জায়গীরে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। ওপর থেকে তাদের যে চাট খেতে হয়, সে চাট শেষ পর্যন্ত সজোরে তাদের প্রজার কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আজ এই চাট মারা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ধারণা হলো সজ্জনদেবের। কলেজে সে খেলোয়াড় ছিল, চিন্তা-ভাবনার বালাই ছিল না তার। এফ. এ. পর্যন্ত সে রাওয়ালপিণ্ডির গার্ডন কলেজে পড়াশোনা করেছে। ওর বাবা বেশ বড়লোক, ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাছাড়া তাঁর পৈতৃক সম্পত্তিও ছিল। রাজাবাজারে যেখানে কাশ্মীরের মহারাজার বাড়ি ও দশখানা দোকান রয়েছে, সেখানে সজ্জনের বাবার ছ'খানা বাড়ি ও পঁচিশটি দোকান। প্রতি বছর নতুন নতুন গাড়িতে চড়ে বেড়াত সজ্জন। খুব ভালো ক্রিকেট খেলত, পড়াশোনাতেও খারাপ ছিল না, মনের দিক দিয়েও খারাপ নয়। সে জন্যে এফ. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই লাহোরের গভর্নমেণ্ট কলেজে সীট পেয়ে যায়। লাহোরের গভর্নমেণ্ট কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে। কলেজের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হয়। এম. সি. সি.-র বিরুদ্ধে খেলতে নামে, ষাট রান তোলে, খবরের কাগজে ছবি বেরোয়, মেয়েরা দলে দলে অটোগ্রাফ নেয়। লাহোরের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট-ক্লাব তাকে সদস্য

করে নেয়। উত্তর ভারতের বড় বড় রাজা-মহারাজা সে ক্লাবের সদস্য। সে তার পরিমণ্ডলে একটা ছোটখাটো হিরো ছিল। তার চতুর্দিকে গুণমুগ্ধদের একটি চক্র ছিল, সে অনেক মেয়েকেই রীতিমতো ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে। একটা বিয়ের পাকা কথা ভেঙেছে। একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ও এক টুটো-ফুটো অবস্থার রাজকুমারীর সঙ্গে পীরিত জমিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য নৃত্যে পারদর্শী, মদ্যবিলাসী, কাব্য-কবিতায় অনুরাগী। দিনে ঘুমোত, রাতে জেগে থাকত। বাবাকে চিঠি লিখত শুধু টাকা-পয়সার জন্যে। গত যুদ্ধে মুনাফা লোটার ব্যাপারে পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যেহেতু অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পাঞ্জাব সেনাদলে বেশী লোক সরবরাহ করেছিল, তাই যুদ্ধের আসবাবপত্রের বড় বড় ঠিকেদারিও পেয়েছিল পাঞ্জাব। এই মুনাফাবাজির প্রাচুর্যে পাঞ্জাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণদের মধ্যে স্বল্পকালের জন্যে এক অস্থায়ী চাকচিক্য দেখা দিলো, এমন এক প্রজন্মের উদ্ভব হলো, যাদের পকেট টাকা-পয়সায় ভর্তি, মাথাটা একেবারে খালি। তাই বড় সহজেই তারা কর্নেল ব্রিম্প ও মহারাজা মোতিচন্দের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠল। এই প্রজন্মের লোকেরা ইংরেজ হয়ে উঠতে পারল না, আবার পাঞ্জাবীও রইল না। প্রথম মহাযুদ্ধে এই যে প্রজন্মটির উদ্ভব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই তার ধ্বংস। আর তারা নিজেদের জায়গায় রেখে গেলো এক উন্মুক্ত কবর, এক দুর্গন্ধ নর্দমা, এক বিষাক্ত আবহাওয়া। এই রকম এক প্লাবনে সজ্জনদেব ওপরে ভেসে ওঠে। এই প্রজন্মের বহু দোষগুণ তার মধ্যে রয়েছে। আর থাকবেই না বা কেন? তবে অনেক কিছু থেকে সে আবার মুক্তও। তার চরিত্রে বিমর্ষতা ও হীনমন্যতার সঙ্গে এক অদ্ভুত অস্থিরতারও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সে আত্মসন্তুষ্ট নয়, নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। কেন, সেটাও তার জানা নেই। সে এই 'কেন'-র সন্ধানে রয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে বেশী ভাবনা-চিন্তাও করে না, কারণ এই অনুসন্ধান স্পৃহা তার মস্তিষ্কেই চাপা থাকে, এবং এ কথাটাও খুব ভালো করে জানা নেই তার। যে মেয়েটিকে সে ছেলেবেলা থেকে ভালোবেসে এসেছে, বাবা তাকে কিছু না জানিয়েই সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেয়, তার একমাত্র কারণ, মেয়েটি গরিব। তাতে সে বুঝতে পারে, তার হৃদয়ের শ্যামলিমার গভীরে কত-না কাঁটা লুকিয়ে রয়েছে। যখন সে মলীর কাছ থেকে ভালোবাসা প্রত্যাশা করছে, তখন রাজকুমার তার হৃদয়ে কত-না তুষারপাত ঘটিয়েছে, এখন এই মুহূর্তে সেটা উপলব্ধি করছে সে। এর বেশী সে কিছু জানে না। এখন যে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তা শুধু এইটুকু পর্যন্তই যে, পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্র তো থাকেই, থাকবেই চিরদিন, কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে এই ভেদাভেদ অন্তত উঠে যাওয়া উচিত। হা-হা-হা!

জানালার সামনে বরফ পড়ার দৃশ্য। তাতে খুব তাড়াতাড়ি বিরক্তি ধরে গেলো সজ্জনদেবের। সে জানালা বন্ধ করে পর্দা ফেলে দিলো। অগ্নিকুণ্ডের কাছে 'ওমর খৈয়াম'-এর 'প্রাইভেট' সংস্করণ নিয়ে বসে পড়ল সে। গ্রন্থখানি

আরব্য উপন্যাসের চেয়েও উৎকৃষ্ট। অত্যধিক কামচারিতার ফলে যাদের পুরুষত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, সম্ভবত সেই সব বৃদ্ধ রাজাদের জন্যে রচিত হয়েছিল গ্রন্থখানি। ঠাকুর মনমোহনসিং তার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ বইয়ের পাতা ওল্টালে বরং তোমার মনটা ভালো হবে।'

সজ্জনদেব বিরক্তি প্রকাশ করে বই বন্ধ করে দিলো। নওনিহালসিং বলল, 'এ-বার রাজা যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে আমি রাজকুমারকে বিলাত যাওয়ার আগে ইরান যাওয়ার পরামর্শ দেবো। ওমর খৈয়ামের দেশ দেখে আসবে।'

ঠাকুর মনমোহনসিং বলল, 'ইরানে এমন কি আছে! আমার বড়দা গত যুদ্ধে রাজাসাহেবের সঙ্গে ইরান গিয়েছিল। দু' বছর ছিল সেখানেই। দু' বছরে ছ'টি বিয়ে করেছিল।'

'ছয় বিয়ে?'

'হ্যাঁ। প্রতি চার মাসে সে একটি করে নতুন ইরানী মেয়েকে বিয়ে করত। শীগ্‌গীরই ইরানের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল তার।'

'সত্যি, বিয়েতে কি আর মজা আছে? যতক্ষণ মেয়েমানুষের ওপর জবরদস্তি না করা যায়, ততক্ষণ জীবনে কোনো মজাই নেই।'

মনমোহনসিং অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'না, কথাটা ঠিক নয়। তুমি সব কথাকে ঐ দিকেই টেনে নিয়ে যাও। ও, মানে আমার বড়দা, বলত যে, ইরানেও খুব গরিব লোক বাস করে, আর আমাদের জায়গীরের লোকজনের মতোই তারা নোংরা, গোমুখ্যু, নির্বোধ। আর এই যে ওমর খৈয়ামের এডিশন, এ শুধু কল্পনা। ইরানে ও সবের এতটুকু অস্তিত্ব নেই। ইরানের ওপর আমার বড়দার ভীষণ রাগ। বলে, শালারা খুব ঠকিয়েছে। ছবিতে এক রকম, আসলে অন্য রকম।'

'ছবিতে আমাদের কাশ্মীর কি মন্দ?' নওনিহালসিং এক দীর্ঘ অট্টহাসি হাসতে হাসতে বলল, 'কত সুন্দর দেখায় বলো তো! লোকে সেই সুন্দর ছবি দেখে গাধার মতো দৌড়তে দৌড়তে এখানে আসে। ডাল হ্রদের ধারে গরমে ছট্‌ফট করা মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘুমিয়ে আবার ছুটে পালায়। হা-হা-হা। সব উল্লুক কোথাকার!'

'শাট আপ!' সজ্জনদেব রেগে গিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে অন্তত অন্য কিছু নিয়েও এক-আধটু আলোচনা করো। যখনই দেখো, মেয়ে আর মদ, মদ আর মেয়ে, আর জী হুজুর, জো হুজুর! যেন আমরা মানুষ নই, কুকুর। এই কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ লোক—নারী-পুরুষ—যারা বাস করে, তারা কি মানুষ নয়? সবাই কি লাটের মাল? সবাই কি মান-মর্যাদা বিক্রী করতে বসেছে? তাদের মনে কি নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্যে স্নেহ-ভালোবাসা নেই? নিজেদের স্ত্রী-মা-বোনের ইজ্জতের কথা ভাবে না তারা? নিজেদের বোনকে আদর করে না? আমি এইসব হঠকারী কথাবার্তা মানিনে।'

নওনিহালসিং বলল, 'বাছাধন, তুমি লেখাপড়া শিখে বেকুবের মতো কথা বলছ। আমাদের অভিজ্ঞতা যা বলে, তা হলো, গরিবদের কোনো ইজ্জৎ থাকে না। ইজ্জতের মূল্য বুঝি শুধু আমরা, শুধু ঠাকুরেরা। বাকি সব, যারা আমাদের প্রজা, তারা আমাদের সম্পত্তি। যাকে যেভাবে ইচ্ছে, ব্যবহার করব আমরা। আর তাতে তারা খুশীও হয়।'

ঠাকুর মনমোহনসিং বলল, 'শুধু তাই নয়, সব জায়গাতেই এই একই অবস্থা। ইরানেও ঠিক এই রকমই। আমার বড়দা বলে যে···'

সজ্জনদেব জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বড়দা কি করে ?'

'ও আজকাল উধমপুরের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট।'

সজ্জনদেব হাসতে শুরু করল, 'আর তুমি তার কথা বিশ্বাস করো ? যে লোক পুলিশের লোকজনকে বিশ্বাস করে, তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে ?'

'আমার বড়দাকে গাল দেবে না, সজ্জনদেব। আমি ঠাকুর।'

সজ্জনদেব গর্‌গর করে উঠল, 'আমি পাঞ্জাবী !'

'পাঞ্জাবীর মা-র··· !'

'তোর ঠাকুরের বোনের··· !'

ঠাকুর মনমোহনসিং আর সজ্জনদেব দু'জনের মধ্যে গুঁতোগুঁতি লেগে গেলো। শক্ত হাতে নওনিহালসিং ওদের ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোমাদের দু'জনের কেউ কারুর বাবাকে কিছু বলেছে ! আরে, তোমরা রাজকুমারের এডিকং না পোষা মোরগ ? এখন যদি রাজকুমার দেখতে পায়, তোমাদের দু'জনের চাকরিই খেয়ে নেবে —আর সেইসঙ্গে আমারও। এ কি আহাম্মুকি ! সজ্জনদেব সাহেব, আপনার প্রেম মলীর সঙ্গে, গায়ের জ্বালা রাজকুমারের ওপর, কিন্তু আপনি মনমোহনসিংয়ের ওপর রাগ ঝাড়ছেন কেন ? অন্তত এটুকু ভেবে দেখছেন না যে, মনমোহন এই রাজ-বংশেরই একজন। যে থালায় খাচ্ছেন, তাকেই ফুটো করছেন ! আর তুমি মনমোহন ! এই রকম গোঁয়ারতুমি করা অবস্থায় তোমাকে রাজকুমার দেখে ফেললে কি বলবে, তুমি রাজকুমারের আত্মীয়, না কোনো হাড়ী-মুচির ছেলে ? নির্লজ্জ···'

সজ্জনদেব ও মনমোহন উভয়েই লজ্জিত হয়ে পৃথক পৃথক চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

'না-না, এটা ঠিক নয়। তোমরা দু'জনে এখুনি আমার সামনে হাত মেলাও। নইলে তোমাদের দু'জনের বিরুদ্ধেই রিপোর্ট করে দেবো। কোলাকুলি করো দু'জনে। —হ্যাঁ, এইভাবে ! আরে, আমরা হলাম শাসনকর্তা। আমরাও যদি দেহাতীদের মতো মারামারি করতে থাকি তো শাসন চালানোর বারোটা বেজেছে !'

এমন সময় এক চোপদার এসে খবর দিলো, 'জমাদার ঠাকুর কাহনসিং দেখা করতে চান।'

নওনিহালসিং বলল, 'নিয়ে এস।'

চোপদার জমাদার ঠাকুর কাহনসিংকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। ঠাকুর কাহন-সিংয়ের সঙ্গে রজ্জিও ভেতরে প্রবেশ করল। রজ্জির পরনে নতুন পোশাক। ঠাকুর কাহনসিং স্যালুট জানাল। তার চোখেমুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম চকচক করছে। তাকে এই মুহূর্তে চুলকানির জ্বালায় উত্যক্ত কুকুরের মতো অস্থির অসহায় দেখাচ্ছে। তার লাল মুখখানি আরও লাল হয়ে উঠেছে। ভার-ভারিক্কী মুখখানায় এক আশ্চর্য সকরুণ নির্জীবতা ফুটে উঠছে। যেন সে বলছে—আমি কোনো শালা শ্বশুর হারামজাদার খোশামোদ করতে চাইনে। আমিও ঠাকুর, রাজপুত, জমাদার। কিন্তু কি করব, এরা আমার চেয়ে উচ্চপদস্থ। এদের খোশামোদ আমায় করতেই হবে, করবও তাই। কিন্তু এ সব আমি মোটেই ভালোবাসিনে। ঠিক আছে, এদের ওপর তার প্রতিশোধ না নিতে পারি, অন্য কারোর ওপর নেবই। শুয়োরের বাচ্চা! ওরা আমায় এখন না-জানি কত তুচ্ছ ভাবছে!

ঠাকুর নওনিহালসিং জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর জমাদার সাহেব?'

'ভালো, হুজুর! ছোট সরকারের জন্যে এই মুরগিটা এনেছি।' জমাদার কাহনসিং রজ্জির দিকে ইশারা করল।

এডিকং তিনজনেই বারবার রজ্জির দিকে চেয়ে দেখছে; যেন তার ঠ্যাঙ, কোমর, পাঁজরার হাড়, হাতের মাংসপেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আন্দাজ করছে—মাংস কতটা সুস্বাদু হবে, কি রকম নরম আর মুচমুচে হবে। তাদের চোখের দৃষ্টিতে নির্লজ্জতা ও কদর্যতা এমন প্রকট যে রজ্জি জড়সড় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—যেন তার শরীরে মাগুর মাছের চামড়া, তার ওপরে কোনো কিছু স্পর্শ করছে না, যেন তার দেহ রক্ত-মাংসের নয়, পাথর দিয়ে তৈরী।

'মুরগি তো ভালোই দেখছি!' মনমোহন মিনমিন করে বলল।

'বেশ মাল এনেছ জমাদার!' নওনিহাল মত প্রকাশ করল।

ঠাকুর কাহনসিং খানিকটা খুশী হয়ে, খানিকটা নিজের ওপরেই বিরূপ হয়ে বলল, 'সাহেব, ওর জন্যে কত বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমে রাজা করম আলি ওর দিকে তাক করে ছিল, সে ব্যাটা জখম হলে তবে তার থাবা থেকে ওকে বের করে আনতে পারি। ও আমার চোখ কেড়ে নিয়েছিল হুজুর, এ রাজ্যের সারা তল্লাটে এমন মুরগি পাওয়া যাবে না কোথাও। আমার তো বেশ কিছু সময় ওর নাগরটার তল্লাশে কেটেছে, যার সঙ্গে ও পালিয়ে এসেছিল।'

'কি নাম তার?' সজ্জনদেব জিজ্ঞেস করল।

'সে হারামীটার নাম ফজল। অনেক ভুগিয়েছে সে। বড় কষ্টে অনেকটা ভেতর থেকে ওদের গ্রেপ্তার করে এনেছি। ফজলকে তো ওখানে পুরে দিয়েছি—জেলখানায়। রাজা করম আলি রক্তাক্ত অবস্থায় নিজের মহলে পড়ে আছে। ভাবলাম, রাজকুমার সাহেবের জন্যে নিয়ে যাই। ছোট সরকার খুশী হবেন। দু' বছর থেকে আমার পদোন্নতি আটকে আছে।'

মনমোহনসিং বলল, 'ভালোই করেছ ···ওকে রেখে যাও এখানে। তোমার হয়ে আমরাই ওকে ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে হুজুর। কিন্তু খেয়াল রাখবেন—আমিও ওকে হাত দিয়ে ছুঁইনি।'

নওনিহাল মুচকি হাসল।

জমাদার ঠাকুর কাহনসিংও মুচকি হেসে বলল, 'হ্যা হুজুর, শেষ পর্যন্ত মালটা রাজকুমারের কাছে গিয়ে পৌঁছালই না, মাঝখানেই হালাল হয়ে গেলো, সেটা যেন না হয়। কথাটা মনে রাখবেন একটু। দু' বছর থেকে আমার পদোন্নতি আটকে আছে।'

নওনিহাল বলল, 'তুমি ভেবো না ঠাকুরজী! আমাদের স্বজাতি তুমি, তোমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি হবে না। এ তোমার জমা রেখে যাওয়া আমানত।'

এরপর ঠাকুর নওনিহালসিংয়ের পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব হলো না, কারণ সে মলীর হাসির আওয়াজ শুনতে পেল, সেইসঙ্গে রাজকুমারের হাসি। ওরা দু'জনে এ দিকেই আসছে। ভারি বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! এখানে তিনজন এডিকং। একজন সেনাবাহিনীর জমাদার। একটাই ঘর, একটাই দরজা। ওরা এ দিকেই আসছে, মলী রয়েছে সঙ্গে। অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা। অবশ্য এটা ঠিক যে, মহলে মুরগি আসে, উপঢৌকন আসে, উপঢৌকন গ্রহণ করাও হয়। কিন্তু ভেট দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যেও আর্ট আছে, পরিমিতি আছে, বিশেষ ধরনের আদব-কায়দা আছে। কিন্তু এখন সব কিছু লণ্ডভণ্ড হতে চলেছে। ওদের পায়ের আওয়াজ ও হাসির আওয়াজ ক্রমশ দরজার কাছে এগিয়ে আসে, তারপর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তারা।

জমাদার ঠাকুর কাহনসিং দরজার দিকে মাথা হেঁট করে বলে, 'জয় দেবতা!'

ঠাকুর নওনিহালসিং, ঠাকুর মনমোহনসিং এবং চৌধুরী সজ্জনদেব—তিনজনেই দরজার দিকে মাথা হেঁট করে'উচ্চারণ করল, 'জয় দেবতা!'

রাজকুমার সংগ্রামসিং মলীর সঙ্গে হাসতে হাসতে ভেতরে এসে দাঁড়ায়। আচম্‌কা হাসি থেমে যায় তাদের, রজ্জিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তারা।

মলী আর রজ্জি পরস্পরকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

মলী জিজ্ঞেস করে, 'কে ও?'

সবাই চুপ।

মলী রজ্জির দিকে এগিয়ে যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে।

আর সজ্জনদেব মনে মনে দুটি মেয়েকেই তুলনা করতে শুরু করে। দুটি মেয়ের শরীরেই আর্য রক্তের ধারা বইছে, কিন্তু রজ্জির গায়ের রঙ যেমন দুধে ও গোলাপীতে মেশানো, মলীর তেমনটি নয়। রজ্জির ঠোঁট দুটি তাজা টুস্‌টুসে, মলীর ঠোঁট বাঁকানো, শক্ত। মলীর নাক সোজা উঠতে উঠতে হঠাৎ যেন ওপরে

গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, যেন তৈরী হতে হতে আচমকা উপকরণ ফুরিয়ে গেছে। রজ্জির নাক সোজা ও তীক্ষ্ণ, দারুণ তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণধার তরোয়ালের ডগার মতোই। নাকটা যেন মুখের আদলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী। মলীর চিবুক চন্দ্রাকার, রজ্জির গোল। মলীর গাল ও চোয়ালের মাঝখানে একটি টোল আছে, রজ্জির মুখের ঐ জায়গাটি ভরাট। তার মুখখানি গোল, সুন্দর, আর ভীষণ সরল প্রকৃতির, সেইসব অসহায় শিশুর মতো, নিজের জীবন ছাড়া যার আর কিছুই জানা নেই। মলীর চোখে বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়, রজ্জির চোখে শহীদের মতো উজ্জ্বলতা ও বিশ্বাস —যা পূর্বে ছিল না। আর এক অদ্ভুত সমবেদনাপূর্ণ উপলব্ধি —যা পূর্বে ছিল না। মলীর সারা শরীরে এক ঝকঝকে তীক্ষ্ণতা, রজ্জি যেন ফুলে ফুলে ভারাক্রান্ত শাখা। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তুলনা করতে করতে শেষে সজ্জনদেবের মনে হলো, যদি রজ্জি ও মলীর মধ্যে লড়াই বাধে, তাহলে শেষ পর্যন্ত রজ্জি মলীকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কেন? রজ্জির হাত বড় মজবুত, হাতে কমনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পুরুষোচিত দৃঢ়তাও। কিন্তু সজ্জনদেব জানে যে, রজ্জি তার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন নয়, মলী সচেতন, তাই সে নিজের দুর্বলতাটাও বোঝে। সে জন্যে সে রজ্জির সঙ্গে কখনও লড়াই করবে না —দৈহিক ক্ষমতার জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে সে রজ্জিকে একবার কেন, বারবার ধূলিলুণ্ঠিত করতে পারে।

মলী জিজ্ঞেস করল, 'ও কেন এসেছে এখানে?'

সবাই চুপ।

রাজকুমার সংগ্রামসিং বলল, 'বলো। কেউ জবাব দিচ্ছ না কেন; কি ব্যাপার?'

ঠাকুর নওনিহালসিং বলল, 'হুজুর, ওর নালিশ আছে।'

'কি নালিশ?' মলী জিজ্ঞেস করল।

সবাই চুপচাপ জমাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জমাদার বলল, 'হুজুর, আমি ওকে —মানে আসল ব্যাপার হলো…'

জমাদার একেবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মলী বলল, 'তুমি এখান থেকে যাও এখন নইলে তোমার পক্ষে ভালো হবে না বলছি।'

জমাদার এদিক-ওদিক কয়েকবার তাকাল, তারপর মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো —কারণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে ফিরেও চাইছে না কেউ।

তারপর মলী সজ্জনদেবকে বলল, 'মেয়েটিকে মহলের বাইরে পৌঁছে দাও, রাহাখরচও দিয়ে দিও যাতে সে বাড়ি যেতে পারে…'

রাজকুমার সজ্জনদেবের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সজ্জনদেব মলীকে বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর সে রজ্জিকে বলল, 'চলো।'

রজ্জি যাওয়ার সময় মলীর কাছ দিয়ে গেলো। মলীর কাঁধে হাত রেখে সকলের

সামনে চুমো খেলো তাকে। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মন্নী খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে, চিন্তিত হয়ে, কিছুটা খুশী হয়ে রাজকুমারকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। রাজকুমার তার হাত ধরে বলল, 'এস, খাবার তৈরী।'

মন্নী তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এখন আমায় ছুঁয়ো না। তোমাকে ঠিক একটা কসাই মনে হচ্ছে আমার।'

রাজকুমার মৃদু হেসে তার হাত চেপে ধরল।

মন্নী আর হাত ছাড়িয়ে নিল না।

সজ্জনদেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

* * *

রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের প্রতি সজ্জনদেবের মনে যে ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল, তা রজ্জির প্রতি এক বিচিত্র সহানুভূতির আকার ধারণ করল। সজ্জনদেব কোষাগার থেকে রাহাখরচ বাবদ রজ্জিকে তিন টাকা আদায় করে দিলো, খাওয়া-দাওয়া করালো। তারপর রাজবাড়ির একটা ঘরে আরাম করে বসে বসে রজ্জির দীর্ঘ কাহিনী শুনল। যখন তার গল্প শেষ হলো, তখন তার দেহের কথা ভুলে গেলো সজ্জনদেব, মনে রইল শুধু তার দুঃখ-কষ্ট, মনে রইল দুর্ভাগ্য ও ব্যথা-বেদনায় উদ্গত তার চোখের অশ্রুজলটুকু। মনে পড়ল গোমাঁর কথা, সে-ও ছিল এই রকমই তার এক বাগদত্তা, টিকরী শাহমুরাদের কোনো এক বেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আজ তার জীবনে যে বিড়ম্বনা ঘটেছে, তাতে তার নিজের দোষ কতটুকু! কিছুক্ষণ সে চুপচাপ আপনার হৃদয়-অঙ্গনে বসে বসে সে কথাই ভাবতে থাকল। মনে পড়ল গোমাঁর সরল মুখখানি, ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হাসি, সুমিষ্ট মধুর মতো মিঠে কণ্ঠস্বর, তার কোমল অন্তঃকরণ, যা সর্বদাই সজ্জনদেবের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। একবার সে তাদের বাড়ির তৈরী পরটা নিয়ে এসেছিল। সে পরটা তার নিজের হাতে তৈরী। তখন মাখন-টোস্ট খাওয়া যুবকের কাছে সেটাকে উৎপীড়ন বলে মনে হয়েছিল, খারাপ লেগেছিল তার। আজ সজ্জনদেব সে দিনের সেই উপহারে কার যেন আঙুলের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করছে। সে দিনের সেই স্পর্শটুকুকে কত-না তুচ্ছ ভেবে অবজ্ঞা করেছিল। একবার সে যখন টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছে, ঠিক তখন গোমাঁ তার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল। সে সজ্জনদেবের কাঁধ স্পর্শ করতেই সজ্জনদেব পেছন ফিরে যেই তাকিয়েছে, অমনি সে দুরন্ত হরিণীর মতো ছুটে পালাল। সেই মুহূর্তে তার সেই আচরণ সজ্জনদেবের বড় খারাপ লেগেছিল, আজ তার সেই অকপট ব্যবহার-টুকুর মধ্যে প্রেমের আহ্বান উপলব্ধি করছে সে। হঠাৎ সজ্জনদেবের মনে হলো, চোখের সামনে যা কিছু ঘটে, চোখ কখনোই তা সমগ্রভাবে লক্ষ্য করে না, অনেক কিছু চোখ থেকে এড়িয়ে যায়, অনেক কিছু বুঝে নেওয়ার ব্যাপার, উপলব্ধি করার ব্যাপার থাকে, যখন তা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, তখন দেখা যায়, সব কিছু শেষ হয়ে

গেছে। কখনো কখনো গান শেষ হয়ে গেলে তার রাগরাগিণী অনুভূত হয়। যখন পাতা ঝরে যায়, তখন হেমন্তের হাওয়ার মৃদুমন্দ ধ্বনি এসে কানে বাজে। প্রেম স্তব্ধ হয়ে গেলে তার ব্যথা-বেদনার চিৎকার হৃদয়ের নিস্তব্ধ গম্বুজে এক বাত্যাতাড়িত চকোরের মতো পাখা ঝাপটাতে থাকে। আর মানুষ তখন হতাশায় হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'এখন আর কি করা যায়⋯এখন আর কি করা যায়!' —বর্তমানে সজ্জনদেবের অবস্থাও সেই রকম।

সে রজ্জিকে গোমাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। রজ্জি জবাব দিয়ে গেলো, কিন্তু প্রত্যেকটি প্রশ্নের পর তার বিস্ময় ক্রমাগত বেড়েই চলল, অবশেষে সে জিজ্ঞেস করে বসল, 'গোমাঁ তোমার কে?'

সজ্জনদেব উঠে পায়চারি করতে শুরু করল। প্রশ্নটার কোনো জবাব দিলো না। —সে তার কে ছিল? —সে কার-ই বা কে ছিল? সে কি তার নিজের পরিবারের কেউ ছিল? দারোগার কেউ ছিল? —সে কারোর মা ছিল, কারোর স্ত্রী ছিল, কারোর প্রেমিকা ছিল —তার মধ্যে সমাজের কত-না অপরাধ লুকিয়ে ছিল। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের কত-না ঘৃণ্য দৃশ্য অবগুণ্ঠিত হয়ে ছিল। সে রজ্জিকে কি বলবে যে, গোমাঁ তার কে ছিল! সে নীরবে পায়চারি করতে থাকে।

রজ্জি বলল, 'আমি বুঝেছি।'

সজ্জনদেব ভাবল —রজ্জি নারী, ও বুঝবে না কেন! ও তো প্রেমের বাঁশি, ওর বুকে যে প্রেমের সঙ্গীত সৃষ্টি হয়, তার চেয়েও উচ্চস্বরের সঙ্গীত ওর বুকের গভীরে মৌন হয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত কোন বংশীবাদক তার বাঁশিকে এতটা ভালোবেসেছে যে, সেই মৌনসঙ্গীত শোনা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে, যে সঙ্গীত মৃত্যুকালে গোমাঁ রেখে গেছে তার জন্যে। কে জানত যে সেই সাজসজ্জার আড়ালে এতখানি জ্বালা লুকিয়ে রয়েছে।

সজ্জনদেব চোখের কোণের জল মুছল।

রজ্জি বলল, 'তাহলে আমি যাই?'

সজ্জনদেব বলল, 'চলো, আমি তোমায় মহলের বাইরে রেখে আসি। যতক্ষণ এই রাজবাড়ির সীমানার মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো সময় তোমার ইজ্জতের ওপর হামলা হওয়ার ভয় রয়েছে।'

মহলের বাইরে এসে রজ্জি বলল, 'ঠাকুর কাহনসিং আমায় বলেছিল, এই রাজবাড়িতে এমনিতেই তোমার বেইজ্জতীর কোনো সীমা থাকবে না। তাই তুমি যদি নিজে থেকেই রাজী হয়ে যাও, রাজকুমারকে খুশী করতে পারো, তাহলে হয়ত সে তোমার ফজলকে ছেড়ে দেবে।'

সজ্জনদেব জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে?'

রজ্জি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে শুধু মাটি খুঁটতে

থাকে। হঠাৎ সে মাথা তুলে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'বাবু, আমাদের অবস্থা কি কখনও বদলাবে না?'

প্রশ্নটা সে ভাবেনি, উপলব্ধিও করেনি, প্রশ্নটি আপনা থেকেই তার ঠোঁটের ডগায় চলে এল—এত দ্রুত, বিজলীর মতো এমন তীব্র গতিতে, যেন বন্দুকের নল দিয়ে গুলি ছুটে যাওয়ার মতো। যেন অনেক দূরে কোথাও কেউ বন্দুকের ঘোড়া টিপেছে। বহুক্ষণ ধরে রজ্জি সেই গুলির বিস্ফোরণ শুনতে থাকে। সজ্জনদেবও সেই গুলির বিস্ফোরণ শোনে, তার মনে হয়, এখন এই যে গুলিটা বেরিয়ে গেছে, সম্ভবত তার প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যাবে। রজ্জির প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না সে। তার নিজেরও জানা ছিল না প্রশ্নটির কি জবাব হতে পারে। সে তাড়াতাড়ি হতচকিত গলায় তাকে বাড়ি যেতে বলে মহলে ফিরে এল। রজ্জিকে একা রেখে এল মহলের মর্মর পাথরের সিঁড়িতে।

সজ্জনদেব এক বিপর্যস্ত মন নিয়ে মহলের ভেতরে এল। তখন রাজকুমার খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ধূমপানের কামরায় একটা ঢিলে-ঢালা হাল্‌কা সবুজ রঙের কারুকার্য-খচিত রেশমী জ্যাকেট পরে বসে ছিল। ফানুসের মধ্যে আলো ঝক্‌মক করছিল। মাঝে মাঝে রাজকুমারের আঙটিগুলির বহুমূল্য রত্ন ও কানে ঝোলানো সাদা হীরে এমন চক্‌চক করে উঠছিল যে, সে দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। সংগ্রামসিং একটা হাল্‌কা-হাল্‌কা মিষ্টি-মধুর ঘুমের আমেজে ভেসে যাচ্ছিল যেহেতু আজকের দিনটা খুব ভালো কেটেছে। মলী কথাবার্তায় বেশ খানিকটা এগিয়েছে। আহার্য বস্তুও আজ খুব ভালো ছিল। মলীর পছন্দ হয়েছে, বলতে কি, এখানকার কোনো জিনিস তো তার পছন্দই হয় না। আস্তে আস্তে সংগ্রামসিং মোটা গালিচার ওপর পা বোলাতে থাকে, আরাম চেয়ারে আরও গা এলিয়ে দেয়। এই মখমলের আরাম চেয়ারে ঘুমোতে যেটুকুর অভাব, তা শুধু ঐ মলীর কোমল বাহু দুটি। তার বুকের অনাবৃত যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল, সেটুকু কত উজ্জ্বল ফরসা, যেন সেই শুভ্রতার নিচে থেকে প্রভাত উঁকি দিচ্ছিল। এ সময় যদি কেউ মিষ্টি কবিতা শোনায়—ওমর খৈয়ামের পঙক্তি কিংবা দাগ-এর গজল, কোনো সুন্দর ঘুম পাড়ানো কবিতা, মৃদু মৃদু হাতের চাপড় দিয়ে ঘুমকে গভীর করে তোলা সোনালী কবিতা! রাজকুমার সংগ্রামসিং আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে টানতে সজ্জনদেবকে জিজ্ঞেস করল, 'সজ্জনদেব, মনে পড়ে কিছু—মারাত্মক কোনো কবিতা?'

সজ্জনদেব কোনো জবাব দিলো না। সে আলাদা একটি টেবিলে তাস বিছিয়ে বসেছিল চুপচাপ। কপাল কুঁচকে।

এই রকম কপাল কুঁচকে থাকাটা সংগ্রামসিংয়ের পছন্দ হলো না। বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সজ্জন!'

ঠাকুর মনমোহনসিং মৃদু হেসে ঠাট্টা করে বলল, 'আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন হুজুর! সজ্জনদেব এখন এখানে নেই।'

'তাহলে কোথায় ?' রাজকুমার খুব আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করল।

'এখন সে একটা মেয়ের সঙ্গে হাওয়ার ঘোড়ায় চড়ে চলেছে।'

'কে সেই মেয়েটি ?'

'সে মেয়েটি এখন প্রায় রেসিডেন্সির কাছাকাছি পৌঁচেছে।'

'মলী !' সংগ্রামসিং জিজ্ঞেস করল।

সজ্জনদেব টেবিলের ওপর সজোরে তাস ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'শাট আপ !'

কথা বলতে গিয়ে 'শাট আপ' বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে, পরক্ষণেই সে দাঁতে জিভ কামড়ে ধরল। কিন্তু জিভ কামড়ালে আর কি হবে !

সংগ্রামসিংয়ের মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো, তারপর সেই মুখটাই রাগে লাল হয়ে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। জীবনে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে 'শাট আপ' বলেনি। সে এ-বার সজ্জনদেবকে বেশ ভালো করেই 'শাট আপ' করে দেবে।

ঠাকুর মনমোহনসিং ও নওনিহালসিং রাজকুমারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সজ্জনদেব তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ঠাকুর মনমোহনসিং বলল, 'সজ্জনদেব, ক্ষমা চাইছ ?'

সজ্জনদেব চুপ করে রইল।

সংগ্রামসিং বলল, 'এটা ক্ষমা করার যোগ্য নয়।'

নওনিহালসিং বলল, 'একে তো মালিকের জিনিসের ওপর নজর, তার ওপর এই ঔদ্ধত্য !'

সংগ্রামসিং বলল, 'মলী ওর মুখে থুতুও দেবে না।'

সজ্জনদেব চুপ করে থাকে।

ঠাকুর মনমোহনসিং মনে মনে ঠিক করল, এ সুযোগ যেন কিছুতেই হাতছাড়া না হয়। বলল, 'হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা পাঞ্জাবী ! রাজাদের নুন খাবে আর তাঁদের সঙ্গেই টক্কর দেবে !'

সজ্জনদেব আর চুপ করে থাকতে পারল না। সারা শরীরের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো, বিদ্যুৎ তার রক্তকে টগ্‌বগ করে ফুটিয়ে দিয়ে গেলো। সারা শরীর ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগল। রাগে চিৎকার করে বলল, 'মহলের বাইরে চল। তোর সব টিক্কাশাহী ঘুচিয়ে দিচ্ছি—ডোগরার বাচ্চা ! ঠ্যাঙ ছিঁড়ে নেব তোর।'

কথাটা বলেই সজ্জনদেব এগিয়ে গেলো। সংগ্রামসিংও তুরন্ত এগিয়ে গিয়ে সজ্জনদেবের গালে সজোরে দুই চড় কষাল। তারপর তার এডিকং দু'জনকে বলল, 'ওকে মহলের দারোগার হাতে তুলে দাও। বলে দাও, ওর মুখে কালি মাখিয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, ডুগডুগি বাজিয়ে সারা শহর যেন ঘোরায়। শেষে শহর থেকে বের করে দেবে ওকে।'

তারপর রাজকুমার সজ্জনদেবের দিকে ফিরে বলল, 'পুরনো বন্ধুত্বের কথা মনে আছে, তাই তোকে এই শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি, নইলে এখুনি তোর গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নিতাম, নয় তো জেলখানায় সারা জীবন পাছা ঘষটানোর হুকুম দিতাম। কিন্তু পুরনো বন্ধুত্বের কথা ভুলে যাইনি, তাছাড়া এটাও মনে আছে যে আমিই তোকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম, এখানে তুই বিদেশী।'

ইত্যবসরে ঠাকুর মনমোহনসিং দারোগাকে খবর পাঠিয়েছিল। দারোগা মহলের তিন-চারজন সেপাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সজ্জনদেবকে ধরে নিয়ে গেলো তারা।

কিন্তু সে দিন এত জোর বরফ পড়ল যে ডুগডুগি বাজানো সম্ভব হলো না। তাই সজ্জনদেবের মুখে কালি মাখানোও গেলো না। তবে হ্যাঁ, পরদিন সূর্য উঠল, স্তূপীকৃত বরফের ওপর সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ল, সারা শহরের বাড়ির বরফাচ্ছন্ন ছাদগুলি রূপোর মতো ঝক্‌ঝক করতে লাগল। সে দিন সারা শহরে বেশ ভালো করে ডুগডুগি পেটানো হলো। সজ্জনদেবের মুখে কালি মাখিয়ে তাকে গাধার পিঠে উল্‌টো-মুখ করে চড়িয়ে গাধার সঙ্গে বেঁধে সারা শহরে ঘোরানো হলো। ছেলেমেয়েদের কাছে তামাশাটা ভারি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তারা কলরব করতে করতে, হাততালি দিতে দিতে, গাধার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বেড়ালো। মাঝে মাঝে গাধার পিঠে চড়ে-বেড়ানো দোষী লোকটার গায়ে দু'একটা পাথরও ছুঁড়ে মারছিল।

* * *

দুর্গের সর্বোচ্চ তলায় গোল ঘরের উঁচু জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সেই মজার দৃশ্য দেখছিল রাজকুমার সংগ্রামসিং, ঠাকুর মনমোহনসিং ও নওনিহালসিং। সেই দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল তাদের।

গাধায় চড়া মানুষটা দুর্গের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, আখরোট গাছের ভেতর দিয়ে যে সড়কটা গেছে, সে দিকে চলে গেলো। মন্ত্রী মহাশয়ের বাংলোর কাছ দিয়ে, সেখান থেকে ঘুরে রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হলো।

রেসিডেন্সির বাইরে ঢোলের আওয়াজ শুনে রেসিডেন্সির বহু লোক বাইরে বেরিয়ে এল, তামাশা দেখতে লাগল তারা। মলী ও তার বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মলী রেগে গিয়ে শোভাযাত্রার গতি রোধ করল, তার নিষেধে ঢোল বাজানোও বন্ধ হলো।

মলী গাধার সামনে গিয়ে মুখে কালি-মাখানো লোকটাকে চিনতে পেরে বলল, 'ও কে? কি অপরাধ করেছে ও?'

মুখে কালি-মাখানো লোকটা চুপ করে রইল।

একজন সেপাই বলল, 'ও সজ্জনদেব, রাজকুমারের এডিকং। রাজকুমারের অমর্যাদা করেছে ও।'

'কি রকম অমর্যদা ? কি এমন অসম্মানজনক কথা হতে পারে যার জন্যে এমন নিপীড়নমূলক শাস্তি ?'

সেপাই চুপ করে থাকে।

মলী ধমক দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে বলো, ওর অপরাধ কি ?'

একজন সেপাই মাথা নেড়ে বলল, 'মেমসাহেব, এর বেশী আমরা কিছু জানিনে। আমরা তো হুকুমের চাকর মাত্র।'

মলী ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'গাধার পিঠ থেকে নামাও ওকে, হাত-পা খুলে দাও।'

সেপাইরা নিজের জায়গা থেকে নড়ল না।

'আমি বলছি, খুলে দাও —কানে কথা যাচ্ছে না তোমাদের ?'

কর্নেল ডক বললেন, 'তুমি এ সব ঝামেলায় যেও না।'

মলী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না ড্যাডি, এ কি ধরনের বর্বরতা, সহ্য করা যায় না। ও বেচারাকে উদ্ধার করো।'

কর্নেল সেপাইদের ডেঁটে বললেন, 'লোকটাকে ছেড়ে দাও, আমি বলছি।'

সেপাইরা নিরুপায়ভাবে নিতান্ত বাধ্য হয়ে ভয়ে ভয়ে সজ্জনদেবকে গাধার পিঠ থেকে নামাল।

এখন সজ্জনদেব মলীর সামনে দাঁড়িয়ে।

মলী জিজ্ঞেস করল, 'কি অপরাধ করেছিলে তুমি ?'

সজ্জন বলল, 'আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম।'

মলী বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো। অবাক চোখে সে লোকটার দিকে তাকাল, যার মুখে কালি মাখানো, পরনে ছিন্ন বস্ত্র, রক্তাক্ত দেহ। তার কালিমালিপ্ত মুখমণ্ডলে গোল গোল চোখের তারা ও তার চারপাশের সাদা অংশটুকু ভীষণ বিদ্রূপের মতো চক্‌চক করছে। মলীর মনে দয়া ও ঘৃণা মিশ্রিত এক বিচিত্র ভাবের উদ্রেক হলো। সে কাউকে কিছু না বলে ধীরে ধীরে সেখান থেকে রেসিডেন্সির ভেতরে চলে গেলো। কর্নেল ডকও কিছু না বলে ভেতরে গেলেন।

সেপাইরা সজ্জনদেবকে আবার গাধার পিঠে চড়িয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল।

রাত দশটার সময় প্যারেড গ্রাউণ্ডে কামান ছোঁড়া হলে ঢোল বাজিয়েরা ঢোল বাজানো বন্ধ করল। সেপাইরা সজ্জনদেবকে গাধা থেকে নামাল। তাকে শহরের বাইরে নদীর ওপর কাঠের সাঁকোর কাছে নিয়ে আসা হলো। নদীর অপর পারে নিয়ে গিয়ে শহর থেকে বের করে দেওয়া হলো তাকে। তারপর তারা নিজেরা সাঁকো পেরিয়ে শহরে ফিরে গেলো।

* * *

সজ্জনদেব নদীর ওপারের সড়ক ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল, এলোমেলো পা

ফেলে —যেন সে নিজে হাঁটছে না। মনের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা, অনুভূতির লেশমাত্র নেই কোথাও। ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে সে, কিভাবে হাঁটছে, তার নিজেরও জানা নেই। সামনে চিনার গাছের তলায় একটা ছোট্ট ঘাসের আঁটি চোখে পড়ল। ঘাসের আঁটিতে বসে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিলো সে।

চিনারের ঠাণ্ডা ছায়ায় তার শরীরে এক আশ্চর্য শিহরণ খেলে গেলো। চারদিকে তাকাল সে। দূরে শহরের আলোগুলি নিভে গেছে, শুধু দুর্গের কোনো কোনো জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে তখনও। সাঁকোর ওপর বরফ ঝক্‌ঝক করছে। চারদিকে গভীর স্তব্ধতা। স্তব্ধতা তার হৃদয়ের ভেতরে এবং বাইরেও। তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা বরফের মতো জমাট হয়ে মৌন শান্ত হয়ে গেছে যেন। সে এখন তার ভেতরে ও বাইরে কোনো রকম স্পন্দন অনুভব করছে না। বলতে কি, তার দেহ ও মন ক্ষত-বিক্ষত, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় টন্‌টন করছে। কিন্তু মস্তিষ্ক একেবারে নিষ্ক্রিয়, শূন্য ও শান্ত, যেন সে শূন্যতারই একটি অংশ। তার ভেতরের ও বাইরের চারদিকে শুধু শূন্যতা আর শূন্যতা। সে এমন এক চোখে তার ভেতর ও বাইরের চারদিকটা দেখছে, যে চোখের আবরণ নেই, পলক নেই —এমন চোখ যার কখনও পলক পড়ে না, নিরন্তর শুধু দেখেই চলে।

তারপর মৃদু পদশব্দ তার কানে এল। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তারপর কে যেন আস্তে আস্তে কাঁধ স্পর্শ করল। সজ্জনদেব মুখ ফিরিয়ে দেখল, সেই গাধাটা, যে তাকে সারাদিন পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। নির্বাক পশুটি তার কাঁধে মুখ ঠেকিয়েছে। তার গরম ভেজা-ভেজা নিশ্বাস এসে লাগছে সজ্জন-দেবের মুখে। হঠাৎ সজ্জনের ভেতরের বরফ যেন গলতে শুরু করল, জমাট বরফ গলে গলে জল হয়ে এল, শরীরের এখানে-ওখানে যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। সে অনুভব করল, এখানে আঘাত লেগেছে, এখানে রক্ত বেরিয়েছে। এখানে তার হৃদ্‌পিণ্ড, ভেঙে গেছে। সে নিজেকে অনেকটা সামলে নিল, কিন্তু তখন অশ্রু চোখের পাতা দিয়ে গড়িয়ে তার কালিমালিপ্ত মুখ ভেসে যাচ্ছে. একান্ত অসহায়ের মতো সে গাধার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল, যেন কেউ তার প্রিয় বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

নির্বাক পশুটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চিনারের পাতায় মৃদু ঝির্‌ঝির শব্দ। নদীর জল দূরে পাথরে এসে ছলাৎ-ছলাৎ করে আক্ষেপ জানাচ্ছে। তারপর এক সময় দুর্গের আলোগুলিও নিভে গেলো—চারদিকে অন্ধকার, কোথাও কোথাও, যেখানে বরফ জমে আছে, সেখানে শুভ্রতা। সেই শুভ্রতাও যেন অন্ধকার থেকে পৃথক হয়ে আছে, যেন অন্ধকার মাটির ওপর কোথাও কোথাও শুভ্রতার টুক্‌রো ছড়িয়ে আছে, আর সেই আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কোথাও এতটুকু আপস নেই। হঠাৎ সজ্জনদেবের মনে হলো, এই অন্ধকার ও আলোর মধ্যে কখনও কোনো আপস আদৌ সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবল, এখন সে তার দেশে ফিরে

যেতে পারবে না। যেন এক বিশাল সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, অন্য এক বিশালতর সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সে আর পেছন ফিরে অন্ধকারে যেতে পারবে না। এখন তাকে আলো ও শুভ্রতার টুক্‌রো খুঁজে নিতে হবে, সেগুলোকে একটি একটি করে গাঁথতে হবে —বড় মেহনতে, হাতের ঘামে, চোখের অশ্রুতে, শ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণতায়, হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, মস্তিষ্কের সামগ্রিক প্রয়াসে —সেই টুক্‌রোগুলোকে গেঁথে তুলতে হবে, যাতে আলো বেড়ে চলে, অন্ধকার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। যাইহোক, এখন আর সে শহরে ফিরে যেতে পারবে না। সে তার দেশেও ফিরে যেতে পারবে না। এ-বার তাকে নিজের নতুন দেশের সন্ধান করতে হবে। অকস্মাৎ তার মনে এক আনন্দ-লহরী খেলে গেলো, সে বুঝতে পারল, নিজের অজ্ঞাতসারে যে বস্তু সে খুঁজতে চাইছিল, সেটা খোঁজার পথ সে পেয়ে গেছে। ঘাসের আঁটি থেকে উঠে দাঁড়াল, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই তার মনে হলো, সে টিকরী শাহমুরাদ যেতে চায়।

* * *

বরফাচ্ছন্ন সড়কের দিকে তাকাতেই তার নিজের মুখখানির কথা মনে পড়ল। সে রাস্তা থেকে মুঠো মুঠো বরফ তুলে মুখে ঘষতে শুরু করল। সাদা সাদা বরফের রগড়ানিতে তার মুখের কালি ধুয়ে যেতে লাগল। মনে হলো, শুধু তার মুখের কালিই নয়, তার মলিন হৃদয়ের কালিও ধুয়ে যাচ্ছে, তার ভেতর থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন উজ্জ্বল সজ্জনদেব বেরিয়ে আসছে।

মুখখানি পরিষ্কার করে সে সামনের অবারিত সড়কের দিকে তাকাল। তারপর নিজের সঙ্গী গাধাটির দিকে চেয়ে বড় আদর করে তাকে বলল, 'চলো, সাঁচু!'

* * *

'এই দুর্গের মধ্যে বারোটা কুয়ো আছে।' সংগ্রামসিং মলীকে জানাল। মলী ও সংগ্রামসিং দুপুর থেকে অনেকক্ষণ ধরে দুর্গের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মলী মাঝে মাঝে দুর্গের বিভিন্ন জায়গার ফটোও তুলে নিচ্ছে। নিজের পকেট ক্যামেরাটা নিয়ে সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, যদিও ওপর থেকে তা নিতান্তই উপেক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছিল।

মলী সংগ্রামসিংকে জিজ্ঞেস করল, 'বারোটা কুয়ো —জলপূর্ণ?'

'না, ধনসম্পদে পূর্ণ।'

'বুঝলাম না।'

সংগ্রামসিং ব্যাখ্যা করে বোঝাল, 'এই বারোটা কুয়োতে অপরিমেয় ধনসম্পদ রয়েছে।'

'মিথ্যে কথা!'

'না, সত্যিই বলছি —রাজা আমায় নিজে বলেছেন।'

'রাজা কি এই ধনসম্পদ নিজের চোখে দেখেছেন?'

'না। কিন্তু রাজাকে তাঁর পিতৃদেব বলেছিলেন, আর তাঁর পিতৃদেবকে বলেছিলেন তাঁর পিতৃদেব।'

'আর কোনোও মূর্খ আজ পর্যন্ত এই কুয়োগুলো খুলে দেখেনি!'

'না।'

মলী জোরে হেসে উঠল, 'তোমরা রাজপুতেরাও কি রকম সরলপ্রকৃতির! আরে ভাই, আগে কুয়োগুলো খুলে ছাখো না, হয়ত ওগুলোর মধ্যে শত্রুর মাথার খুলি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। পুরনো রাজদুর্গের কুয়োর মধ্যে সাধারণত শত্রুদের মাথার খুলি আর হাড়গোড় ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না।'

রাজকুমার সংগ্রামসিং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'না, এর মধ্যে ধনসম্পদ আছে।'

'হাড়গোড়ের সম্পদ!' মলী তাকে ঠাট্টা করল।

রাজকুমার সংগ্রামসিংয়ের রাগ হলো। সে মলীকে প্রতিশ্রুতি দিলো, 'আমি কালকেই এই কুয়োগুলো খুলে দেখাব তোমায়। যদিও অনেক বছর থেকে, আমরা জানি, ওগুলো খোলা হয়নি।'

'তাহলে কাল তুমি ওগুলো খুলবে কি করে?'

'আমি রাজাকে বলব।'

'আর যদি তিনি রাজী না হন?'

'আমি তাঁকে রাজী করিয়ে নেব।'

'কি করে রাজী করিয়ে নেবে? তোমাদের পণ্ডিতেরা কোনো প্রাচীন প্রথার কথা উল্লেখ করে বসবেন, আর সেই কারণেই এই পুরনো কুয়োগুলো খোলা সম্ভব হবে না। ব্যস, তাহলে রাজামশাইও চুপ করে যাবেন। আসলে নিশ্চয়ই এই রকমই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কোনো কারণ আছে, যার জন্যে এই কুয়োগুলো আজ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে।'

'না-না, —সে যাইহোক, কুয়োগুলো অবশ্যই খুলব…'

'আচ্ছা, দেখা যাবে!'

'আর আমি যদি কুয়োগুলো খুলে তোমায় দেখাতে পারি, তাহলে আমি কি পাব?' সংগ্রামসিং মলীর ঠোঁটের দিকে তাকায়।

মলীর ঠোঁটে অস্থির মুচকি হাসি খেলে যায়, সে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'তুমি এই কুয়োগুলোর ধনসম্পদ পাবে, আর না-হয় পুরনো হাড়গোড়।'

সংগ্রামসিং মলীর একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। মলী তার হাত ধরে গুরুজনের মতো গলায় বলল, 'এস, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে, যেখানে এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে জ্যান্ত পোঁতা হয়েছিল, আমাকে সেই মন্দিরের দরজাটা দেখাবে।'

'তুমি ঐ ব্যাপারটা কি করে জানলে?'

'সারা দুনিয়ার লোক জানে —আর আমি জানব না কেন —বুদ্ধু…'

মলী বুদ্ধ, বলায় রাজকুমার ভারি খুশী হলো। খট্‌খট করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো তারা।

* * *

দিনভর ওরা দুর্গের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। এই দুর্গের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো ইংরেজের পা পড়েনি। মলী প্রথম ইংরেজ মেয়ে যে ভেতরে ঢুকে দুর্গটাকে দেখছে, তাই তার কৌতূহল স্বাভাবিক। দুর্গের অতিথিশালা, নোকরখানা, পরিখা, সিন্দুক ও কুয়ো, জাফরি-লাগানো গবাক্ষ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, জেলখানা, দণ্ডঘর, আদালত, রাজামহাশয়ের খাস-কামরা, রাণীমহল, মন্দির, পুষ্করিণী, বাগান, মাঠ-ঘাট—সব কিছু মলী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। অন্যান্য সমস্ত পুরনো জায়গীরদারী দুর্গের মতোই এ দুর্গটাও নিচে থেকে শুরু হয়ে গোলাকারভাবে উঠতে উঠতে ওপরে গিয়ে ক্রমশ সরু হয়েছে। দুর্গের অভ্যন্তরের যাবতীয় বস্তু বাইরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে আরও একটা পাঁচিল রয়েছে, তাতেও যদি শত্রু জয়লাভ করে ফেলে, সে জন্যে তৃতীয় উচ্চতার ওপরে দুর্গের অভ্যন্তরীণ ইমারত শুরু হয়েছে। এভাবেই দুর্গ ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। মলী লক্ষ্য করল, সে ও সংগ্রামসিং দুর্গের বাইরে থেকে যতই ভেতরে প্রবেশ করছে. দুর্গ ছোট হতে হতে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে গেছে। দুর্গের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে একটা প্রাচীন যুদ্ধের মতো আনন্দ বোধ হচ্ছে। অবশেষে, যখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল, সূর্য অস্তোন্মুখ, তখন তারা দুর্গের সর্বোচ্চ ঘরে অর্থাৎ গোলঘরে গিয়ে হাজির হলো।

গোলঘরের চারদিকে জানালা। ফুল-পাতা চিত্রিত ছাদ, ছাদ থেকে ঝোলানো বহুমূল্য ঝাড়লণ্ঠন। বন্ধ জানালার রঙিন কাঁচ চুঁইয়ে চুঁইয়ে আলো এসে সারা ঘরখানিকে বর্ণোজ্জ্বল করে তুলেছে, যেন রামধনুর সাতটি রঙ ঘরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরখানা মলীর খুব পছন্দ হলো। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখল। পুরনো আয়না, পুরনো মূর্তি, পুরনো ছবি—সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ঘরখানা শতকরা একশো ভাগই এশীয়। ঘরের সমগ্র আত্মাটাই এশীয়। তার মধ্যে একটা জিনিসও নতুন কিংবা আধুনিক নেই। মলীর মনে হলো যেন সে বিংশ শতাব্দী থেকে পিছিয়ে যেতে যেতে প্রথম শতাব্দীতে গিয়ে হাজির হয়েছে। যেন সে উড়োজাহাজে উড়ে যাওয়া, নাইলনের মোজা-পরা আইরিশ মেয়ে নয়, বরং সে দু' হাজার বছর আগেকার ঝুমঝুম আওয়াজ তুলে হেঁটে-যাওয়া এক রাজকুমারী, যার পরনে আতর-সুরভিত রেশমী পোশাক, চুলে গোলাপ ফুলের বেণী, পায়ে মেহেদি রঙ, গলায় হীরের হার, যাকে কোনো এক রাজপুত্র তলোয়ার হাতে ঘোড়ায় চড়ে বীরদর্পে যুদ্ধ করে জিতে এনেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মলীর মনে পরাজয়ের গ্লানিও দেখা দিলো, চোখ বন্ধ করে সে টিপ্‌টিপ করতে থাকা নিজের বুকে দুটি হাত রাখল।

পরমুহূর্তেই সে তার দেহের চারদিকে রাজকুমারের হাতের স্পর্শ অনুভব করল। চোখ মেলে তাকাল সে। অতি সন্তর্পণে সে তার বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর সে দ্রুত কাছের একটি জানালা খুলে পেছন ফিরে জানালার বাইরে উঁকি-ঝুকি মারতে লাগল।

রাজকুমার বলল, 'মলী, তুমি তো জানো, আমি তোমার ভালোবাসা চাই!'

মলী অনেকক্ষণ পর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি আমার ভালোবাসা চাও, না আমায় জয় করতে চাও?'

রাজকুমার স্বীকার করল যে, পুরুষের ভালোবাসায় জয়লাভ করার মনোভাব অবশ্যই থাকে।

মলী বলল, 'সেটা পুরনো ভালোবাসা। যখন হাতে সুতো কাটা হতো, সে ভালোবাসা তখনকার যুগের। আজকাল তো নাইলন ও প্লাস্টিকের যুগ।'

রাজকুমার বলল, 'আমাদের এখানে তো আজকালকার দিনেও হাতে সুতো কাটা হয়।'

'সে জন্যেই তুমি আমার সঙ্গে একজন দাসীর মতো আচরণ করছ—বড় জোর একটু দেখতে ভালো একজন দাসীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনি করছ। একদিন-না-একদিন সে নাগালের মধ্যে আসবেই—তাকে আয়ত্তে আনা যাবেই, এই আর কি!'

রাজকুমার জিভ কামড়াল।

মলী বলল, 'তোমাদের জগৎটা বড় সুন্দর, কিন্তু সেটা আমার কাছে নয়। এই সৌন্দর্যকে স্বীকার করে নিয়েও আমি কিন্তু সেই প্রথম শতাব্দীতে পড়ে থাকতে চাইনে, যেটাকে তোমরা আজও পুজো করো।'

রাজকুমার বলল, 'আমি তো তোমারই পুজো করি।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ভেবে ছাখো, নিজের ভেতরটা ভালো করে খুঁজে ছাখো—তোমার ভালোবাসার মধ্যে সেই মনোভাব কি নেই, যাতে স্ত্রীকে পুরুষের ক্রীতদাসী হিসেবে ছাখে—যা পুরুষের আরাম-আয়েসের একটি খেলনা মাত্র! তার সমস্ত রূপরাশি শুধু এই জন্যেই যে, সে পুরুষকে সম্মোহিত করবে, প্রলুব্ধ করবে, আর সেই সম্মোহন-প্রলোভন ভালো মতো শুকিয়ে গেলে পুরুষ তাকে শুকনো পাতার মতো হাতে নিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে, তারপর আবার অন্য কোনো ফুলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে। ভাবো তো, তোমার ভালোবাসার মধ্যে আমার জন্যে এর চেয়ে কি কোনো উঁচু স্থান আছে? সত্যি করে বলো দেখি, রাজকুমার!'

রাজকুমার চুপ করে রইল। মলী ঠিক কথাই বলছে। হুবহু ঠিক না হলেও প্রায় কাছাকাছি। সে ভয় পেয়ে গেলো, ভাবল, তার ভালোবাসার পাপড়িগুলি যদি সে একটির পর একটি উন্মোচন করে দেখে, তাহলে হয়ত-বা তার ভেতর থেকে ভালোবাসার সেই ছবিটিই বেরিয়ে পড়তে পারে, যা মলী এইমাত্র বর্ণনা করেছে,

তাই এই উপলব্ধি ও বাস্তবতার সামনে আচমকা এসে পড়ার ভয়ে সে ভীত হয়ে উঠল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মলী মৃদু হেসে বলল, 'আমাদের আয়ারল্যাণ্ডেও এ রকম অনেক পুরনো দুর্গ আছে, কিন্তু সে-সব দুর্গ মরে গেছে, আজকাল সেগুলোর মধ্যে কেউ বাস করে না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমাদের এই দুর্গও মরে যাবে।'

* * *

পলন্দরীর পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবছে, রাজকুমার ও মলী জানালা দিয়ে চুপচাপ সে দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। বরফে ঢাকা সাদা চূড়ার ওপর থেকে সূর্য ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে, যেন কেউ দুর্গ-প্রাচীরের উঁচু সোপানশ্রেণী বেয়ে নেবে গিয়ে কোনো অন্ধকার ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করছে। কিছুক্ষণ তার শেষ রশ্মি পৃথিবী ও আকাশকে আলো করে রাখে তারপর এক সময় সেই আলোটুকুও অবারিত আকাশ ও উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে হারিয়ে যায়, চারদিকে এত দ্রুত অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে যে মলী বিস্ময়াভিভূত হয়। এশিয়ায় রাত্রি খুব দ্রুত এসে পড়ে, অথচ আয়ারল্যাণ্ডে সূর্যাস্তের অনেকক্ষণ পরেও দিগন্ত, আকাশ ও পৃথিবীর বুকে আলো ছড়িয়ে থাকে। অকস্মাৎ দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রদীপ জ্বলে ওঠে, ঠাণ্ডা হাওয়া তার হিমেল ডানা মেলে দিয়ে চারপাশে উড়তে উড়তে মলীর গাল স্পর্শ করতে থাকে, সে কাঁপতে কাঁপতে জানালা বন্ধ করে। পেছন ফিরে রাজকুমারের দিকে চেয়ে দেখে, তার চোখে জল।

রাজকুমারের চোখে জল দেখে মলীর দুঃখ হয়। সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে মৃদু হেসে বলে, 'চলো রাজকুমার, ড্যাডির কাছে পৌঁছে দাও আমায়।'

রাজকুমার স্তব্ধ, অসহায় দৃষ্টিতে সে মলীকে চেয়ে দেখে। সে কিছুক্ষণ থেকে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দু'জন পরস্পরের এত কাছে থাকা সত্ত্বেও একজন আর একজনের কাছ থেকে এত দূরে যে, দু'জনের মধ্যে যেন হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। মলীকে সে পাবে না কেন? এখন মলীর পক্ষে এমনি এমনি তার হাত এড়িয়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। এই দুর্গ তার, সমস্ত দারোয়ান চৌকিদার সেপাই-সান্ত্রী তার। সে মলীকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, কিন্তু তবুও মলী তাকে এত অসহায় এত নিরুপায় করে তুলেছে কেন! মলীর মুখে-চোখে এমন প্রফুল্লতা, এমন বিশ্বাস, এমন গৌরব রয়েছে যে, যেন সে জানে, তার বিনা অনুমতিতে কেউ তার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না। যেন মলী ইচ্ছে করলে অবাধে স্বচ্ছন্দে এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারে। দুর্গের কোনো তালা, কোনো দরজা, কোনো প্রাচীর এমন মজবুত নয়, যা মলীর পথ আটকাতে সক্ষম। হঠাৎ রাজকুমারের মনে হলো, এই নারী যেমন নতুন, তেমনি সে নিজে এক বহুকালের পুরনো দুর্গ। যেন সে দুর্গ বহুকাল আগেই বিজিত হয়েছে, মরে গেছে। তার পতিত কুয়োগুলোতে এখন আর কোনো ধনসম্পদ

নেই, শুধু প্রাচীন হাড়গোড়ের কঙ্কাল পড়ে আছে, যেন এ পর্যন্ত সে তার আত্মার চারপাশে যে পোশাক পরে ছিল, তা অত্যন্ত পচা, পুরনো, এখানে-ওখানে ছেঁড়া-ফাটা, তা থেকে মারাত্মক দুর্গন্ধ বেরোত। মলী কত ভদ্র—যে অমন দুর্গন্ধ সত্ত্বেও কিছু মনে করেনি, বরং অত্যন্ত শিষ্টাচারই দেখিয়েছে।

রাজকুমারের মনে প্রশ্ন দেখা দিলো, তাহলে কি সত্যিসত্যিই নতুন নিয়মে নতুন ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব ? নিজের মধ্যেই অনেক অনুসন্ধান করল সে। বিগত আধ ঘণ্টা ধরে সে আর কিছু ভাবেনি। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরেও কোনো চূড়ান্ত মীমাংসায় গিয়ে পৌছাতে পারল না। বিপর্যস্ত অবস্থায় মলীর সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মলী বলল, 'আচ্ছা, তুমি যাবে না তো ! তাহলে আমিই চললাম।' কথাটা বলেই মলী পা বাড়াল।

রাজকুমার তার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল। ওরা দু'জন নিঃশব্দে গোলঘরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

* * *

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর যখন টেবিলের সামনে কেবল মলী ও কর্নেল ডক রয়েছেন, তখন বৃদ্ধ কর্নেল ডক লম্বা লম্বা পা ফেলে মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে মেয়ের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ছবি নিয়ে নিয়েছ ?'

মলী ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

'সমস্ত দরকারী জায়গাগুলোর—দুর্গের ভেতরের ?'

'হ্যাঁ।' মলী আবার শ্রান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো।

'আর কুয়োগুলো ?' ডক ভীষণ চাপা গলায় আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওগুলোও খোলা হবে।' মলী আবার ক্লান্ত স্বরে বলল।

কর্নেল ডক মেয়ের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে আদর করে বললেন, 'এ-বার ঘুমিয়ে পড়ো মা, তোমাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

নয়

সুবেদার জানমহম্মদ আবদুলকে বলল, 'আজ রাতে কমাণ্ডার জার্নালসিংয়ের কেল্লা আক্রমণ করা হবে, তৈরী থাকবে।'

আবদুল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের গ্রামে চলে যায়নি। সে জেল থেকে বেরোতেই 'মুসলিম সেবক সঙ্ঘ'-এর সভাপতি তাকে সুবেদার জানমহম্মদজানের ঠিকানা দিয়ে পলন্দরী পাঠিয়ে দেন। ও দিকে পাঞ্জাবে তখন প্রচুর লোক গ্রেপ্তার বরণ করছে। এ দিকে সীমান্ত তহশিল পলন্দরীতে সুবেদার জানমহম্মদজান

বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ডোগরা-রাজের বিরুদ্ধে। পলন্দরীর সধন পরিবারের যুবকেরা বেরিয়ে পড়েছে বন্দুক নিয়ে। সারা অঞ্চলটাতেই সেনাবাহিনীর লোকেরা বাস করে, আর সধনেরা হলো মুসলমান রাজপুত। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পলন্দরী, নকর, গোরাহ্, জমাড় ও ধবুলের থানাগুলো প্রায় সাফ হয়ে যেতে লাগল। কোনো এক সেপাই খুন হলে, বাকীরা এমন উধাও হয়ে যায়, যেন তারা মাটিতে মিশে গেছে। পলন্দরীর বাজারে মাত্র দু' জন হিন্দু বেনে ছিল। তাদের একজন ডোগরা সরকারের সমর্থক। সে দোকানপাট বন্ধ করে শহরের রাস্তা ধরল। অন্য জন সুবেদার জানমহম্মদজানের সঙ্গে আপসরফা করে, টাকা দিয়ে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় কারবার চালাতে লাগল। তবে হ্যাঁ, পলন্দরীর নিম্নাংশে, যেখানে ধানক্ষেত রয়েছে, বাজারের বস্তিপাড়া রয়েছে, সেখানকার কিছু সাহসী হিন্দু ক্ষত্রিয় পরাজয় স্বীকার করে নিল না, তিন দিন ধরে তারা মোকাবিলা করল। অবশেষে তাদের মধ্যেও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল একটি ঘটনায়। তাদের দলপতি ছিল জঙ্গুইদারাম। ছ' ফুটের ওপর লম্বা। বাজারের আর সব যুবকদের মতোই দেখতে সুন্দর। তার স্ত্রীও খুব সুন্দরী, এবং তার ওপর মহম্মদজানের নজর ছিল। জঙ্গুইদারামের মেয়ে শকুন্তলাও কম সুন্দরী না, জানমহম্মদজানের ছেলে আহম্মদ আলি তার পেছনে ঘুরঘুর করত। দাঙ্গায় সেই জঙ্গুইদারাম মারা গেলো। জান-মহম্মদজানের সঙ্গী-সাথীরা বাজারের সারা বস্তিটাকে উড়িয়ে দিলো। জানমহম্মদ-জান জঙ্গুইদারামের স্ত্রীকে নিকা করল আর আহম্মদ আলির হাতে সমর্পণ করল শকুন্তলাকে। এই ঘটনায় সারা পলন্দরীর হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এখানে-ওখানে অনেক হিন্দু ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই পাঞ্জাবী হিন্দু, তারা বাইরে থেকে এ রাজ্যে এসেছিল, এখানে এসে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছিল। স্থানীয় শিখ ও ব্রাহ্মণেরা এখানে বাস করে আসছে অনেক আগে থেকেই, বলতে কি, ব্রাহ্মণেরা এই কাশ্মীরের উপত্যকায় হাজার বছর ধরে, এমন কি সধন মুসলমানদেরও আগে থেকে বসবাস করে আসছে, দাঙ্গায় তাদের ক্ষয়ক্ষতি যদিও খুব কম, তবু হিন্দু ক্ষত্রিয়দের খুন-জখম হতে দেখে গ্রাম-কে-গ্রাম হিন্দু বসতি ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে আসবাবপত্র নিজেদের পিঠে কিংবা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে শহরের পথ ধরল। সধনেরা পাড়ায় পাড়ায় সভা-সমাবেশ করতে শুরু করল। এইসব সভা-সমাবেশে ছিট্‌কে-ছাট্‌কে পড়ে থাকা হিন্দুদের মুসলমান করা হলো। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে এই রকম হাঙ্গামা কদাচ ঘটেনি, তাই প্রত্যেক সধন খুশীতে ডগমগ, গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হিন্দু ক্ষত্রিয়দের বাদ দিলে শিখ ও ব্রাহ্মণদের ধন-প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম, কারণ তারা সধনদের মতোই চাষী। ওদের অবস্থা সধন মুসলমানদের চেয়ে এমন কিছু ভালো নয়। দ্বিতীয়ত এটা আন্দোলনের প্রথম ধাক্কা। ব্যাপারটাকে তারা ঠিক মতো তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। অনেকে তো কেবল তামাশা

বলেই ধরে নিয়েছিল। কেউ কেউ কেবল ধর্মের ওপরেই বেশী জোর দিত, অন্য ধর্মাবলম্বীদের মুসলমান করাটাকেই সব কিছু বলে মনে করত। তাই যখন বহু হিন্দু-শিখ ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে পালাতে শুরু করল, তখন কেউ তাদের কিছু বলল না। পথেও খুব কম মারামারি হলো। ইয়ার-বন্ধু মিলে লোকে খুশীতে হাততালি দেয়, হিন্দুদের কমজোরি ও আলসেমি দেখে 'হো-হো' করতে করতে তাদের গালাগালি দেয়। কোথাও কোথাও ডাকাতি ও খুনের ঘটনাও ঘটে। মেয়ে অপহরণের ঘটনাও কম ঘটল না। এ সবের বিভীষিকায় হিন্দুদের প্রাণ উড়ে গেলো, শহরে যাওয়ার জন্যে বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়াটাকেই সমীচীন বোধ করল তারা। কয়েক দিনের মধ্যেই পলন্দরীর পুরো এলাকাতেই জানমহম্মদজানের পতাকা উড়তে লাগল, কেবল ব্রহ্মপুরের ওপরে কমাণ্ডার জারনালসিংয়ের কেল্লা আর তার চারপাশের এলাকা পরাজয়ের হাত এড়িয়ে বেঁচে গেলো। কারণ সেখানে উপত্যকার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক উঁচু পাহাড়ের ওপর কমাণ্ডার জারনালসিংয়ের মজবুত কেল্লা রয়েছে। কেল্লাটি রাজপুতদের। মহারাজা গুলাবসিংয়ের আমলে রাজপুতেরা জানপ্রাণ লড়াই করে ঐ এলাকার সধন সর্দারদের হাত থেকে কেল্লাটি ছিনিয়ে নেয়। আজও এই কেল্লায় জারনালসিংয়ের বাবা উধমসিং বাস করে, যে নিজের চোখে বহু লড়াই দেখেছে। উধমসিং আজও সেই কেল্লায় নিজের গোটা পরিবারটিকে নিয়ে লড়াইয়ের জন্যে অস্থির। তার পরিবারে বিয়াল্লিশ জন পুরুষ, মেয়েদের ও চাকর-বাকর মিলিয়ে সব সুদ্ধ গুনতিতে প্রায় সওয়াশো। কেল্লায় তিনটি পুরনো কামান রয়েছে, মহারাজা রঞ্জিৎসিংয়ের আমলের। বহু গাদা-বন্দুক রয়েছে, সে যুগের স্মৃতিচিহ্ন ঐগুলি। গত বছর জারনালসিং যখন ছুটি নিয়ে শহর থেকে এসেছিল, তখন শহরের বারুদখানা থেকে বহু তাজা মাল-মশলা চুরি করে এনে এখানে রেখে গিয়েছিল। সে সবের মধ্যে আধুনিক ধরনের রাইফেল মেশিনগানও রয়েছে। সৌভাগ্যবশত বারুদখানাটাও কমাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে ছিল, তাই সেই চুরি কারোর নজরে পড়েনি। স্বয়ং জানমহম্মদজানও জানত যে, কেল্লায় কিছু দাঙ্গাবাজ রাজপুত আর কিছু পুরনো অকেজো বন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই। এখন সারা পলন্দরী অঞ্চলটাই তার—কেবল ঐ কেল্লাটাই বাকী। গজনির সুলতান মামুদের সোমনাথ আক্রমণের মতোই কেল্লাটার ওপর আক্রমণ করা প্রয়োজন।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলে জানমহম্মদজান আবদুলকে ডেকে বলল, 'আজ রাতে কেল্লা আক্রমণ করা হবে, তৈরী থাকবে।'

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'কি কাজের দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর ?'

জানমহম্মদজান কেল্লার নকশা সামনে বিছিয়ে বলল, 'সামনে থেকে আমার ছেলে আহম্মদ আলি আক্রমণ করবে, পেছন থেকে তুমি। উত্তরের উপত্যকা থেকে আমি এগিয়ে যাব, দক্ষিণের উপত্যকা থেকে আমার চাচা খান গুলখান

নিজের ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে আক্রমণ করবে, কারণ ও দিকে দুর্গের পাঁচিল খুব নিচু। যদি ওখানে পৌঁছাতে পারে, তাহলে ঘোড়া-সমেত ওরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে।'

'কতজন সধন যুবক সঙ্গে থাকবে?'

'লড়াইয়ের জন্যে আড়াইশো যুবক সঙ্গে নিয়েছি, বাকী লোকেরা পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে হৈ-হল্লা করবে। ঢোল বাজানোর লোক প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে খবরও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দাজ, হৈ-হল্লা করার জন্যে পাঁচ-ছ' হাজার লোক জুটে যাবে। আমার তো মনে হয়, এক হাঁক দিলেই কেল্লার লোকজনের প্রাণ উড়ে যাবে। রাতে ছ' হাজার মশাল জ্বলে উঠতে দেখলেই হুঁশ হারিয়ে ফেলবে ওরা।'

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'লড়াইটা এই রকম করে হলে ভালো হয় না-কি যে, কেল্লা ঘিরে রেখে ওদের উপোসে মেরে ফেলা?'

জানমহম্মদজান বলল, 'কেল্লায় সব সময় দু'তিন মাসের খাবার-দাবার মজুত থাকে। অতদিন ঘিরে থাকতে গেলে আমরা নিজেরাই মারা পড়ব। শেষ পর্যন্ত লড়াই করতেই হবে। হতচ্ছাড়া বুড়ো উধমসিং খুনোখুনি না করে হার স্বীকার করবে না, বুঝলে!'

আবদুল ঘৃণাভরে বলে উঠল, 'কাফের!'

* * *

সূর্য ডুবে গেলে আহম্মদ আলি সুসজ্জিত হয়ে আবদুলের কাছে এল। জিজ্ঞেস করল, 'তৈরী?'

আবদুল রাইফেল তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর আবদুল লক্ষ্য করল যে, আহম্মদ আলির কপালে সিঁদুরের টিপ টক্‌টক করছে। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি আবার?'

আহম্মদ আলির মুখখানি একেবারে রাঙা হয়ে উঠল। থতমত খেয়ে বলল, 'ও, মানে শকুন্তলা লাগিয়ে দিলো, জোর করে।'

'জোর করে?' আবদুল বিদ্রূপের গলায় জিজ্ঞেস করল।

আহম্মদ আলি চুপ করে গেলো। তাকে এমন বিপন্ন দেখাচ্ছিল যে, সে আবদুলের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না।

আবদুল তার কপালের টিপটা মুছে দেওয়ার জন্যে এগিয়ে গেলো। আহম্মদ আলি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল খানিকটা, কিন্তু আবদুল এক ঝটকায় সিঁদুরের টিপটা মুছে দিলো। যেখানে আগে গোল টিপ ছিল, সেখানে এখন একটা লাল ধ্যাবড়া দাগ। আহম্মদ আলির কপালে ঘাম চক্‌চক করছে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। চুপচাপ মাথা হেঁট করে উঠোনে নেমে বাইরে এল।

দুই বন্ধু চুপচাপ নিজের নিজের ঘোড়ায় জিন কষে নিল, তারপর ব্রহ্মপুরের

দিকে রওনা হয়ে গেলো। সুবেদার দুপুরবেলাতেই তার বাহিনীটাকে প্রস্তুত করার জন্যে বাড়ি থেকে চলে গেছে, যাওয়ার সময় নির্দেশ দিয়ে গেছে, ওরা দু'জন যেন রাত দশটায় ব্রহ্মপুর গাঁয়ে গিয়ে হাজির হয়। ব্রহ্মপুর পলন্দরী থেকে মাত্র ছ' মাইল দূরে।

আজ রাত্রিটা বড় অন্ধকার। তাই যে রাস্তা ছিল ঝকঝকে, তা এখন ধূসর, ক্রমে সেটা কালো হয়ে উঠল। আহম্মদ আলি ও আবদুল চুপচাপ ঘোড়ার পিঠে চড়ে আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে চলেছে, মাটির কালো চাদরে যেন বড় বড় দুটি কালির দাগ নড়াচড়া করছে —দেখে মনে হয়, অন্ধকারের বুকে অন্ধকার হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চীল গাছের ভেতর দিয়ে শন্‌শন করে হাওয়া বয়ে যায়, যেন কোনো প্রেমিকা তার প্রেমিক চলে যাওয়ার পর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। কখনো-বা কোনো নালার গভীরে বয়ে যাওয়া জল অশ্রুর মতো চকচক করে ওঠে। কোনো ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসা বুনো ফুলের গন্ধ অকস্মাৎ বিস্মৃতির অতলান্ত থেকে জেগে ওঠা কোনো স্মৃতির মতো অনুভূত হয়। তারপর আবার স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। সেই স্তব্ধতার মধ্যে শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের মৃদু শব্দ আর তাদের উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু আওয়াজ কানে আসে, যেন রাত্রি হাঁটতে হাঁটতে হাঁসফাঁস করছে।

আহম্মদ আলি বলল, 'আমি মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

'সেই হিন্দু মেয়েটিকে?' আবদুলের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

আহম্মদ আলি তার কণ্ঠস্বরের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'তুমি জানো না, আমি যখন বাজারের বস্তিতে যেতাম, সারাটা দিন কাটিয়ে দিতাম সেখানে, যদি তাকে একবার কোথাও দেখতে পাই। তখন ভুলেও আমার মনে হয়নি যে, সে কখনও আমার হতে পারে। সে হিন্দু, আমি মুসলমান। আর তাছাড়া সে এমন সুন্দরী যে, আমি তার সঙ্গে কখনও কথা বলতেও পারতাম না। সে যখন ঝরণায় জল আনতে যেত, আমি ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতাম তাকে। এমন কি, ও হাত-মুখ ধুয়ে, কলসিতে জল ভরে মাথায় কলসি তুলে নিয়ে যখন চলে যেত, তখনও দাঁড়িয়ে থাকতাম। প্রায়ই তাকে তার ভেজা-ভেজা বড় বড় চোখের পাতা ফেলতে দেখতাম আর আমার বুকের কাঁপুনি শুরু হতো। ভাবতাম, এ মেয়ে কখনও কি আমার হতে পারে?'

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি আর একজনকেও ভালোবাসতে —মনে পড়ে সে কথা, সেই যখন আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলাম!'

আহম্মদ আলি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল, 'ও, সেই কথা! ওর কথা আর বোলো না। মানুষ তো এমনিতে যাকে ভালোবাসে, তাকে যখন পায় না, তখন অন্যদিকে মন বসাবার চেষ্টা করে।'

'আর এখন?'

'আর এখন, আমি তাকে পেয়েছি, জোর-জবরদস্তি করে বিয়েও করেছি। তুমি ভাবতে পারবে না, এখন আমি তার কাছে কত প্রিয়, কত ভালোবাসে সে আমায়! সত্যি বলছি, হিন্দু মেয়েরা বড় পতিব্রতা হয়।'

'আমার তো দেখেশুনে মনে হচ্ছে, কবে তুমি গলায় পৈতে জড়িয়ে মন্দিরে গিয়ে পুজো-আচ্চা করতে শুরু করবে।' —বিষভরা কণ্ঠে আবদুল বলল।

'না, কথাটা ঠিক নয়।' আহম্মদ আলি ভাবতে ভাবতে বলতে লাগল, 'ভাবো তো, ওর ওপর কত অত্যাচার হয়েছে। দাঙ্গায় মারা গেছে ওর বাবা। জোর-জবরদস্তি করে ওকে তুলে নিয়ে এসেছি আমি। এটা ঠিক, আমি ওকে বিয়ে করেছি, বাড়িতে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছি, আমার ভালোবাসা দিয়েছি, তবু, হাজার হলেও, মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা আর জাতি-ধর্ম বলেও তো কিছু আছে! আগে সে আমার ওপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে। আজ যখন আমি বেরিয়ে আসছিলাম, তখন তার চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল। বলল —তুমি আমার স্বামী, আমার প্রাণের ঈশ্বর। আজ যদি তোমার কিছু হয়ে যায়, আমি চিরকালের মতো সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।'

আহম্মদ আলি চুপ করল। ঘোড়া এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। আহম্মদ আলির ঘোড়া পথে এক জায়গায় জল খাওয়ার জন্যে দাঁড়াল। আবদুলের ঘোড়াটা এসেও দাঁড়াল সেখানে। আস্তে আস্তে জল খেতে লাগল ঘোড়া দুটি। সওয়ার দু'জন লাগাম ঢিলে করে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উবু হয়ে বসল।

আহম্মদ আলি বলতে লাগল, 'আমি বেরিয়ে আসছি এমন সময় সে একটা থালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আমার কাছে এল, আমার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে আমার মুখের চারদিকে থালা ঘোরাল —ওকে খুব ভালো লাগছিল আমার। সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাপারই ভুল বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

আবদুল তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'ওঃ, বুঝেছি এ-বার।'

'আমিই এখনো পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারলাম না, তুমি বুঝলে কি করে! তবে এটা ঠিক জানি, আমরা যা করছি, তাতে কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই গলদ রয়েছে।'

'কাফেরটা তোমায় তুক করেছে।'

'না, সেটা ঠিক নয়, কক্ষনো নয়, খোদা সাক্ষী। আমি হিন্দু হইনি, আমি মুসলমান। আমি ডোগরা-রাজের দুশমন, থাকবও তাই। তার বিরুদ্ধে নিজের প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু এখন খুবই মনে হচ্ছে, আগে এমন কখনও ভাবিনি, আমাদের কাজকর্মে নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও গলদ রয়েছে।'

'গলদটা কি? তুমি কেল্লা আক্রমণ করতে চাও না?'

'চাই। মনেপ্রাণে চাই! রাজপুতেরা যেভাবে আমাদের কেল্লা দখল করে নিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই আমিও তাদের কেল্লা দখল করে নিতে চাই।'

'তবে তুমি কি হিন্দুদের মুসলমান হতে দেখে খুশী হও না?'

'হুই, কিন্তু...'

'কিন্তু-টিন্তু কিছু না। আমি তোমায় পরিষ্কার জিজ্ঞেস করছি, এ অবস্থায় তুমি কি শকুন্তলাকে জোর করে বের করে নিয়ে যেতে না?'

'করতাম, অবশ্যই করতাম! আমি যদি মুসলমান না হতাম, তবুও তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতাম —সেটা আমার ভালোবাসার কারণেই। কিন্তু আমি হিন্দু মেয়েদের লুটের মাল বলে মনে করিনে। আগে মনে করতাম। কিন্তু এখন বুঝি যে, প্রত্যেক বাড়ির মেয়েই এই রকম। তাদের মান-মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করা আর নিজের বাড়ির মান-মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করা, একই কথা।'

'তুমি কি জানো, আমারও এক বোন ছিল, রজ্জি!' আবদুল খুব তিক্ত গলায় কথাগুলো বলল।

আহম্মদ আলি চুপ করে গেলো। নিজের বোনের কথা মনে পড়তেই আবদুলের স্মৃতিপটে ভেসে উঠল তার বাবার লাশ, তার মা-র বৈধব্য। মনে পড়ে গেলো পুঞ্চের বাজারে পুলিশের গালাগালি। জেলখানায় ওয়ার্ডারদের দুর্ব্যবহারের কথাও মনে পড়ল তার। প্রত্যেকটি স্মৃতি চাবুকের মতো তার মস্তিষ্ককে প্রহার করছে যেন। জোরে জোরে তার নিশ্বাস পড়তে লাগল। আহম্মদ আলির পেছনে পেছনে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ ঘোড়ার পেটে এড়ি মেরে এগিয়ে গেলো। আহম্মদ আলি তাকে ডাকতে ডাকতে ঘোড়া ছোটাল পেছনে পেছনে। প্রায় দুই ক্রোশ এইভাবে গিয়ে আহম্মদ আলি আবদুলের সঙ্গ নিল।

আহম্মদ আলি বলল, 'আমার কথায় রাগ করলে?'

আবদুল বলল, 'তাতে তোমার কোনো দোষ নেই।'

'ও সব কথা ভুলে যাও, লড়াইয়ের কথা ভাবো এখন। শয়তান জারনাল-সিংয়ের সঙ্গে লড়াই করার সময় মানসিংয়ের সঙ্গেও লড়াই হবে। দারুণ মজা! মনে আছে, সেই যে সে দিন ভুতিয়া থেকে শতন পর্যন্ত যে ঘোড়া দৌড়িয়েছিল?'

'আর সেখানে হেডমাস্টার তোমার রিভলবার কেড়ে নিয়ে চুঙ্গী অফিসে জমা রেখে দিয়েছিলেন।'

'আজ তার বদলা নেওয়া যাবে।'

হঠাৎ সামনে থেকে খচ্চরের আওয়াজ কানে এল। ওরা দু'জন রাস্তা ছেড়ে ঘোড়া নিয়ে ওপরে উঠে চীল গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা দল তাদের কাছ দিয়ে চলে গেলো। আগে আগে এক ব্রাহ্মণের ছেলে খচ্চরের পিঠে তার স্ত্রীকে চড়িয়ে হাতে মশাল নিয়ে চলেছে। দু'জন শিখের হাতে গাদা বন্দুক, কিন্তু তাদের মুখচোখ ভয়ে ফ্যাকাশে। তারপর দু'তিনটে খচ্চরের পিঠে আসবাবপত্র, আসবাবপত্রের ওপর ছেলেমেয়েদের বেঁধে রাখা হয়েছে, কারণ তারা এত ছোট যে নিজেরা খচ্চরের পিঠে বসে থাকতে সক্ষম নয়।

এক বৃদ্ধা যেতে যেতে মালা জপছে। একটি তরুণী তার শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে আর মন্ত্র পাঠ করছে। মশালের আলোয় তার মায়া-মমতা ভরা মুখখানি খুব সরল ও সমস্ত ব্যাপারে নির্বিকার বলে মনে হচ্ছে। মশালটা চলে গেলো, তারপর বহু অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি অতিক্রম করে গেলো তাদের। অবশেষে আর একটি মশাল সামনে এল। সেই মশালের আলোয় দেখা গেলো একটি যুবককে, সঙ্গে এক অসাধারণ সুন্দরী ব্রাহ্মণের মেয়ে। বড় চিন্তিত তারা। মশাল নিয়ে চলেছে যুবকটি, সে এমন গভীর সকাতর দৃষ্টিতে মেয়েটিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে যেন সে মেয়েটির ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিরকালের জন্যে নিজের অন্তরে মুদ্রিত করে নিচ্ছে।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'গুল্লা, সামনের গাঁয়ে পৌছেই তুমি কি আবার ফিরে যাবে ?'

মশাল ধরে থাকা যুবকটি মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপর মশাল এবং সেই-সঙ্গে মেয়েটি ও যুবকটি অনেকখানি এগিয়ে গেলো। সে কি জবাব দিলো, আহম্মদ আলি তা জানতে পারল না, কিন্তু মেয়েটির কণ্ঠস্বরের সেই কাতরতা তার গলায় ফাঁসির দড়ির মতো আটকে গেলো যেন—

'তুমি কি আবার ফিরে যাবে ···তুমি কি আবার ফিরে যাবে ?'

ভালোবাসাও কি মুসলমান হয় ? ভালোবাসাও কি শিখ হয় ? ভালোবাসা কি কেবল ভালোবাসা হয় না ? এই ঘটনায় আবদুলের মনও প্রভাবিত না হয়ে পারল না। তার শরীরের প্রতিটি রোম যেন গুল্লার জবাব শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল, কিন্তু তখন মশালটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, চারদিক অন্ধকার, কোনো জবাব শুনতে পেল না সে। আহম্মদ আলি মনে মনে বলল —কতদিন পর্যন্ত মানুষের ভালোবাসা এ রকমভাবে একজনকে অন্য কোনো গাঁয়ে পৌছে দিয়ে ফিরে যেতে থাকবে ? কতদিন পর্যন্ত তার লজ্জার উষর প্রান্তরে ছোট ছোট মশাল জ্বলে উঠে নিভে যেতে থাকবে, আর অন্ধকার তার ক্ষতচিহ্ন ও দগদগে ঘা নিয়ে এক কুষ্ঠব্যাধির মতো পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে —কতদিন পর্যন্ত গুল্লা··· কতদিন পর্যন্ত···

কিন্তু মশালটা চলে গেছে তখন, এখানে ঘন অন্ধকার, আহম্মদ আলির মনে হলো যেন এ পথে এখন আর এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না।

ফের আবদুল সারা রাস্তা তার সঙ্গে কথা বলল না। তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মপুরের একেবারে কাছে এসে পৌছে আবদুল মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ঐ মেয়েটির মুখখানা দেখে ঠিক আমার বোন রজ্জি বলে মনে হচ্ছিল।'

আহম্মদ আলি আবদুলের কথাটা শুনে খুব খুশী হলো। সে সময়ে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে না থাকলে সম্ভবত আবদুলের গলা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু ঐ মুহূর্তে তা করা উচিত বোধ করল না। কেবল জোরে আবদুলের হাত টিপে দিলো সে,

তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে নিচের টিলায় নেমে গেলো, যেখানে তার বাবা তিনশো সধন যুবক নিয়ে তাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জন ঘোড়সওয়ারই সামনে এগিয়ে গিয়ে সুবেদার জানমহম্মদজানকে সালাম করল।

জানমহম্মদজান পকেট থেকে ঘড়ি বের করে তার উজ্জ্বল ডায়ালে সময় দেখল। দশটা বাজতে দশ মিনিট দেরি।

আহম্মদ আলি জিজ্ঞেস করল, 'সবাই এসে গেছে?'

সুবেদার জানমহম্মদজানের চোখে-মুখে বিজয়োল্লাস দেখা দিলো।

প্রায় তিনশো সধন যুবক হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে আবদুলের গায়ের রক্ত যেন টগ্‌বগ করে ফুটতে লাগল। তার সারা শরীরে রক্তের ঝড় বয়ে গেলো, প্রত্যেকটি রোম খাড়া হয়ে উঠল। সে ঘোড়ার জিনে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলো, 'আল্লাহো আকবর!'

তিনশো যুবক একসঙ্গে বলে উঠল, 'আল্লাহো আকবর!!'

ঠিক সেই সময় তবলায় চাঁটি পড়ল।

একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। তবলায় প্রথম চাঁটি পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপত্যকায় এবং উপত্যকার চারদিকের পাহাড়ে লুকিয়ে-থাকা বাদকেরা এখানে ওখানে ঢোল বাজাতে শুরু করল। ঢোলের সেই শব্দে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেলো। অবশেষে অন্ধকার ভয়ঙ্কর চিৎকারে ভরা এক আওয়াজে পরিণত হলো, অন্ধকার একটি লোহার তানপুরার মতো বাজতে শুরু করল, রাত্রির প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস বিভীষিকাময় হয়ে উঠল, উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তারপর পাহাড়ে পাহাড়ে এখানে-ওখানে মশাল জ্বলে উঠতে লাগল, যেন শত শতাব্দীর জমে থাকা পাহাড় ও উপত্যকাগুলো নিজের নিজের জায়গা থেকে নড়তে শুরু করেছে, শত শতাব্দীর জমে থাকা পথগুলো নিজেদের রক্তিম উত্তাপে গলতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হাজার হাজার মশাল অন্ধকারের আচ্ছাদন বিদীর্ণ করে পরস্পরের কাছাকাছি হতে লাগল, আবদুলের মনে হলো যেন বিদ্রোহের আকর্ষণ আলোর ছোট ছোট অণুগুলোকে নিজের দিকে টেনে এনে রাতের আঁচলে একটি ছোট্ট দিন ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। সে আলো বড় অদ্ভুত, পূবদিক থেকে ফুটে ওঠা উষার মতো আবির্ভূত হয় না, বরং খণ্ড খণ্ড করে কাটা ছোট ছোট ন্যাকড়ার টুক্‌রোর মতো দীন-দরিদ্র কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে শত শতাব্দীর দারিদ্র্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে নিজের জ্বালামুখী সঙ্কল্পকে দু'হাতে তুলে ধরে সংগ্রামের জন্যে এগোচ্ছে। ঢোলের আওয়াজ ও আলোর টুক্‌রোগুলোর সান্নিধ্যে রাতের আবরণ লোহার পাতের মতো গরম হয়ে উঠছে—ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, লাল হয়ে উঠছে। তারপর, জানমহম্মদজান ও তার সঙ্গীরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ব্রহ্মপুরের নিচে যেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে ছিল, হাজার হাজার আলো জ্বলজ্বল করে উঠে রাতটাকে দিনে রূপান্তরিত করে দিলো।

জানমহম্মদজান বর্শা তুলে ধরে বলল, 'হে নামাজীরা, এগিয়ে চলো। ঐ হ্যাখো, সামনে কেল্লা দেখা যাচ্ছে।'

আবদুল চিৎকার করে বলল, 'আল্লাহো আকবর!'

হঠাৎ দু'জন ঘোড়সওয়ার জনতাকে ভেদ করে এগিয়ে এল। আবদুল মশালের তীব্র আলোয় দেখল, একজন হসমত আল্লাবেগ, যে এক সময় টিকরী শাহমুরাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, অন্যজন সওকত। হসমত আল্লাবেগ বলল, 'সরদারজী! কেল্লার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে এই ব্রহ্মপুর গ্রামটাকে সাফ করে দেওয়া যাক না কেন, এটা তো ব্রাহ্মণদেরই বসতি!'

সওকত বলল, 'শুধু আপনার হুকুমের অপেক্ষা, বাকী সব কাজ আমরা দেখে নিচ্ছি। কাফেরদের এই বসতি পুড়িয়ে ছাই করে দেবো।'

শত শত কণ্ঠে একসঙ্গে চিৎকার উঠল, 'ছাই করে দাও, কাফেরদের পুড়িয়ে ছাই করে দাও।'

জানমহম্মদজান বর্শা ওপরে তুলল, স্তব্ধ হয়ে গেলো চারদিক।

'সেটা অসম্ভব।' জানমহম্মদজান বলতে শুরু করল।

আহম্মদ আলির গলায় আটকে যাওয়া কিছু যেন নেমে গেলো।

জানমহম্মদজান বলল, 'ব্রহ্মপুরের ব্রাহ্মণেরা এখানে শত শত বছর ধরে বাস করে আসছে, সধনদের দেখাশোনায়। আমরা ওদের ধর্মও নষ্ট করিনি। আমাদের মতো ওরাও কৃষক। তাছাড়া ওরা আমার সরদারী মেনে নিয়েছে। আমি ওদের প্রাণরক্ষার অভয় দিয়েছি। ব্রহ্মপুরের ব্রাহ্মণদের দিকে যদি কেউ আড় চোখেও তাকায়, আমি তার চোখে এই বর্শা ঢুকিয়ে দেবো।'

সওকত ঠোঁট কামড়ে ছোরা নিচে নামিয়ে নিল।

'আমাদের শত্রু ব্রহ্মপুরের ব্রাহ্মণ নয়, সে হলো ডোগরা সরকার, যার কেল্লা ঐ সামনে দেখা যাচ্ছে। ধর্মযোদ্ধাগণ, পাহাড়ের মাথায় ঐ যে কেল্লা, আমাদের উপত্যকার মাঝখানে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে আছে, উপত্যকা থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়াটাই আমাদের প্রথম অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, যাতে গোটা সধন সম্প্রদায় স্বাধীন হয়ে যায়।'

'জানমহম্মদজান জিন্দাবাদ!'

'আহম্মদ আলি জিন্দাবাদ!'

'সধন-রাজ, জিন্দাবাদ!'

'বীরগণ, কেল্লা ঐ সামনে!'

হসমত আল্লাবেগ মাথা নিচু করে শত শত মশালের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'সরদারের যা আদেশ, আমরা তা পালন করতে বাধ্য। কেল্লা জয় করার জন্যে আমরা আমাদের রক্ত দেবো। বীরগণ, সামনে এগিয়ে চলো।'

'আল্লাহো আকবর!'

সহস্র মশাল কেল্লার দিকে এগিয়ে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ছোট্ট দিন, একটি ছোট্ট জ্যোতির্বলয় সেই পাহাড়টিকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিল, যে পাহাড়ের ওপর কেল্লাটিকে এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো দেখা যাচ্ছে।

আবদুল আহম্মদ আলিকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি ইচ্ছে ?'

আহম্মদ আলি আবদুলকে বুঝিয়ে বলল, 'ইচ্ছেটা হলো —এই হাজার হাজার লোক মিলে নিচেপাহাড়তলিতে ঢোল বাজাবে আর মশাল জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে কেল্লার লোকজনের মনে ভয় ছড়াবে। ইত্যবসরে আমাদের আড়াই-তিনশো যুবক চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে। পাহাড়ের ওপর উঠতে থাকবে। উদ্দেশ্যটা হলো, দু'দিক থেকে আক্রমণ। মনস্তাত্বিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই। আমার মনে হয়, লড়াই যদি হয়ও তো খুব অল্পই হবে। ওদের কাছে রয়েছে পুরনো অস্ত্রশস্ত্র আর গাদা-বন্দুক। আমাদের কাছে মহাযুদ্ধের নতুন বন্দুক। আমার তো ধারণা, লড়াই আদপেই হবে না, যদি হয়ও, আমরা খুব শীগ্‌গীরই ওদের কাবু করে ফেলব।'

'পরিকল্পনা তো ভালোই, কিন্তু…'

'কিন্তু কি…' জানমহম্মদজান রাগে চিৎকার করে উঠল।

আবদুল বলল, 'কিছু না সরদার।'

সুবেদার জানমহম্মদজান তাড়াতাড়ি তার লোকজনকে চার অংশে ভাগ করে তাদের এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো। সধন যুবকেরা কেল্লাটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। দ্রুততার সঙ্গে সন্তর্পণে উঠছে তারা, কিন্তু খুব সাহসের সঙ্গে, নির্ভয়ে। মাঝে মাঝে বন্দুকের গুলিও ছোঁড়ে কিন্তু কেল্লা থেকে কোনো জবাব আসে না। এক সধন সরদার বলল, 'ভয় পেয়েছে, মুরগির ছা-র মতো। গুটি মেরে গর্তে বসে আছে। একটু পরেই দেখো না, আমরা কেল্লায় ঢুকে ওদের গর্ত থেকে কেমন করে টেনে বের করি।'

আহম্মদ আলি ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'দেখা যাবে।'

আবদুল বলল, 'কোনো পরোয়া নেই সরদার। আমাদের কাছে তো কয়েকখানা রাইফেল আছে, ওদের কাছে গাদা-বন্দুক। ছ্যাকড়া গাড়ি উড়োজাহাজের সঙ্গে কি করে আর মোকাবিলা করবে!'

জানমহম্মদজান ওপরে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আহা, এখন আমাদের কাছে যদি একটা উড়োজাহাজ থাকত, ব্যস, এক বোমা-বর্ষণেই কাম ফতে!'

আহম্মদ আলি দুঃখ করে বলল, 'যা নেই, তার কথা বলে লাভ কি আব্বা!'

ওরা এখন কেল্লার প্রায় কাছে এসে পৌছেছে। কেল্লার প্রাচীর থেকে আন্দাজ দুশো গজ দূরে জানমহম্মদজান সবাইকে থামতে আদেশ করল। বলল, 'শত্রু ধূর্ত। ওরা নিজেদের বারুদ বাঁচাচ্ছে। তোমরা সামনের দুশো গজ খুব

সতর্ক থাকবে। ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে আড়ালে এগোতে হবে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে।'

ওরা এগিয়ে চলল। দুশো গজের মধ্যে আর দেড়শো গজ বাকী আছে। নিচে উপত্যকায় চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ে চলেছে। নিজেদের সরদার ও সেপাইদের কেল্লার এত কাছে পৌছাতে দেখে বাদকেরা খুব জোরে জোরে ঢোল বাজাচ্ছে। অনেকে খুশীতে নাচানাচি করছে। আবার কেউ কেউ আহ্লাদে আটখানা হয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করছে, যদিও জানমহম্মদজানের কঠোর নিষেধ ছিল। সধনেরা আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়েছে। কেল্লা নিস্তব্ধ। অবশেষে সধনেরা হামলা চালানোর জন্যে জোরে আওয়াজ তুলল, 'আল্লাহো আকবর!'

ঠিক সেই সময় কেল্লার চারদিকের দেওয়াল থেকে যেন লাভা বেরিয়ে আসতে লাগল। দুটি মেশিনগানের ক্রশ ফায়ারিং-এ সম্মুখবর্তী সধনেরা যেন ছোলাভাজা হয়ে গেলো। পুরনো কামানের গর্জন বাঘের হুঙ্কারের মতো উপত্যকাকে আতঙ্কিত করে তুলল। পুরনো গাদা-বন্দুকের গুলি নির্ভুল লক্ষ্যে কয়েক জন সধন যুবকের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। মুমূর্ষু সধনদের আর্তনাদ, শোরগোল, ব্যাকুলতা, মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা যেতে লাগল—

'ওদের কাছে তো মেশিনগান রয়েছে!'

'অটোমেটিক রাইফেলও রয়েছে!'

'কামান রয়েছে!'

'পালাও —পালাও!'

'থামো —থামো তোমরা!'

'পালাও —পালাও —পালাও। এই ক্রশ ফায়ারিং-এ প্রাণ বাঁচানো মুশকিল।'

জানমহম্মদজান চিৎকার করে বলল, 'থামো —থামো বলছি, আহাম্মকেরা!'

কিন্তু বাহিনী হেরে গেলো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল তারা। তারপর নিচের উপত্যকাতে হুলুস্থুলু পড়ে গেলো। লোক পালাতে শুরু করল। —এই রাজপুত এল! ঐ ডোগরা এল! কেল্লার ভেতরে পুরো এক ব্যাটেলিয়ন লুকিয়ে বসে আছে! ওরা হামলা করার জন্যে আসছে! —এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল যে মশালগুলি, দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগল। পাহাড়-তলিতে যে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে চিড় ধরল, ফাটল দেখা দিতে লাগল। টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেলো দিন। অন্ধকার বাড়ছে। ঢোলের আওয়াজ ঢিমে হতে হতে, ক্রমশ দূরে চলে যেতে যেতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মশালগুলি দূর পাহাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে, উপত্যকায় উপত্যকায় নক্ষত্রের মতো টিম্‌টিম করতে করতে নিভে যাচ্ছে। তারপর এক সময় চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। আবদুল আহত আহ্‌মদ আলিকে পিঠে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে

ভাবছে —কত কষ্টে এই আলোর টুক্‌রোগুলোকে জুড়ে জুড়ে দিন তৈরী করা হয়েছিল! কিন্তু সেই সেলাই এত তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেলো কিভাবে! সুতোটা কি পল্‌কা ছিল, না কাপড় মজবুত ছিল না! জানমহম্মদজান কোথায়? তার সেপাইরাই বা কোথায়? হসমত আল্লাবেগ ও সওকত এখানে কি করছে? —আবদুল হেঁটে চলেছে আর তার পিঠে আহত আহম্মদ আলি কাতরাচ্ছে। ব্রহ্মপুরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা লক্ষ্য করল, গ্রামখানা দাউ-দাউ করে জ্বলছে, কোথাও একটা জ্যান্ত প্রাণী নড়াচড়া করছে না।

আহম্মদ আলি কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'এটা ওরা ভালো করল না। আমাদের হুকুম অমান্য করেছে ওরা।'

আবদুল বলল, 'নিজেরা ধ্বংস হয়ে এই প্রতিশোধ নিয়েছে সধনেরা।'

'আমাদের সধনেরা এমন করতে পারে না —ইয়া আল্লা, কি যন্ত্রণা!'

'ভেবো না, একবার তুমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলে আর মারা যাবে না।'

সেই একই রাস্তা, যাওয়ার সময় কত উদ্দীপনা ছিল, ফেরার পথে কত অবসন্নতা। এই রাস্তা দিয়েই সেই শোকাকুল দলটি গিয়েছিল গুল্লার মশালের আলোয়। আবদুলের মস্তিষ্কের গভীরে তাদের ফ্যাকাশে, মুষড়ে-পড়া মুখগুলো হেমন্তের হাওয়ায় ঝরে-পড়া শুক্‌নো পাতার মতো ভেসে উঠল। অমনি সে হঠাৎ চম্‌কে উঠল, কোনো এক বিশাল রহস্যের যনিবকা যেন উন্মোচিত হয়ে গেছে তার সামনে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল সে।

আহম্মদ আলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আবদুল দাঁড়ালে সে খানিকটা আরাম বোধ করে, হাঁটলে তার নড়াচড়ায় কষ্ট হয়। একটু পরেই আবদুল আবার হাঁটতে শুরু করল, আহম্মদ আলি আবার কাতরাতে লাগল।

আহম্মদ আলির কষ্টের কথা ভেবে আবদুল একটি সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজে বের করল। যদিও রাস্তাটা চড়াই, তবু তাতে একটু সময় বাঁচে। আবদুল সেই চড়াই ভেঙে বাজারের বস্তির একটি নালার কাছে এসে পৌঁছাল।

সেখানে নালার ধারে একটা উঁচু পাথরের ওপর সে একজন মশালচীকে দেখতে পেল। একা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীর জলে সে তার মশালের প্রতিবিম্ব দেখছে। তৎক্ষণাৎ আবদুল তাকে চিনতে পারল —গুল্লা।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখছ?'

মশালচী চম্‌কে উঠল। দেখল যে, আবদুল একজন আহত ব্যক্তিকে পিঠে নিয়ে আছে। সে লাফ মেরে কাছে এল, জিজ্ঞেস করল, 'কেল্লার হামলায় ও জখম হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তা জানলে কি করে?'

'এ দিক দিয়ে অনেক সধন গেলো কি-না!'

আবদুল চুপ করে রইল।

গুল্লা বলল, 'পরের বার আক্রমণে আমরা ঠিক জিতে যাব। সধনেরা গুলিকে ভয় পায় না, ভয় পাওয়া তো হিন্দুদের কাজ।'

আবদুল তার মুখখানি লক্ষ্য করে বলল,'তুমি কোত্থেকে আসছ ?'

'আমি কাজে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম না, নইলে আমিও এই যুদ্ধে শরীক হতাম, অবশ্যই শরীক হতাম। আচ্ছা, আমি এখন আসি, খোদা তোমার সঙ্গীকে শীগ্‌গীর ভালো করে দিন।'

মশালচী দ্রুত চলে গেলো। আবদুল তার দ্রুততা ও অস্থিরতার কারণটা বুঝতে পারল। গুল্লা মিথ্যে কথা বলে গেলো। কিসের জন্যে সে এই মিথ্যে কথা বলল ? কেন সে তার পুণ্যকে রাতের অন্ধকারে ঢাকল ? কেন পাপ প্রশ্ন হয়ে উঠল, আর পুণ্য রাতের অন্ধকার ? আর কতদিন গুল্লার ভালোবাসা মাথা কুটে-কুটে ফিরে যাবে ?

আহম্মদ আলি জিজ্ঞেস করল, 'ও সেই মশালচীটা না ?'

তখন আবদুল আহম্মদ আলিকে নিয়ে নালা পার হচ্ছে। আহম্মদ আলি ঠিক নালার মাঝখানে তাকে প্রশ্নটা করল যখন আবদুলের কোমর পর্যন্ত জল।

আবদুল জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সে-ই।'

কথাটা বলেই আবদুল জলের মধ্যে দু'পা এগিয়ে গেলো। জল তার কোমর ছাড়িয়েছে।

আহম্মদ আলি চুপ করে রইল। সে জানত যে, এ সময়ে আবদুল আর সে একই কথা ভাবছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহম্মদ আলি আর থাকতে পারল না, জিজ্ঞেস করে বসল, 'আবদুল, যদি গুল্লার ভালোবাসা মিথ্যার আবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে পড়ত, তাহলে··· ?'

আবদুল রুক্ষ স্বরে বলল, 'তাহলে আমি তোমায় এই জলে ফেলে দিতাম।'

মুহূর্তের জন্যে আহম্মদ আলির যন্ত্রণা-কাতর মুখের ওপর একটা মৃদু হাসি খেলে গেলো, যেন অন্ধকারে জোনাকি জ্বলে উঠল। পর মুহূর্তেই সে আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করল, যাতে আবদুল জানতে না পারে যে, সে দুর্গপ্রাচীরে কত গভীর ছিদ্র করে দিয়েছে।

দশ

স্তর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড ডককে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই কুয়োগুলোর কি হলো ?'

ডক জবাব দিলেন, 'কুয়োগুলো তো অমনিই রয়েছে, সেগুলো থেকে কেবল মাল তুলে নিয়ে লাহোর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'মাল কতটা হলো ?'

ডক নিরাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'বেশী না, এই চার কোটি টাকার মতো হবে —মণিমুক্তো, মোহর আর পুরনো গয়নাগাটি। কিছু পুরনো দামী দোশালা গালচেও আছে, ওগুলো এখানে নীলাম করে দেওয়া যাবে।'

স্যর টমাস ও কর্নেল ডক দু'জনেই রেসিডেন্সির বাগানে বসে ছিলেন। ছাদ দেওয়া জায়গাটায় দুটি চেয়ার পেতে নিয়েছেন। তাঁদের চারদিকে আঙুরলতার সুন্দর পাতা ভেদ করে রোদ এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে সবুজ পাতার আড়ালে একটা ছোট্ট বিজলি বাতি জ্বলছে। সবুজ সবুজ পাতার মাঝে মাঝে ক্রীম রঙের আঙুরের থোকা ঝুলছে। ডক উঠে গিয়ে এক থোকা আঙুর পেড়ে নিয়ে এসে তেপায়ার ওপর রাখলেন।

স্যর টমাস বললেন, 'চার কোটি টাকার জিনিসপত্তরে মহারাজার সঙ্গে লড়াইয়ের কি ফয়সালা করব! ভেবেছিলাম, অন্তত পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকার মাল হবে —অর্ধেকটা নিয়ে এই জায়গীরটাকে স্বাধীন করে দেবো, কিন্তু এখন দেখছি, ভীষণ কম।'

'হুঁ!' ডক আঙুর খেতে খেতে কি যেন ভাবছিলেন।

'সংগ্রামসিংয়ের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থেক। আজকাল মলী ওর সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করছে।'

'মলীকে নয়, সংগ্রামসিংকেই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

'বেশ মেয়েটি!'

ডক আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, 'জহমত খাঁ কোথায়?'

স্যর টমাস চোখ কুঁচকে বললেন, 'তুমি ওর নাম জানলে কি করে?'

'সলন্দীর অবস্থা কি রকম?'

'ঠিক আছে।'

'আর বানা তহশিলের?'

'সেখানেও বেশ চলছে। চারটে তহশিলেই হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। হিন্দু ও শিখেরা হয় মুসলমান হচ্ছে, নয় তো দল বেঁধে বেঁধে শহরে আসছে। এ পর্যন্ত এখানে গোটা দশেক দল এসে পৌঁছেছে। তাতে শহরেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দারুণ টানা-হেঁচড়া শুরু হয়ে গেছে।'

ডক মুখে আঙুর পুরতে পুরতে বললেন, 'বোধহয় সব জায়গাতেই এই একই অবস্থা!'

তাঁর মুখ মিষ্টি রসে ভরে গেলো। খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলেন টমাসকে, 'শুনছি এখানকার জেলখানা থেকেও বহু কয়েদী ফেরার হয়ে গেছে?'

স্যর টমাস অন্য কোনো কথা ভাবছিলেন। তিনি আবার বললেন, 'মলীর দিকে লক্ষ্য রেখ।'

ডক চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'চিন্তা কোরো না। ও যেমন সংগ্রামসিংকে বিয়ে করবে না, তেমনি তোমাকেও না।'

স্যর টমাস চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যান আর কি! কিন্তু ব্যাপারটা এমনি আচম্‌কা ঘটে গেলো যে, ডকের কথার একটা জবাব দেওয়ার আগেই, ডক 'সো লং' বলে সেখান থেকে কেটে পড়লেন।

'সোয়াইন —সোয়াইন!' স্যর টমাস দাঁতে দাঁত ঘষে গজরাতে গজরাতে আঙুরের থোকাটাকে সজোরে একটা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

এগারো

জেলখানা থেকে যে পঁচিশজন কয়েদী পালিয়েছিল, তাদের মধ্যে ফজল, মঞ্জুর ও মৌলভী সাহেবও ছিল। বেচারা বুড়ো মৌলভী পালাতে চায়নি, কিন্তু ফজল আর মঞ্জুর তাকে জোর-জবরদস্তি করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। রাতভর কনোতিয়ার জঙ্গলে কাটাল তারা। পরদিনও সেখানেই। তৃতীয় দিন রাত্রিবেলা থনেতর উপত্যকা পার হয়ে সধন উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছাল। এখানে কাগান নদী বিস্তৃত হয়ে পুঞ্চ ওয়ারমায় গিয়ে পড়েছে। এই বিস্তৃত সুন্দর উপত্যকায় ধানক্ষেতের মাঝে মাঝে ক্ষুদে ক্ষুদে টিলার ওপর অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম। থনেতর-এর কোলে ওগুলো যেন গ্রাম নয়, খেলাঘর বলে মনে হয়। উপত্যকার মাঝখানে পুঞ্চ নদীর তীর ধরে মানুষের একটি দীর্ঘ সারি শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। দলটার এক মাথা থনেতর-এর কাছে এসে পৌঁছেছে, অন্য মাথা তখনও উপত্যকার মধ্যিখানে।

ফজল বলল, 'অন্তত আট হাজার লোক হবে।'

মৌলভী তার ঝাপ্‌সা চোখ ওপরে তুলে বলল, 'না, আরও বেশী।'

মঞ্জুর বলল, 'এখন তর্ক করার সময় নয়। সামনে যাওয়া যাবে না —দলটা রয়েছে, পেছনে জেলখানা।'

ফজল একটি ঘন ডালপালার তুঙ্গ গাছ দেখিয়ে বলল, 'এস, এই গাছটায় উঠে বসি। দলটা নিচে দিয়ে চলে যাবে, কেউ বুঝতেই পারবে না।'

ফজল আর মঞ্জুর দু'জনে চেষ্টাচরিত্র করে মৌলভীকে গাছে তুলে দিলো। তারপর তিনজনে ঘন ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। দলটা গাছের তলা দিয়ে চলে যেতে লাগল।

সন্ধ্যে হয়ে গেলে তবেই তারা গাছ থেকে নামবার সুযোগ পেল। দিনভর গাছের ডালে বসে থাকার দরুন তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৌলভী বেচারী তো কাতরাতে শুরু করেছিল, কিন্তু মঞ্জুর তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিল

বলেই রেহাই পেয়ে গেছে কোনো রকমে। দলটা চলে যেতেই তারা গাছ থেকে নেমে পড়ল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপত্যকা পেরিয়ে সবচেয়ে কাছের গ্রামটায় গিয়ে হাজির হলো। একটা জনশূন্য বাড়ি দেখে আশ্চর্য হলো তারা। বাড়িতে একটাও মানুষ নেই। একেবারে ফাঁকা। ঘরগুলো খাঁ-খাঁ করছে!

'ইতর, মড়াখেকো!' ফজল রাগে চিৎকার করে উঠল, 'উনুনের মাটিটুকু পর্যন্ত নিয়ে গেছে!'

একটা ছোট নালা পেরিয়ে আর একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তারা। দরজার কপাট খোলা আছে হাট করে। মঞ্জুর ভেতরে ঢুকতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল, মঞ্জুরের পায়ে এসে জড়াজড়ি করতে লাগল, তৎক্ষণাৎ তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলো সে।

সে বাড়িতেও কিছু নেই। একটা পুরনো ছেঁড়া কম্বল, তাতে মদ আর রক্তের গন্ধ। একপাশে দড়িতে বাঁধা একটি ছাগল ম্যা-ম্যা করছে।

ফজল তার বাঁটে হাত দিয়ে বলল, 'দুধেল ছাগল, মৌলভী সাহেব!' কথাটা বলেই ফজল দুধের ধারা মুখ পেতে নিতে লাগল।

মৌলভী বলল, 'আমি বুড়ো মানুষ। তাছাড়া তোমার চেয়ে বেশী খিদে পেয়েছে আমার।'

'নাও, তাহলে তুমিই আগে খেয়ে নাও মৌলভী সাহেব। এটাকে সঙ্গে করেই নিয়ে চলো না!'

মৌলভী মাথা নেড়ে বলল, 'না, ও জিনিস হারাম।'

ফজল বলল, 'আমরা না নিলে রাতে চোর এসে নিয়ে যাবে। আর সত্যি বলছি, খুব ভালো ছাগল, এর গোস্তও ভারি চমৎকার হবে।'

মৌলভী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

'বেশ, তুমি না নিলে আমিই ওটাকে নিচ্ছি।'

ফজল ছাগলের দড়িটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। মঞ্জুর আর মৌলভী তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পরে যে ঘরটা তাদের চোখে পড়ল, সেটা তালাবন্ধ নয়, আগুনেও পোড়েনি। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ফজল চিৎকার করে বলল, 'জান, বাঁচাতে চাও তো দরজা খোলো।'

কেউ দরজা খুলল না।

'দরজা খুলে দিলে বাঁচবে, নইলে খুন করব বলে দিচ্ছি।'

তবু দরজা তেমনি বন্ধ রইল।

ফজল আর মঞ্জুর জোরে জোরে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। একটা কপাট ভেতরে গিয়ে পড়ল। অন্যটা নড়বড় করে নড়তে লাগল।

ফজল আর মঞ্জুর একপাশে সরে দাঁড়াল। ফজল বলল, 'ভেতরে কে আছ, সামনে এসে দাঁড়াও।'

ভেতর থেকে কেউ কোনো সাড়া দিলো না। ঘর স্তব্ধ, নির্বাক।

ফজল আর মঞ্জুর খুব সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ভেতরে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার। ফজল দিয়াশালাই জ্বালাতেই একটা খাট চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কানে এল, একটি ফোঁপানো কান্না, তারপর আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেলো ঘরখানা।

ফজল আর একটা দিয়াশালাই জ্বালাল। খাটে এক বুড়ি শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে, তার চোখে যে রকম আতঙ্ক, তা মৃত্যুভয়ের চেয়েও অধিক। তার পায়ের কাছেই একটি যুবতী মেয়ে বসে আছে।

ফজল জিজ্ঞেস করল, 'তুই পালাসনি কেন?'

মেয়েটি বলল, 'আমি জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে গাঁয়ের লোক সবাই চলে গেছে, আমার জন্যে দাঁড়ায়নি কেউ।'

'তোর নাম কি?'

'ভার্গা!'

'ভার্গা কি! ভাগ্‌কওর, না ভাগ্‌দেবী?'

'ভাগ্‌কওর।'

'উঠে এ দিকে আলোতে আয় তো একটু।'

মেয়েটি উঠল না।

ফজল ডেঁটে বলল, 'চল, ওঠ!'

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে এল। দরজার কাছে ঈষৎ আলোয় ফজল দেখল, ভার্গা সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ঘরের এক দীর্ঘকায় মেয়ে। খুব সুন্দরী। এমন সুন্দর ছোট্ট মুখখানি যেন চুমো খেলেই মিলিয়ে যাবে। গায়ের রঙ একেবারে সোনার মতো, গাল দুটিতে সোনার ওপর লালচে আভা, যেন প্রভাতের অরুণ-রাঙা মেঘ।

ফজল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তোকে ফেলে চলে গেলো?'

ভার্গা মাথা হেঁট করল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ফজল তার হাত ধরে বলল, 'চল, আমাদের সঙ্গে যাবি?'

ভার্গা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার খাটের ওপর বুড়ির কাছে বসে পড়ল।

ফজল জিজ্ঞেস করল, 'ও তোর কে?'

ভার্গা বলল, 'আমার ঠাক্‌মা।'

'ওর দম শেষ হতে তো আর দু'এক দণ্ড বাকি। এই লাশ নিয়ে তুই কতক্ষণ বসে থাকবি!'

ভার্গা কোনো উত্তর দিলো না।

ফজল তার হাত ধরে খাট থেকে টেনে তুলল, 'চল আমাদের সঙ্গে। আমরা তোকে তোর বাড়ির লোকজনের কাছে পৌছিয়ে দেবো।'

ভার্গার চোখে আশা ঝিকমিক করে উঠল। অবাক হয়ে সে ফজলের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সেখানে কিছু লক্ষ্য করল যেন সে, সংশয়ের গলায় বলল, 'তুমি মিছে কথা বলছ।'

ফজল হেসে বলল, 'মিছে কথা না তো কি সত্যি! সে যাইহোক, আমাদের সঙ্গে তোকে যেতেই হবে।'

মৌলভী বলল, 'ও কাজ কোরো না। ওটা পাপ।'

মঞ্জুর বলল, 'মৌলভী ঠিক কথাই বলছে।'

ফজল জবাব দিলো, 'ছাই ঠিক কথা বলছে। জেলখানার হাণ্টার ভুলে গেছ, ডাণ্ডা-বেড়ী ভুলে গেছ, আর সেই তেল-মাখানো হাণ্টারের মার! আমার বুকের ওপর দিয়ে রজ্জির হেঁটে যাওয়াটাও ভুলে গেলে তোমরা!'

মঞ্জুর বলল, 'তা তাতে ওর কি অপরাধ! ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?'

'তা আমিই বা কি ওর ক্ষতি করছি! এখানে থাকলে হয় রাতে ওকে নেকড়েতে খাবে, নয় তো ডাকাত এসে তুলে নিয়ে যাবে। এমন সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এটা থাকার নিরাপদ জায়গা নয়।' সে আবার খুব জোরে ভার্গার হাত টেনে ধরে বলল, 'চল।'

ফজল দারুণ জোরে তার হাত চেপে ধরে আছে। ভার্গা অসহায় চোখ মেলে শেষবারের মতো তার মুমূর্ষু ঠাকুরমার দিকে তাকাল।

তারপর ফজল তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। তার এক হাতে ছাগলের দড়ি, অন্য হাতে ভার্গা! সে মৌলভী সাহেবকে ছাগলটা দিয়ে মেয়েটিকে আগে আগে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। যেমন করে বলদ হাঁকায়, তেমনি করে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

মেয়েটি কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। ফজল দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল তাকে, চুলের মুঠি ধরে দু'চার থাপ্পড় কষাল। তারপর মেয়েটি আর পালাবার চেষ্টা করল না।

সামনের দু'তিনটি বাড়ি থেকে সামান্য কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেলো। একটা জরির কাজ-করা মখমলের বাস্কেট। পুরুষ মানুষের ব্যবহারোপযোগী এই বাস্কেটটি সম্ভবত কোনো যুবকের বিয়ের সময়কার—তাড়াহুড়োতে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। একটি আলনায় একখানি চমৎকার পশমী কম্বল পাওয়া গেলো। একটা ঘরে পাওয়া গেলো একখানি মিলিটারী কোট আর একজোড়া মিলিটারী বুট। একটা ঘরে বিশ-পঁচিশ সের ভালো চাল জুটে গেলো। একটা বাড়ির বাইরে সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে কে যেন বড় বড উর্দু হরফে লিখে রেখেছে— 'মুসলমানরা, তোদের মা-র…'

ফজল মঞ্জুরকে জিজ্ঞেস করল, 'কি লেখা আছে ওখানে?'

মঞ্জুর জবাব দিলো, 'গালাগালি।'

'পড়ে শোনাও।'

মঞ্জুর পড়ল, 'মুসলমানরা, তোদের মা-র…'

ফজলের সারা মুখখানি লাল হয়ে উঠল। সে থুতু ছিটিয়ে দিলো দেওয়ালে। থুতু ছিটিয়ে দেওয়ার পর আর একটা কথা মনে পড়ল তার। সে মাটিতে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেই এক টুকরো কয়লা পেয়ে গেলো। মঞ্জুরের হাতে সেটা দিয়ে বলল, 'ওটা কেটে দিয়ে ওর ওপরে লেখো —হিন্দুরা, তোদের মা-র…'

মঞ্জুর আগের গালাগালিটা কেটে দিয়ে তার নিচে লিখল— 'হিন্দুরা, তোদের মা-র…'

তারপর দু'জনে পরস্পর করমর্দন করতে করতে হেসে ফেলল। দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল তারা।

এমন সময় সেই বাড়িটার মধ্যে কি যেন ভার্গার চোখে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি লাফ মেরে দরজা পেরিয়ে ভেতরে চলে গেলো। এক সেকেণ্ডের জন্যে অবাক হলো ফজল। কিন্তু ভার্গা দরজা বন্ধ করার আগেই ফজল দুই কপাটের মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গেলো, যাতে ভার্গা দরজা বন্ধ করতে না পারে, তারপর জোরে ঠেলে কপাট দুটো পুরো খুলে দিলো। ভার্গা বাড়ির ভেতরের দিকে দৌড় দিলো। দু' কামরার বাড়ি। সে একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। ফজল তার পেছনে পেছনে ভেতরে গিয়ে হাজির হলো।

এ ঘরখানা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের দু' দিকে দুটি জানালা, বাইরের দিকে একটি দরজা। দরজা দিয়ে বাইরের উপত্যকা, কাগানের তীরভূমি, দূর-দূরান্তরের শ্যামল প্রান্তর, পুষ্পাচ্ছাদিত গাছপালায় ঢাকা পাহাড় পরিষ্কার চোখে পড়ে। ঘরে ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপকাঠির ধোঁয়া শূন্যে পাক দিয়ে উঠে উঠে একটি খুশীর পরিমণ্ডল তৈরী করে রেখেছে। মনে হচ্ছে, যেন কেউ এইমাত্র ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বাইরে গেছে।

ঘরের একদিকে একটি ছোট্ট সামিয়ানা টাঙানো। রেশমের ফুলতোলা কাপড়ে ঢাকা চৌকির ওপর পবিত্র গুরু গ্রন্থসাহেব খোলা রয়েছে। গ্রন্থসাহেবের কাছে চৌকির একেবারে কাছেই একটি লোটা উল্টে পড়ে আছে। সেই গড়িয়ে থাকা লোটাটি ছাড়া সারা ঘরখানিতে বিশৃঙ্খলার আর কোনো বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ফজল সামনে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল।

ভার্গা ছুটে গিয়ে গুরু গ্রন্থসাহেবের সামনে বসে মাথা হেঁট করে পবিত্র বাণী পাঠ করতে শুরু করল। পবিত্র গ্রন্থের সামনে জোড়হাত করে বসে আছে সে। দু' চোখ দিয়ে অবিরত জল গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট না নেড়ে মুখের ভেতরেই সে তার দুর্ভাগ্যের অভিযোগ জানাচ্ছে —তাকে রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা করছে।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারত মেয়েটিকে দেখে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো ফজলের মনে। সে চুপচাপ সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা দুটিকে টেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারছে না। পেছনে মঞ্জুর ও মৌলভী দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ফজল পেছন ফিরে দেখল মৌলভীও দু' হাত ওপরে তুলে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছে।

ভাগাঁর পড়া হয়ে গেলে সে খুব সাবধানে লোটাটা সোজা করে রাখল। গুরু গ্রন্থসাহেবকে রেশমী চাদরে ঢেকে দিলো। তারপর পিছু পায়ে হেঁটে এল। এখন তার চোখে-মুখে এতটুকু দুঃখকষ্টের লেশ নেই।

রাস্তায় অনেকক্ষণ থেকে ফজল চুপচাপ। অনেকক্ষণ ধরে সেই ঘরের পবিত্র পরিবেশ তার মনকে প্রভাবিত করে রেখেছে। মঞ্জুর ও মৌলভীও স্তব্ধ। ভাগাঁ চুপচাপ তাদের সঙ্গে হেঁটে চলেছে।

মৌলভী বলল, 'ভেবেছিলাম, এ-বার তুমি মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে।'

মঞ্জুর বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

ফজল জবাব দিলো, 'সেটা আমার ব্যাপার। তোমরা চুপ করো।'

চারদিকে অন্ধকার বেশ ঘনীভূত হয়েছে, তবু হেঁটে চলেছে তারা। উপত্যকার উৎরাই শেষ হয়ে এ-বার খাড়াই শুরু হয়েছে। রাস্তাটা এসে পড়ল অমনকোট গাঁয়ে। সেখানেও কেউ নেই। মৌলবী ও মঞ্জুর প্রস্তাব করল, 'রাতে এখানেই বিশ্রাম করা যাক।'

ফজল বলল, 'পাগল হয়েছ না-কি! আরও ওপরে উঠে চলো, নইলে রাতে এখানে ডাকাত এসে তোমাদের কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করবে।'

'কেন, এখানে ডাকাত আসতে যাবে কেন?'

'ডাকাত কি কোথাও বাইরে থেকে আসে না! এই আশপাশের পাহাড়ী এলাকা থেকে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরাই আসবে হল্লা করতে। ওরা দলে দলে সবাইকে চলে যেতে দেখেছে। আজ রাতে ওরা ঘরে বসে থাকতে পারবে না। এ গাঁয়ে ওরা ঠিক আসবে, আর হয়ত এই মেয়েটির জন্যেই খুন-খারাবি হয়ে যাবে।'

কথাটা সমীচীন, ওরা ওপরে উঠতে লাগল। তারপর রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝরণা খুঁজে বের করল, তারই ধারে আস্তানা গাড়ল তিনজনে। ফজল ছাগলের দুধ খেলো।

ভাগাঁর ওপর মকাইয়ের রুটি তৈরি করার ভার পড়ল।

মৌলভী ও মঞ্জুর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সবার আগে তাদেরই খেতে দেওয়া হলো। খেয়ে-দেয়ে তারা সেখানেই গা এলিয়ে দিলো।

ভাগাঁ এখন ফজলের জন্যে রুটি তৈরী করছে। ফজল তার পাশে বসে।

আগুনের লাল আভায় ভাগাঁর মুখখানিতে এক অদ্ভুত ধরনের হতাশা ও অসহায়তা ফুটে উঠছে। সে যখন পরিষ্কার পাথরের ওপর মকাইয়ের আটা

মেখে তাই দিয়ে রুটি তৈরী করে সেঁকতে থাকে, তখন তার মনে পড়ে, গত রাতে সে এ সময় তার ভাই শেরসিং, বাবা দলেরসিং আর মা জয়কওরের জন্যে রুটি সেঁকছিল। তার ছোট বোন কম্মো তরকারিতে দেওয়ার জন্যে মাখন চাইছিল। কলসিতে জল ছিল, চোখে লজ্জা ছিল, বাবা তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলেছিল, 'আমার লক্ষ্মীর বিয়ে দেবো রাজার ঘরে।'

আর আজ তার ফুলশয্যার রাত্রি এই পথের ধারে, খোলা আকাশের নিচে, জুলুমের জামা গায়ে দিয়ে এসেছে।

নিচে সঘন উপত্যকার গ্রামগুলিতে আলো ঘোরাঘুরি করছে, শোরগোল শোনা যাচ্ছে। অনেকগুলি আলো জ্বলে উঠছে আবার নিভে যাচ্ছে। অন্ধকারের ঘূর্ণিপাকে আলোর ঢেউ উঠে আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ভাগাঁর অন্তস্তলের ঘূর্ণাবর্তে আলোর কোনো ঢেউ ওঠে না।

রুটি সেঁকতে সেঁকতে ভাগাঁ চুপিচুপি কাঁদতে শুরু করল। নিঃসাড়ে তার চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে। নিচে উপত্যকায় অনেকগুলি আলো একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল। মশালের আগুন ক্রমশ উঁচুতে উঠছে। ফজলের মনে হলো যেন অনেকগুলি গাঁয়ে একসঙ্গে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারের ভূতেরা যেন ফসলে আগুন ধরিয়ে মশাল বানিয়েছে। মশালের আগুন সাপের জিভের মতো লকলক করে নাচছে।

ভাগাঁ নিঃশব্দে ফজলের সামনে রুটি রেখে দিলো। ফজল তার হাত ধরে কাছে বসিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে রুটি খা।'

ভাগাঁ তার সঙ্গে রুটি খেতে শুরু করল। আজ পর্যন্ত সে কোনো মুসলমানের সঙ্গে একসঙ্গে খায়নি, তাই প্রথম দু-চার গ্রাস তার ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে পথশ্রান্ত, তার ওপর প্রচণ্ড খিদে, সে জন্যে মনে ক্ষোভ-দুঃখ থাকা সত্ত্বেও অনেক রুটি খেয়ে ফেলল সে।

ফজল তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছিল। অসহায় অবস্থার জন্যে সে ফজলের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ফজল একপাশে মিলিটারী কোট পাতল আর একদিকে পশমী কম্বলখানা বিছিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে শুয়ে পড়তে বলল।

ভাগাঁর জ্ঞান যেন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে সে পৃথিবীতে নেই। তার শরীর এক জায়গায় রয়েছে আর সে অন্য জায়গায় —দুটির মধ্যে যেন কোনো সম্পর্ক নেই। সে কম্বলে শুয়ে পড়ল।

নিচে উপত্যকায় আলো জ্বলছে নিভছে —নিভছে জ্বলছে। আজ ফুলশয্যার রাত্রি, সানাই বাজাও। জুলুমবাজেরা সানাই বাজাও, খুশীর গান গাও···

নিচের উপত্যকা থেকে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, যেন অনেক নেকড়ে একজোট হয়ে একসঙ্গে চিৎকার করছে। ফজল ভাগাঁর হাত

নিজের হাতে তুলে নিল। ভাগাঁর হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, তার সারা গায়ে যেন পিঁপড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ফজল তাকে টানতে টানতে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এল। প্রথমে সে তার ভেজা-ভেজা চোখের পাতায় চুমো খেলো, তারপর তার ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করল। ভাগাঁর ঠোঁট দুটো যেন তার মুখের মধ্যে মধুর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে, আর সেই মধুর চুম্বন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যেন সমুদ্রের ঢেউ তৃষ্ণার্ত বালুকার গভীরে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে, তার শরীরে ছড়ানো শিরা-উপশিরার জাল যেন একটা মৃদু শোরগোলের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। তারপর হঠাৎ সে তার গলার কাছে ছুরির তীক্ষ্ণ ধার অনুভব করল, কে যেন চাপা গলায়, অথচ বেশ কড়া স্বরে বলল, 'ছেড়ে দে মেয়েটিকে, নইলে এক্ষুনি এই ছুরি তোর গলায় বসে যাবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফজল ভাগাঁকে ছেড়ে দিলো।

তারপর সে বুঝতে পারল, তীক্ষ্ণ ধার ছুরি তার গলার চামড়ার ওপর থেকে সরে গেলো। সে আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—তার একপাশে মঞ্জুর ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে, আর একপাশে মৌলভী, হাতে একটা মোটা লাঠি।

বারো

মঞ্জনদেব বধিয়ানি গ্রাম পর্যন্ত নিরাপদেই এসেছিল, কিন্তু বধিয়ানি এসে 'গাজিয়ানে ইসলাম'-এর থাবায় ধরা পড়ে গেলো। 'গাজিয়ানে ইসলাম' একটি নতুন পার্টি। জঙ্গাপড়াওয়া অঞ্চলে জহমত আলি খাঁ পার্টিটা তৈরী করেছিল। চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াতেই সমস্ত জায়গীরে শোরগোল পড়ে গেলো। কিন্তু এই শোরগোল কিছুটা অদ্ভুত রকমের। অর্থাৎ প্রথমে তার লক্ষ্য ছিল ডোগরা শাসন উচ্ছেদ করা। কিন্তু যখন আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল, তখন ডোগরা রাজা আর হিন্দুদের একই বস্তু ধরে নিয়ে যেখানে যেখানে হিন্দু রয়েছে, তাদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা শুরু হয়ে গেলো। জহমত আলি খাঁ খুব শীগগীরই জঙ্গাপড়াওয়া অঞ্চল থেকে সমস্ত কাফেরকে মেরে তাড়াল। এখন সে 'গাজিয়ানে ইসলাম'-এর এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অন্যান্য অঞ্চলগুলি ঝেড়ে-পুঁছে সাফ করতে আসছে। জঙ্গাপড়াওয়ার পরেই যে অঞ্চলটি সে দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে বেছে নেয়, সেটি সধন উপত্যকা, বধিয়ানি, টিকরী শাহনুরাদ, হরনী, নক্কড়, গোরাহু পর্যন্ত বিস্তৃত। সে অঞ্চলে রাজা করম আলি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তিনিও জহমত আলির দেখাদেখি খুব তাড়াতাড়ি সেখানে 'গাজিয়ানে ইসলাম'-এর একটি শাখা তৈরী করেন। ও দিকে জহমত আলি খাঁ যখন তার অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে, তখন এ দিক থেকে করম আলিও তাঁর দলটাকে নিয়ে রওনা হন, বধিয়ানিতে এসে উভয় দলই

পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। রাজা করম আলি ও জহমত আলি এই দলের নেতা নিযুক্ত হন। সজ্জনদেব পথ ভুল করে যখন পথযাত্রীদের কাছে টিকরী শাহমুরাদের রাস্তা জিজ্ঞেস করছিল, তখন এই দলের লোকেরাই তাকে ধরে ফেলে।

ধরে ফেলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে খুন করা হয়নি কারণ তাকে দেখে সুশিক্ষিত ও নবাগত বলে মনে হচ্ছিল, অর্থাৎ সম্ভবত সে এ দেশের লোক নয়। তাই যারা তাকে ধরেছিল, তারা প্রথমে বেশ দোটানায় পড়ে—তাকে সেখানেই শাহমুরাদের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়, না সরদারের সামনে হাজির করে হত্যা করার আদেশ নেওয়া যায়। তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করা হয় যে, প্রথমে সরদার দু'জনের সামনে ওকে হাজির করা হোক তারপর তাঁরা যা হুকুম দেবেন, সেটা তামিল করা হবে।

রাতভর সজ্জনদেবকে গোয়ালঘরে আটকে রাখা হলো। পরদিন সূর্য উঠতেই তাকে কাগান নদীর চড়ায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে সকাল থেকেই করম আলি ও জহমত আলি খাঁ হাজির।

কাগান নদীর ধারে ধারে দীর্ঘ চড়ায় এখানে-ওখানে 'গাজিয়ানে ইসলাম'-এর এক-একটি দল আড্ডা গেড়েছে। কেউ কেউ নাইছে, কেউ কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ-বা দাড়ি কামাচ্ছে কিংবা ন্যাড়া মাথা হচ্ছে। কোথাও ছাগল কাটা হচ্ছে কোথাও-বা উনুনে ডেক চড়ানো হচ্ছে। মাঝে মাঝে পঞ্চাশ, একশো, দুশো জনের পুরুষ-নারী-শিশুর এক-একটি দল মাথা হেঁট করে মাটিতে বসে আছে। কয়েকজন সেপাই তাদের পাহারা দিচ্ছে। ওরা হিন্দু চাষী, আশপাশের গাঁ থেকে ওদের ধরে আনা হয়েছে। ওদের মধ্যে এমন কিছু হিন্দু সাহুকারও রয়েছে, যারা বড় শহরে পালিয়ে যেতে পারেনি। তাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক সবচেয়ে বেশী। দলগুলোর জায়গায় জায়গায় কানাঘুষো চলছে। কেউ বলে—আজ সবাইকে প্রাণে মেরে ফেলবে। কেউ বলে—না, সবাইকে মুসলমান করবে। কেউ বলে—না, মেয়েদের ও শিশুদের রেহাই দেবে। কেউ বলে—না, সবাইকেই মুসলমান করা হবে। অর্থাৎ যত মুখ তত কথা কিন্তু সকলেরই মনের মধ্যে ভয় চেপে বসে আছে।

রাজা করম আলির জাঁকালো তাঁবুর বাইরে দুটি চেয়ারে জহমত আলি খাঁ ও করম আলি বসে আছেন, তিনজন গাজিয়ানে ইসলাম তাঁদের সামনে সজ্জনদেবকে হাজির করে বলল, 'হুজুর, আমাদের তো মনে হচ্ছে লোকটা ভিনদেশী।'

জহমত আলি খাঁ ঘৃণাভরে জিজ্ঞেস করল, 'কাফের ?'

সজ্জনদেব মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে এসেছিস তুই ?'

'বড় শহর থেকে।'

'সেখানে কি করতিস ?'

'রাজকুমারের এ. ডি. সি. ছিলাম।'

জহমত আলি খাঁ আচমকা চেয়ারে একদিকে কাত হয়ে পড়ল কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে।

রাজা করম আলি তার এই অবস্থা দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওখান থেকে চলে এসেছ কেন?'

'সজ্জনদেব বলল, 'চলে আসিনি, আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে কালি মাখিয়ে গাধায় চড়িয়ে সারা শহর ঘুরিয়েছে।'

জহমত আলি খাঁ ও করম আলি দু'জনেই জোরে হেসে উঠলেন। করম আলি বেশ আমোদ পেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সত্যি কথা বলতে গেলে বেইমানের জন্যে ওটাই সবচেয়ে ভালো শাস্তি।'

জহমত আলি খাঁ বলল, 'না, বেইমানকে গুলি করে মারা উচিত।'

করম আলি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি দোষ করেছিলে?'

সজ্জনদেব চুপ করে রইল।

'এখানে এসেছ কেন?'

'টিকরী শাহমুরাদ যাচ্ছিলাম।'

'কি করতে যাচ্ছিলে ওখানে?'

সজ্জনদেব কোনো জবাব দেয় না।

জহমত আলি খাঁ বলল, 'উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি কি তোমার মা-র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলে সেখানে?'

সজ্জনদেব বলল, 'সেখানে একটি মেয়ে ছিল তাকে না দেখে পাঞ্জাবে ফিরে যেতে পারছিনে।'

করম আলি জিজ্ঞেস করলেন, 'মুসলমান মেয়ে?'

সজ্জনদেব জবাব দিলো, 'না হিন্দু মেয়ে। কিন্তু এখন আর বেঁচে নেই সে।'

জহমত আলি খাঁ বলল, ''তাহলে কাকে দেখতে যাচ্ছিলে তুমি?'

'ঐ যে, ওকেই দেখতে যাচ্ছিলাম।'

জহমত আলি খাঁ ধমক দিয়ে বলল, 'কি যা-তা বলছ! পাগল হয়ে যাওনি তো?'

সজ্জনদেব মৃদু হেসে বলল, 'আপনারা বুঝবেন না। যেমন আমিও বুঝতে পারছিনে এই শত শত হিন্দু চাষীদের এখানে জড়ো করে আপনারা ওদের আচার তৈরী করবেন না-কি!'

করম আলি কি যেন ভাবলেন। গলার সুর পাল্টে সজ্জনদেবকে বললেন, 'ঐ চেয়ারটায় বসে পড়ো।'

সজ্জনদেবকে চেয়ারে বসতে দেখে অনেক গাজিয়ানে ইসলাম আশ্চর্য হয়ে ওদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। ব্যাপার কি, রাজা করম আলি আজ এক কাফেরকে

'গাজিয়ানে ইসলাম! মুসলমান বন্ধুগণ! আজ সঙ্কটজনক সময় এসে উপস্থিত। আজ সমস্ত মুসলমান মিলে ডোগরা-রাজের মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু শত্রু বড চতুর। সে আমাদের ঘরে বিভেদের বীজ বুনে আমাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করতে চায়। এটা সত্য যে, করম আলি এ অঞ্চলের খুব বড় জায়গীরদার, কিন্তু তিনিও আমাদের একজন মুসলমান ভাই। তাছাড়া তিনি আজ সমস্ত অপরাধ তোবা (ভবিষ্যতে আর কোনো পাপাচার না করার প্রতিজ্ঞা) করছেন। বলুন ভাই করম আলি, এই মুসলমান ভাইরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, বলুন কি বলতে চান আপনি...'

রাজা করম আলি চেয়ারে উঠে দাঁড়ালেন। অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে বললেন, 'আমি তোবা করছি, কান ধরে আমি আমার পাপ কাজের জন্যে খোদায়ে দো-জাহানের (ইহলোক ও পরলোকের প্রভুর) কাছে মাফ চাইছি। আজ থেকে আমার সমস্ত ধনদৌলত, আমার জায়গীর, আমার বাড়িঘর, সমস্ত কিছু ধর্মের নামে উৎসর্গ করছি। আজ থেকে আমি আমার কওমের (সম্প্রদায়ের) জন্যেই মরব, কওমের জন্যেই বেঁচে থাকব, কওমের জন্যে সমস্ত কিছু সমর্পণ করব। হে কাশ্মীরের মুসলমান! আজ থেকে করম আলি একজন জায়গীরদার নয়, কওমের এক দীনহীন খাদিম (সেবক)। আর বাকী রইল রজ্জির কথা, সে কথা বলতে গেলে, অধর্মই আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ধর্মবিশ্বাসের আলোয় আমার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আজ থেকে আমি আমার অতীত জীবনকে ধিক্কার জানাচ্ছি, আর রজ্জিকে আমি আমার বোন বলে সম্বোধন করছি। আজ থেকে কেউ যদি আমায় এ রকম পাপ কাজ কখনও করতে ছাখে, তাহলে মুসলিম সমাজ যা শাস্তি দেবে, আমি মাথা পেতে নেব।'

জহমত আলি চিৎকার করে বলল, 'রাজা করম আলি জিন্দাবাদ!'

'জিন্দাবাদ!' —'গাজিয়ানে ইসলাম' জোরে ধ্বনি দিতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পরে ভিড়-ভাড়াক্কা কমে এলে জহমত আলি বলল, 'সেই শয়তান সজ্জনদেবটা কোথায়? আর একটু হলেই হারামীটা সব পণ্ড করে দিয়েছিল!'

করম আলি বললেন, 'কিন্তু তোমার ভাষণটাই সব সামলে দিয়েছে। কি চমৎকার বক্তৃতা করো তুমি —জবাব নেই!'

'এখন সেই বদমাশ সজ্জনদেবটাকে খতম করে দেওয়া দরকার। নইলে আবার কি বিপদ এনে হাজির করবে, বলা যায় না।'

'না, এখন ও সব করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা আপাতত সামলে নিয়েছি ঠিক, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চাষীদের মন এখনো খুব পরিষ্কার নয়। এখন ওটা ছেড়ে দাও, বাকী কাজ শুরু করো।'

'আমার তো ইচ্ছে সব ক'টাকে জবাই করে দেওয়া। আমরা জঙ্গাপড়াওয়াতে যেমন সমস্ত সাফ করে দিয়েছি, এখানেও তাই করতে চাই আমি।'

'আজকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, সেটা করা ভুল হবে। আমার মতে, তুমি এইসব হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ দাও, তাতে কেউ কোনো আপত্তিও করতে পারবে না। ভেবে গ্যাখো, ওদের কারোকে খুন করার পক্ষে কেউ নেই —সবাই ওদের মুসলমান করার কথা বলছে।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো। বলতে কি, এ রকম বোকামি করতে প্রাণ চাইছে না, কিন্তু কি করা যায়, পরিস্থিতি অন্যরকম।'

'তাহলে ঘোষণা করে দাও। ঢোল শোহরত করে দাও একেবারে। মৌলভীদের জড়ো হতে বলো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢোলের আওয়াজ উঠল। সমস্ত 'গাজিয়ানে ইসলাম' এক জায়গায় সমবেত হলো। জহমত আলি খাঁ বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের জানাল যে, এখন তাদের কি করতে হবে, 'গাজিয়ানে ইসলাম, আমরা শক্তিশালী, তাই বলে আমাদের চেয়ে যারা দুর্বল, তাদের ওপর অত্যাচার করব না। ওদের প্রাণে মারব না। আজ প্রত্যেক গাজির (বীরের) অবশ্য কর্তব্য, এই চড়ায় যে সব হিন্দুদের একত্র করা হয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে ইসলাম ধর্ম স্বীকার করার জন্যে বোঝানো। যারা মেনে নেবে, তাদের আমরা আনন্দের সঙ্গেই আমাদের ভাই বলে গ্রহণ করে নেব। আর যারা মেনে নেবে না, তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।'

'ছেড়ে দেওয়া হবে! তা কেন?' একজন লম্বা দাড়িওয়ালা লোক বলল।

'তাহলে কি করব তাদের? তোমরাই বলো।'

'যে কাফের মুসলমান হবে না, তার শাস্তি মৃত্যু।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তার শাস্তি মৃত্যু।' ভিড়ের মধ্যে শত শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল। উত্তেজনা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে —কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কারণ 'গাজিয়ানে ইসলাম' যার কাছেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণের বার্তা নিয়ে গেলো, সে-ই সঙ্গে সঙ্গে তা স্বীকার করে নিল। অল্প সময়ের মধ্যে সারা পরিবেশটাই বদলে গেলো যেন। শিশুরা আনন্দে কোলাহল করছে। মেয়েরা ডেক থেকে চাল বের করে করে নবদীক্ষিত মুসলমানদের ডেরায় ডেরায় বিলোচ্ছে।

লালা মীরাশাহ নিজের নাম নিয়েছে মীরজাফর। যে গুলের সঙ্গে সে ভাব ভালোবাসা জমিয়েছিল, সেই গুল এখন তার ওপর খুব খুশী, কারণ গুলের পেটে লালার সন্তান। গুল মাথা নিচু করে লালাকে বলছিল, 'কাল সকালেই মৌলভীকে ডেকে আমাদের বিয়েটা সেরে নেব —আমি কিন্তু আমার ছেলের নাম রাখব কয়েম আলি...'

মীরাশাহ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয়, তাহলে নাম রাখতে হবে সদাবাহার।'

বালকরাম এখন বাহাদুর খাঁ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী আশা, এখন আয়েশা।

সে হাঁড়ি থেকে মাংস-পোলাও বের করে বালকরামের সামনে বেড়ে দিয়ে বলল, 'নাও, খেতে বসো।'

বাহাদুর খাঁ কানে হাত দিয়ে বলল, 'রাম-রাম! কি করো! আমরা ব্রাহ্মণের সন্তান…'

'খাবে তো খাও, নইলে আমি খাচ্ছি। আমি তো রাত থেকে মাংস খাওয়ার জন্যে লালিয়ে মরছিলাম, কিন্তু মনে ভয় ছিল, ঠাকুর কি ভাববেন! এখন তো ভগবানই বদলে গেছে, আর ভয় কিসের?'

বালকরাম মাংসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ, আর ভয় কিসের!'

মিশিরের ছেলে ভীকু, তার নাম এখন আশফাক, নিজেদের গাঁয়ের মেয়ে জরিনাকে বলল, 'নে, আর তো কোনো অসুবিধে নেই, এ-বার আমায় বিয়ে কর।'

জরিনা তার নাকের কাছে আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল, 'যা বে ভীকুর বাচ্চা, এখন তোকে আমি নামাজ পড়া শেখাব!'

একটি ছোট ছেলে, মাথায় লম্বা টিকি, আমদাদের পা দু'খানি জড়িয়ে ধরল। আমদাদ কোলে তুলে নিল ওকে। ছেলেটি দু'হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বলল, 'আমদাদ চাচা, বাবাকে মুসলমান করবে না? সবাই মুসলমান হয়ে গেলো, বাবাকে কেউ মুসলমান করে না।'

ছেলেটি দর্শন সেকরার, তার মাথায় তখনও লম্বা টিকি।

আশপাশের গাঁয়ে দর্শনের মতো ভালো স্বর্ণকার কেউ নেই। তার হাতের তৈরী কানের মাকড়ি আর নাকের ফুল এমন সুন্দর যে, মেয়েরা তা দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। তাকে এখনো কেউ মুসলমান করেনি।

আমদাদ জিজ্ঞেস করল, 'কি রে দর্শন, তুই এখনো কাফের রয়েছিস যে?'

দর্শন বলল, 'না ভাই। কথা এই, আমায় কেউ মুসলমান করতেই চায় না।'

'কেন?'

'আমদাদ ভাই, ব্যাপারটা হলো কি, আমি প্রথমেই মৌলভীর কানে কানে বলে দিয়েছিলাম, তুমি যদি আমায় ধর্মভ্রষ্ট করো, তোমার বাড়ির গয়নাগাঁটি আমি কক্ষনো ভালো করে তৈরী করব না। আর গাঁয়ে আমার মতো সেকরাও কেউ নেই, বুঝলে তো! সে মৌলভী আমায় কাফের থেকে মুসলমান করতে রাজী হলো না। অন্য মৌলভীদের বেলাতেও ঐ করেছি।'

আমদাদ ও দর্শন হাসতে শুরু করল।

দর্শন বলল, 'এখন মৌলভীরা চারদিকে রটিয়ে দিয়েছে যে, আমার শক্ত ব্যারাম আছে বলে মুসলমান করা হয়নি। অথচ ভসীনশাহের কুষ্ঠব্যাধি, তার নাম পাল্টে রেখেছে খোদাবক্স।'

আমদাদ ছেলেটিকে আদর করে বলল, 'যা, খুশীর খবর—তোর বাবা হিন্দুই থেকে গেলো।'

ছেলেটি অভিমানের গলায় বলল, 'না চাচা, সবাই মুসলমান হয়ে গেলো, ওকে কেন মুসলমান করছে না কেউ? বাবা কি দোষ করেছে? তুমি ওকেও মুসলমান করে দাও, এক্ষুনি করে দাও চাচা!'

আমদাদ দর্শনের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখ, ছেলে কেমন জিদ ধরেছে, ওর খাতিরেই নামটা পাল্‌টে নে এখন। তাছাড়া, আর একটা কথা, আশপাশের গাঁয়ে আর একজনও হিন্দু নেই, কার বাড়িতে জল খাবি তুই? নে, নামটাই পাল্‌টে নে।' —আমদাদ ওর মাথার টিকিতে হাত রেখে বলল, 'বল, কি নাম রাখব?'

দর্শন বলল, 'ইউসুফ।'

আমদাদ তার মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিল, 'ভাগ! তোর সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাম রাখবে কি-না ইউসুফ!'

তাঁবুর বাইরে রহমত আলি করম আলিকে বলল, 'হুজুর, মামলা তো বেশ ভালোভাবেই মিটে গেলো।'

করম আলি বললেন, 'কিন্তু আমার যে দুঃখ হচ্ছে, এক শালাও এমন বেরোল না যে ডাঁট দেখিয়ে থাকবে! আমি চাইছিলাম, দু' চারজন সাহুকার ডাঁট দেখালে ওদের বাড়িঘর জমি-জায়গাগুলো হাতে আসে, দু' চারটে যুবতী মেয়েও জুটে যেত। সত্যি কথা বলতে, যখন থেকে 'গাজিয়ানে ইসলাম'-এর আন্দোলন শুরু করেছি, তখন থেকেই একেবারে নিরিমিষি বামুন হয়ে আছি।'

'আরে, হিন্দুরা খুব চালাক হয়। আমি তো সে জন্যেই বলছিলাম যে, একেবারে শেষ করে দিন। এখন দেখুন না, নিজেদের সব কিছু কেমন বাঁচিয়ে নিল ওরা। খালি নামটা পাল্‌টে নিয়েছে, আর সব যেমনকার তেমনি। সেই জমি-জায়গা, সেই ঘরবাড়ি, সেই গাঁ। জঙ্গাপড়াওয়ার মতো এদেরও খতম করে দেওয়া উচিত ছিল।'

'ভালো কথা, অন্তত এখনো বধিয়ানির হিন্দুরা বাকী আছে। সুন্দরশাহ, মিশির, মিশিরাণী, আরও দশ-বারোজন লোক যারা আগে থানায় কাজ করত, তাদের সবাইকে আটক করে রাখা হয়েছে। কাল ওদের পালা আসবে।'

'শুনছি, বুড়ি মিশিরাণীর মেয়ে দুটি না-কি খুব সুন্দরী!'

করম আলি জিভ দিয়ে টকাস শব্দ করে বললেন, 'মেয়ে কি, পায়রা! একটার নাম গঙ্গা, আর একটার নাম সরস্বতী! বড়টা তুমিই নিও, আমায় ছোটটা দাও। এখনই মামলা মিটিয়ে নেওয়া যাক।'

রহমত আলি বলল, 'না, বড়টা আপনি নিন, ছোটটা আমায় দিন। রাজী?'

'আচ্ছা, কাল দেখা যাবে। কিন্তু কিভাবে কাজ হাসিল করা যায়, সেটাই ভাববার কথা। শুনছি, বধিয়ানি মৌজার সমস্ত মুসলমানই মেয়ে দুটিকে বাগাবার করে আছে।'

'আল্লা চায় তো সব ঠিক হয়ে যাবে —কিন্তু আমি ছোটটাকে নেব ভাই।'

'আরে বড় মেয়েটা ওর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী।'

'সুন্দরী তো আপনি নিন না!'

'আচ্ছা আচ্ছা, এখন থেকে ঝগড়া কেন, কাল আসতে এখনো সারারাত পড়ে আছে!'

'না-না, এখনই ফয়সালা হয়ে যাক। কাল সকলের সামনে আমরা কি ও নিয়ে ঝগড়া করতে পারি! খারাপ দেখাবে না!'

'আমি একটা উপায় বাতলাচ্ছি।'

'কি?'

'লটারী করে ফেলো।'

'কিভাবে?'

'একটা কাগজের টুকরোয় গঙ্গার নাম লেখো, আর একটায় সরস্বতীর। দুটিকে অনেক সাদা কাগজের পুরিয়াতে মিশিয়ে দাও। তারপর পালা করে একটা একটা করে কাগজ তুলতে থাকো। যার হাতে প্রথম কোনো মেয়ের নাম লেখা কাগজ উঠবে, সে তাকে পাবে। অন্য মেয়েটা অপরের হবে।'

'এমনও হতে পারে, যদি একজনের হাতে দুটি মেয়েরই নাম ওঠে···'

'অত লোভ কোরো না।'

'আচ্ছা, চলুন তাহলে, লটারী করে ফেলি।'

লটারী করা হলো। গঙ্গা করম আলির তোলা কাগজে উঠল, তাই সরস্বতী পড়ল জহমত আলির ভাগে। কিন্তু এ লটারীও জহমত আলির পছন্দ হলো না। ভাবল, মেয়ে দুটিকে দেখার পরই সে এ ব্যাপারে ফয়সালা করবে। আল্লার মর্জি হলে এই মুশকিলও আসান হয়ে যাবে।

সন্ধ্যে হতে-না-হতেই অধিকাংশ হিন্দু চাষী, যারা এখন মুসলমান, নিজের নিজের ডেরায় শুয়ে পড়েছে। একটু রাত হতেই 'গাজিয়ানে ইসলাম' চড়ার চারদিকে পাহারা বসিয়ে দিলো। রাজা করম আলি ও জহমত আলির তাঁবুর চারদিকেও কড়া পাহারা।

সেপাইরা একসঙ্গে গান গাইতে শুরু করল।

চাঁদ উঠল আকাশে।

জহমত আলি থাঁর মনে পড়ল তার বউয়ের কথা, বংশের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সে এখন জহমত আলির বাপের কাছে শোয়। জহমত আলি মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করে, তার ছেলে যেন তাড়াতাড়ি বড় হয়।

রাজা করম আলি ভাবেন —আজ তাঁর পাঁচ হাজার 'গাজিয়ানে ইসলাম', দশ হাজার হয়ে গেলেই তিনি বড় শহরে হামলা করবেন, তারপর নিজেকে সই এলাকার রাজা বলে ঘোষণা করে দেবেন। তারপর তিনি নিজে রঞ্জি

ধরে টানতে টানতে নিজের মহলে নিয়ে গিয়ে তুলবেন। যে মহল আজ রাজা শানসিং ও রাজকুমার সংগ্রাসিংয়ের আরাম-আয়েসের জায়গা —সেই মহলে।

নরম বিছানায় শুয়েও রাজা করম আলির চোখে ঘুম নেই। কত রকম স্বপ্ন এসে তাঁর চোখে চমক দিয়ে যায়। স্বপ্নের ভেতরে থাকে রঙিন পর্দা, মেয়ে, জমিজমা, ধর্মীয় কপটতা ও ভীতিপ্রদর্শন —এ স্বপ্ন ঈশ্বরের অভিশাপ, তার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এ স্বপ্ন যেন প্রেতাত্মা, সে তার চারদিকের প্রাণহীন লাশগুলোকে চেয়ে দেখে আর খুশী হয়ে ওঠে। এ স্বপ্ন যেন মৃত্যু, নিজের সঙ্গে জীবনকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। কোমল গালিচার ওপর, নরম পালঙ্কের ওপর, নরম রেশমী বিছানায় এইসব স্বপ্ন এসে হাজির হয়।

বাইরে নদীর চড়ার ভূমিশয্যায় সরল প্রকৃতির শত শত 'গাজিয়ানে ইসলাম' পাথরের বালিশ তৈরী করে ঘুমোচ্ছে —তাদের ওপরে ঝক্‌মক করছে চাঁদ।

* * *

চাঁদ আজ সজ্জনদেবকে পথ দেখায়নি। সে চড়া থেকে কোনো রকমে পালিয়ে গিয়েছিল, আমদাদের সহায়তায়। কিন্তু চাঁদ তাকে বাঁচতে দিলো না —পথঘাট তো তার চেনা-জানাই ছিল না, তাতে আবার পথে চাঁদের জ্যোৎস্না, আবার ধরা পড়ে গেলো সে। কয়েকজন 'গাজিয়ানে ইসলাম' তাকে ধরে নিয়ে এল। বধিয়ানি মৌজার হিন্দু কয়েদীদের যেখানে রাখা হয়েছে, সেখানেই আটক করে রাখা হলো তাকে।

তেরো

রাজা শানসিং নদীতীরের পুরনো প্রাসাদে কর্নেল ডক, মলী ও স্যর টমাস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ডকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বেশ কিছুদিন থেকে রাজাসাহেব লাহোরের ইংরেজি সংবাদপত্র 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট'-এ নিয়মিত দেখে আসছেন যে কাশ্মীরের মহারাজা গদি ছেড়ে দিচ্ছেন। সংবাদ ছাড়াও সংবাদপত্রের হেড লাইনও এমন যে, এই কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

আহারান্তে রাজকুমার সংগ্রামসিং মলীকে নিয়ে বাইরের বাগানে বেড়াতে চলে গেলো। রাজাসাহেব অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে খাবার টেবিল ছেড়ে ধূমপানের কক্ষে গিয়ে সিগার ধরালেন।

রাজাসাহেব নিজে কর্নেল ডকের সিগার ধরিয়ে দিলেন। তারপর তিনজনেই আরাম চেয়ারে চেপে বসলেন। উত্তম খাদ্য, উত্তম পানীয় এবং উৎকৃষ্ট সিগারের মিষ্টি মধুর আমেজে ডুবে গিয়ে তাঁরা জগৎটাকে আনন্দময় দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন, অন্তত আনন্দময় জগতের সম্ভাবনা তাঁদের মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

তখন রাজাসাহেব আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, 'কর্নেল সাহেব! শুনছি না-কি মহারাজা সাহেবকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটের খবর। আপনি তো জানেনই কর্নেল সাহেব, সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট ইংরেজ সরকারেরই বেনামী সংবাদপত্র, আজেবাজে কোনো খবর ছাপবে না।'

'সরকারের বেনামী কাগজ, আমার মতে, কথাটা বোধহয় ঠিক না —কিন্তু…,' কর্নেল ডক পাশ ফিরে বললেন, 'আপনার অসুবিধে কি?'

'আমি নিজের কথাই ভাবছি। আজ তিনি গেলে কাল আমি…'

'আপনি যাবেন না।'

স্যর টমাস বললেন, 'রাজাসাহেব, দুনিয়া বদলাচ্ছে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, নিদারুণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও রাজাসাহেব আমাদের কথায় কান দেননি। ইংরেজ সরকার সব সময় সৎ পরামর্শই দিয়ে থাকে। মহারাজা গুলাবসিংকে আমরা বলেছিলাম পাঞ্জাবী হিন্দুদের প্রশ্রয় দেবেন না, কিন্তু তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্য করেননি। বরাবর তিনি নিজের রাজ্যে ঐ সব লোকদের ডেকে এনে এনে উচ্চপদে নিযুক্ত করেছেন।'

রাজা শানসিং বললেন, 'কিন্তু মহারাজা হরিসিং এসে তো আগের সবকিছু বদলে ফেলেছেন!'

'সেটা ঠিক, কিন্তু কখন? প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কাজের এক-একটি সময় আছে। সময় কেটে যাওয়ার পর কাজ করলে সেটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। মহারাজা হরিসিং আমাদের কথা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু জল তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।'

কর্নেল ডক চক্‌চকে ফানুসের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খানিকটা চিন্তান্বিত গলায় বললেন, 'গুলমার্গের ব্যাপারটাই ধরুন না! কতবার ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হলো যে, গুলমার্গে একটা ইংরেজ ঘাঁটি তৈরী করতে দিতে আজ্ঞা হোক কিংবা গুলমার্গের ঘাঁটিটাই আমাদের দিয়ে দেওয়া হোক। আমরা টাকা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজা রাজী হলেন না। গিলগিটের কথাই ধরুন, এত বিপজ্জনক জায়গা, আফগানিস্তান, রুশ, চীন —এতগুলি দেশের সীমান্ত সেখানে। আপনিই বলুন না, এমন একটা জায়গায় রাজাসাহেব কতটুকু ব্যবস্থা করতে পারেন? কিন্তু যখন আমরা বললাম, গিলগিটের ব্যবস্থাপনা আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক, তখন সে প্রস্তাব তিনি আবার নাকচ করে দিলেন।'

রাজা শানসিং বললেন, 'কিন্তু আমি তো সে রকম কিছু করিনি। সব সময় ইংরেজ রাজমুকুটের কাছে বিশ্বস্ত থেকেছি। গত যুদ্ধে আমার রাজ্য থেকে যত সেপাই সেনাদলে ভর্তি হয়েছে, অন্য কোনো রাজ্য বা জায়গীর থেকে অত সেপাই ভর্তি হয়নি। শুধু সধনি তহশিল থেকেই ষাট হাজার সেপাই দিয়েছি আমি।'

স্যর টমাস বললেন, 'রাজাসাহেব, আপনার বিশ্বস্ততায় সরকার খুব খুশী। এর প্রমাণ, জায়গীর হওয়া সত্ত্বেও এটাকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়।'

কর্নেল ডক বললেন, 'পরেও এটা বজায় থাকবে —দেখবেন আপনি।'

রাজা শানসিং কর্নেল ডকের হাত ধরে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনারা যদি আমার রাজ্যটাকে কাশ্মীর থেকে পৃথক করে দেন, তাহলে বড় উপকার হয়। এখন তো শুনছি মহারাজা শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিতে চলেছেন, সুতরাং এটা একটা চমৎকার সুযোগ।'

স্যর টমাস বললেন, 'রাজাসাহেব, আপনি তো জানেন, আমি বরাবর চেষ্টা করছি, কিন্তু এখন এই গণ্ডগোলে কিছু হবে না। পরিস্থিতিটা একটু সামলে উঠতে দিন।'

'পরিস্থিতি কি করে সামলানো যাবে সাহেব? পরিস্থিতি তো রোজই খারাপের দিকে চলেছে। চারটে তহশিলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন শহরে হিন্দু ও শিখেরা দলে দলে আসছে।'

কর্নেল ডক বললেন, 'সেটা ঠিক। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আনা আপনার কাজ। আপনি যদি আপনার এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে না পারেন, তাহলে আপনার জায়গীর, রাজ্যের কথা কি বলব, জায়গীরটাই থাকবে কি-না সন্দেহ।'

'আমি তো সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

স্যর টমাস উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমায় মাফ করবেন, মাথাটা ভারি-ভারি মনে হচ্ছে, অনুমতি দিন, গিয়ে একটু আরাম করি।'

স্যর টমাসের চলে যাওয়ার পর রাজা শানসিং আরও খোলাখুলি কথাবার্তা শুরু করলেন, 'কর্নেল সাহেব, আসলে আমাদের বংশই হলো কাশ্মীরের শাসনক্ষমতার উত্তরাধিকারী। রাজা গুলাবসিংয়ের মৃত্যুর পর আমারই সিংহাসন পাওয়া উচিত ছিল। তা না হয়েছে না হোক, সরকারের যা অভিপ্রায়, ছেড়ে দিন সে কথা। কিন্তু এখন যদি মহারাজা সাহেব গদি ছাড়েন তো....' রাজা শানসিং চুপ করে গেলেন।

কর্নেল ডক মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

রাজা শানসিং হাততালি দিলেন। শাহী গার্ডের একজন অফিসার ও একজন এ. ডি. সি. এসে হাজির হলো। রাজাসাহেব একটি বিশেষ ইঙ্গিত জানালেন তাদের। ওরা দু'জন তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরে গিয়ে পরমুহূর্তেই রেশমী কাপড়ে ঢাকা একটি সোনার পিরিচ নিয়ে এল।

রাজা শানসিং সেই পিরিচটা কর্নেল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা আমার তরফ থেকে আপনার ও আপনার মেয়ের জন্যে যৎসামান্য উপহার।'

কর্নেল ডক পিরিচের কাপড় তুলে দেখলেন। গলায় পরার জন্যে একখানি জড়োয়া হার, পদ্মরাগমণি-নীলা-পোখরাজ-খচিত। সোনার দুটি আঙটি, তাতে

লাল পাথর বসানো। দুটি পুরনো ঢঙের কর্ণাভরণ, তাতে সবুজ রঙের বহুমূল্য হীরে। সোনার একশো মোহর।

রাজা শানসিং বললেন, 'একবার আমি এই জড়োয়া হারগাছি বোম্বাই নিয়ে গিয়ে সেখানকার জহুরীদের দেখিয়েছিলাম। তারা এটার দাম ষাট লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু টাকা তো কোনো জিনিস নয় কর্নেল সাহেব! এটা আমার মা-র গলার হার। আপনার মেয়েকে উপহার দিচ্ছি। আপনি 'না' বললে, মনে রাখবেন—আমি রাজপুত।'

কর্নেল সাহেব হেসে বললেন, 'রাজাসাহেব, আপনার মতো রাজপুতের কোনো রাজ্যেরই অধিপতি হওয়া উচিত দেখছি।'

'এখন সমস্ত কিছু আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। কাল তো শ্রীনগর যাচ্ছেন, হয়ত আবার দিল্লীও যাবেন?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে।'

'তাহলে আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

কর্নেল সাহেব মৃদু হেসে ভীষণ আগ্রহে রাজাসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'এই মুহূর্তে আপনার মুঠোর মধ্যে যে হাত রয়েছে, সেটা ইংরেজের হাত। আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে আপনাকে। আমায় চেষ্টা করতে দিন।'

'পথে কোনো আপদ-বিপদ নেই তো? শহর থেকে উড়ী যাওয়ার রাস্তাটা এখনও খোলা রয়েছে। তবু যদি বলেন, আপনার আরদালীর জন্যে আমার কয়েদখানা থেকে কয়েকজন লোক দিয়ে দেবো?'

'না-না, ও সবের কি দরকার! আমার নিজের ইংরেজ কয়েদখানা তো রয়েছেই। সেটা থাকতে আমার আবার বিপদ কি! বরং আপনি যদি বলেন, আপনার জায়গীরের নিরাপত্তার জন্যে শ্রীনগর থেকে ডোগরা ফৌজ পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'না-না, আমি সব ব্যবস্থা করে নেব। এটা আমার কাজ, মুসলমানদের সঙ্গে কয়েকবারই আমায় মোকাবিলা করতে হয়েছে এ ব্যাপারে। এ-বারও এ রকম দাঙ্গা হতো না, যদি বাইরের মুসলমান, মানে পাঞ্জাবী লোক এদের মদত না দিত। তাছাড়াও বহু ইংরেজি খবরের কাগজও এদের পক্ষাবলম্বন করছে—সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটকেই দেখুন না—এটাকে তারা কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীনতার আন্দোলন বলছে। তাহলে বলুন, ইংরেজি খবরের কাগজগুলোই যদি বিদ্রোহীদের মদত দিতে শুরু করে, তাহলে তো রাজ্যপাট চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে!'

'রাজাসাহেব, খবরের কাগজের লোকেরা তো ও রকম লিখেই থাকে, তাতে ওদের ওপর রাগ করা উচিত নয়। বাকী রইল সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটের প্রশ্ন, আমার মতে ওটা সরকারী কাগজ নয়। একটা প্রাইভেট কোম্পানীর কাগজ,

অবশ্য তার এডিটর ইংরেজ। কিন্তু তাতে কি, কাগজের পলিসি-টা তো কোম্পানীর ডাইরেক্টরদেরই। তাছাড়া আমি এটাও জানি যে, ওতে মুসলমানদের সংখ্যাটাই বেশী।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপার তাহলে?'

'হ্যাঁ, আপনারা তো শুধু শুধু ভয় পেয়ে যান। ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয় রাজকুমার নিজের ছেলের চেয়েও আদরের।'

* * *

কর্নেল ডক ও মলীকে বিদায় জানাতে রাজকুমার সংগ্রামসিং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রেসিডেন্সি পর্যন্ত গেলো। ওরা চলে গেলে রাজা শানসিং জমাদার কাহনসিংকে ডেকে পাঠালেন। শহরের বর্তমান অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন তার কাছ থেকে।

জমাদার কাহনসিং শহর ও শহরের আশপাশের এলাকার অবস্থা সম্পর্কে যা বলল, তাতে রাজাসাহেবের আতঙ্ক আরও বেড়ে গেলো। এ যাবৎ রাজধানী, রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকা ও তার উপত্যকাসমূহ দাঙ্গামুক্ত ছিল, এখন সে সব জায়গাতেও দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে সধন উপত্যকায়, যা বলতে গেলে এক প্রকার রাজধানীর চাবিকাঠি। সধন উপত্যকা যার হাতে যাবে, রাজধানী আক্রমণ করা তার পক্ষে কঠিন নয়। যে দিন থেকে সেখানে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, সে দিন থেকেই রাজাসাহেবকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

রাজা শানসিং জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে জমাদারজী, সুবেদার নজির মহম্মদের পল্টনের কি হলো?'

জমাদার কাহনসিং জবাব দিলো, 'সে তো বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে হুজুর।'

'তারপর?'

'তারপর কমাণ্ডার সাহেব মেজর সোমনাথের পল্টন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে পল্টনও মারা পড়ল। হুজুর! মেজর সোমনাথ, জাতে বামুন, সে আর কি যুদ্ধ করবে! হুজুর তখন যদি সোমনাথের বদলে আমায় পাঠাতেন…' জমাদার কাহনসিং হাত জোড় করল।

রাজা শানসিং পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলেন। তারপর তিনি এক সময় এ. ডি. সি.-কে ডেকে বললেন, 'কমাণ্ডার সাহেবকে ডাকো, হ্যাঁ, এক্ষুনি। আমি মেজর সোমনাথের জায়গায় জমাদার কাহনসিংকে মেজর নিযুক্ত করছি। ওকে একটা পল্টন দিয়ে শীগ্‌গীর সধন পাঠিয়ে দাও—আমার হুকুম।'

'যে আজ্ঞে মহারাজ!' এ. ডি. সি. মাথা হেঁট করে প্রণাম জানাল। মেজর কাহনসিং তার সঙ্গে অফিসে গেলো নতুন আদেশ লেখাতে, যাতে রাজাসাহেব আবার নিজের মতটা না বদলে ফেলেন।

মেজর কাহ্নসিং পল্টন নিয়ে প্রথমেই শহরটাকে একবার পরিক্রমা করে নিল। সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাজনা। ব্যাণ্ডপার্টির লোকগুলো ইংরেজি কায়দায় ঝলমলে উর্দি পরে যুদ্ধের বাজনার সঙ্গে গান গেয়ে চলে, সেই বাজনা ও গান শুনে যুদ্ধের ঘোড়াগুলো রীতিমতো উত্তেজিত। পল্টনটি তন্দুরওয়ালার বাজার থেকে যাত্রা করে কাশ্মীরী বাজার, সেখান থেকে ভৈরব মন্দিরের কাছ দিয়ে দরয়ানি বাজার, সেখানে একটা চক্কর দিয়ে শহরের অলিগলিতে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে, তারপর ওপরের শহরে যেখানে স্বর্ণকার, ঠিকেদার ও ফলচাষীরা বসবাস করে, সেই খোড়িনাড়ে গিয়ে মার্চ করতে শুরু করল।

খোড়িনাড়ের লোকেরা পান-ভোজনে দরাজ, তাই খোড়িনাড় তার রঙচঙে রাত্রি, ঝলমলে পোশাক ও দেহোপজীবিনী মেয়ের জন্যে বিখ্যাত। এখানে এসে মেজর কাহ্নসিং একটা লম্বা চক্কর দিলো, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, এখন সে রাজার সেনাবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ মেজর, এক মামুলী হেঁজিপেঁজি জমাদার হয়ে বসে নেই।

ফতেহসিং সেকরার মেয়ে ইন্দ্রাকে কাহ্নসিংয়ের খুব পছন্দ। তাদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ছাদের খোলা জানালায় বাতাসে দুলতে থাকা পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দু-একবার উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টাও করল, কিন্তু বুঝতে পারল না ইন্দ্রা পর্দার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছে কি-না। লক্ষ্য করে থাকলেও তার অগোচরে।

যা হবে হোক গে!

খোড়িনাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে নিচে নেমে ডোগরা পল্লী, গলির রাস্তা দিয়ে সে তাদের বাড়ির সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর বৃদ্ধ বাবার পদধূলি নেওয়ার জন্যে ভেতরে গেলো। বাবা ছেলেকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। স্ত্রী ও ছেলেরা এসে কাছে দাঁড়াল। সে তাদের মাঝখানে উঁচু ঝুঁটিওয়ালা মোরগের মতো কঁক-কঁক করল কিছুক্ষণ, তারপর সেখান থেকে বিদায় নিল।

তার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করল। ইতিপূর্বে মেজর সোমনাথ মারা গেছেন, সোমনাথের স্ত্রী বিধবা হয়েছে। এ-বার কি তার পালা! সমাজ বিধবাকে ভালো চোখে দেখে না, নইলে কাহ্নসিংয়ের রূপযৌবন ছাড়া আর কি রয়েছে যে, সে তার স্বামীকে ভালোবাসার জন্যে আকুল হয়ে উঠবে! দুটি ছেলে আছে, ঠিক আছে। কিন্তু স্ত্রীকে রোজ হাণ্টার দিয়ে পেটানো তো এমন জিনিস নয় যে, তার জন্যে স্ত্রী ক্রমাগত প্রেম নিবেদন করবে আর হাণ্টারের পিটুনি খাবে! কাহ্নসিংয়ের স্ত্রীর মনে কত শত চিন্তা দেখা দিলো—সে বিধবা হবে, তাতে তেমন দুঃখ নেই; তার স্বামী মারা যাবে, সেটাও এমন কিছু দুঃখের নয়; রাত্রে তাকে বড় নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাতে হবে, কিন্তু তারও একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সে কাঁদতে কাঁদতে উঠোনের দিকে তাকাল—একপাশে তার ছোট

ঠাকুরপো সপ্রেম দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। অমনি সে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। ঠাকুরপো কাছে এসে সান্ত্বনা দিতে দিতে চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল। ঠাকুরপোর মনে হলো, বউদির চোখ দুটি কি সুন্দর ডাগর ডাগর। আর বউদি ভাবল, এই হতচ্ছাড়াটাও একদিন হাণ্টার দিয়ে পেটাবে, সে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরপোর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো। পল্টনের লোকজন গলিটা পেরিয়ে যেতেই সবাই পল্টন, মেজর কাহনসিং ও ব্যাণ্ড বাজনার কথা বেমালুম ভুলে গেলো, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা।

পল্টন মেজর কাহনসিংয়ের নেতৃত্বে সধন উপত্যকার দিকে চলল।

পথে পল্টনের লোকেরা দেখল, গ্রাম থেকে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে দলে দলে শহরের দিকে আসছে। মেজর কাহনসিং তাদের পুরনো শহরটাকে, যেখানে তাদের পরিবার শত শত বছর ধরে বাস করে আসছে, চোখের সামনে সেটাকে দ্রুত বদলে যেতে দেখছে। কারণ শহরও তো ঠিক মানুষের মতোই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। হাসে, কাঁদে, গান গায়, দুঃখ-কষ্টে ভোগে, আনন্দে উল্লসিত হয়, ভাবনা-চিন্তা করে, আবার উৎসবে নিজেকে সাজায়। শহরেরও মুখ আছে, গলাধঃকরণ করে, বমি করে, বীজ বোনে। শহরেরও ধমনী-শিরা আছে, রক্ত-মাংস আছে। তার দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের নালা আছে, পরিষ্কার রক্ত ও বাতাস গ্রহণ করার জানালাও আছে। মানুষের মতো শহরেরও শরীর আছে। মানুষের মতোই সে বৃদ্ধি পায়, বিস্তৃত হয়, বৃদ্ধ হয়, বুদ্ধিমান অথবা মূর্খ হয়। তাই মেজর কাহনসিং তার শহরের জন্যে চিন্তিত। এত তাড়াতাড়ি শহরটা বদলে গেলো! কয়েক দিনের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক শহরে প্রবেশ করতেই শহরটা অন্য রকম হয়ে গেলো। এত লোকের জন্যে শহরটাকে তৈরী করা হয়নি, যে দিকে যাওয়া যায়, সে দিকেই শুধু বিরস বিষণ্ণ মুখ চোখে পড়ে। শহরের চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। প্রথম প্রথম শহরের লোকেরা বহিরাগতদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, অন্নসত্রও খুলেছিল, সেখান থেকে বিনামূল্যে রুটি বিতরণ করা হতো। কিন্তু যখন মানুষ ক্রমাগত দলে দলে আসতে শুরু করল, তখন সহানুভূতি উবে গেলো, ভাবনা বাড়তে লাগল। তারপর সেই ভাবনা যন্ত্রণা ও সংঘর্ষে রূপান্তরিত হলো। একদিকে যেমন খাদ্যশস্যের দাম বাড়ছে, তেমনি মেয়েদের দাম কমছে। শহরের স্বচ্ছল লোক, সৈন্যসামন্ত, ডোগরা মহাজন, আর ছোটবড় জায়গীরদারের কাছে এমন মৌজের দিন আগে কখনও আসেনি, কিন্তু শহরের সাধারণ লোকের কষ্ট দিন দিন বেড়ে চলেছে—ধর্ম, বিশ্বাস, জুতো-কাপড়, খাদ্যশস্য, ঘরবাড়ি—প্রত্যেকটি জিনিসের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। মেজর কাহনসিংয়ের মতো জুলুমবাজ লোকও বুঝতে পারছে যে, বছরের পর বছর ধরে চেনা জানা শহরটা বদলে যাচ্ছে, তার সারা শরীরে যেন কুষ্ঠব্যাধির চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠছে।

রাজা মানসিংয়ের হুকুমে শহরের বাগানে বাগানে, প্রত্যেকটি গলিঘুঁজিতে, প্রত্যেকটি বাড়িতে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে —তবু জায়গায় কুলোয় না। সে জন্যে শরণার্থীরা যেখানেই একটু খালি জায়গা দেখতে পায়, সেখানেই ডেরা পাতে; এমন কি দুর্গের একাংশও শরণার্থীদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। শহরে কলের বসন্ত ছড়িয়ে পড়ছে, আমাশয়ের রোগী দিন দিন বাড়ছে, শ্মশানঘাটে চিতে জ্বালানোর কাঠের দাম বেড়ে চলেছে। চারটে তহশিল থেকে রসদ সরবরাহ বন্ধ মেজর কাহনসিংয়ের মনে হলো, যেন কোনো উৎপীড়ক কঠোর হাতে তাদের শহরের ঘাড়টাকে চেপে ধরেছে।

* * *

মেজর কাহনসিং মনে মনে মুসলমানদের শত শত গালাগালি দিলো। পথে গ্রামের সর্বস্বান্ত মানুষ যতই দেখে, ততই রাগ বাড়তে থাকে তার।

তার পল্টনের এগিয়ে চলার খবর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছিল, তাই সে যে দিক দিয়েই যায়, মুসলমান চাষীরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে। এখন তার পল্টনের সেপাইরা গ্রামে পড়ে থাকা নারী-শিশুদের ওপর সেই একই ব্যবহার করে, যা এতদিন তাদের কপালে জুটছিল। কখনো কোনো গ্রামে একটাও লোক না পেলে পুরো গ্রামটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে আবার সামনে এগোয়।

সন্ধ্যের আগে পল্টনটি মধনের গিরিপথ পেরিয়ে সেই গ্রামে এসে হাজির হলো, যে গ্রাম দিয়ে মৌলভী, মঞ্জুর ও ফজল বধিয়ানি গ্রামের দিকে গেছে।

মেজর কাহনসিং যখন দেখল, একটা দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা আছে, 'হিন্দুরা, তোদের মা-র...' তখন তার ভীষণ রাগ হলো। সে সেখানেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। একজন জমাদারকে দিয়ে লেখাটা কাটিয়ে তার ওপর লেখাল— 'মুসলমানরা, তোদের মা-র...।' কিন্তু তাতেও তার মন খুশী হলো না। অস্থির অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ কাটল তার। ইচ্ছে করছে, যদি এই মুহূর্তে কোনো একটা মুসলমান জুটে যায়, তাহলে তাকে চাবুক মেরে মেরে তার সারা গা রক্তাক্ত করে দেয় সে।

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সে ঘোড়ার পেটে এড়ি লাগাল, ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সে সৈন্যদের বলল, 'এখন কোথাও যদি কোনো মুসলমান চোখে পড়ে, তাহলে সবার আগে আমাকে জানাবে।'

সৈন্যরা বলল, 'ঠিক আছে হুজুর।'

অনেক দূর পর্যন্ত মুসলমান বা হিন্দু দূরের কথা, একটা জানোয়ারও চোখে পড়ল না। অবশেষে, বহুক্ষণ পর, রঙ্গড়ের জঙ্গলে এক মুসলমান বৃদ্ধাকে দেখা গেলো। একেবারে সামনে দিয়ে সে চলে যাচ্ছে, অশক্ত পায়ে টলতে টলতে। চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়ছে।

একজন সৈন্য লাফিয়ে তার কাছে গেলো, 'কে তুই?'

বৃদ্ধা বলল, 'আমি বুড়ো মানুষ বাবা। রাস্তা ভুল করেছি।'

'এখানে জঙ্গলে কি করতে এসেছিলি?'

'শুনলাম, সৈন্য আসছে আমাদের বাড়ির সবাই পালিয়ে এসে এই জঙ্গলে লুকিয়েছে, তাই আমিও চলে এলাম। কিন্তু বেলা পড়ে গেলে চোখে কিছু দেখতে পাইনে। তাই বুঝতে পারছিনে ওরা কোথায় লুকিয়ে বসে আছে! রাস্তা ভুল করে ফেলেছি—তুমি কে বাছা?'

মেজর কাহনসিং মৃদু হেসে বলল, 'কে, সেটা তোর বাছা এখুনি বলছে। দেখছ কি জওয়ান, ফেলে দাও ওকে।'

সৈন্যটা বলল, 'হুজুর, এ যে বুড়ি! আমার মা-র মতো!'

মেজর কাহনসিং চিৎকার করে উঠল, 'আমি বলছি, ওকে ফেলে দাও। আমার হুকুম, শুনতে পাচ্ছ না!'

'হুজুর, আমার কথাটা অন্তত শুনুন ··· ও বেচারী······'

'থামো! আমার হুকুম না মানলে কোর্ট মার্শাল করব তোমার।'

বৃদ্ধা জোড়হাতে থরথর করে কাঁপতে লাগল, 'আমায় মাফ করো বাবা আমার ছেলেপিলে নাতিপুতি রয়েছে। চোখে কিছু দেখতে পাইনে। আমি অন্ধ, আমার ওপর জুলুম কোরো না বাবা।'

মেজর কাহানসিং চিৎকার করে বলল, 'এখুনি তুই চোখে সব কিছু দেখতে পাবি! জওয়ান, কি দেখছ?'

সৈন্যটিকে নির্বিকার দেখে মেজর কাহনসিং পিস্তল বের করল, 'ফেলে দিবি ওকে, না পিস্তল চালাব?'

জওয়ান একই জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

মেজর কাহনসিং চোখ লাল করে চারদিকে তাকাল। এমন সময় এক জমাদার খুব দ্রুত সামনে এগিয়ে এল। জওয়ানটিকে দু' ঘুষি মেরে দূরে সরিয়ে দিলো। তারপর সে বৃদ্ধাকে এক ঠোক্কর মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃদ্ধার ওপর।

বৃদ্ধা আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু তার আর্তনাদ কেউ শুনতে পেল না, কারণ তার চারদিকে জঙ্গল, চারদিকে শ্বাপদ জন্তু দাঁড়িয়ে।

* * *

মেজর কাহনসিং বাইশ দিন ধরে তাণ্ডব চালিয়ে এখন শহরে ফিরে চলেছে। এই বাইশ দিনে ডোগরা সৈন্য অনেকগুলি ঘাঁটি পুনরাধিকার করেছে, সধন উপত্যকার বিদ্রোহীদের সাফ করে দিয়েছে। কেবল উত্তর-পূর্বের কাগানী অঞ্চলের এবড়ো-খেবড়ো উপত্যকায় কোথাও কোথাও কিছু বিদ্রোহী হয়ত থেকে

গেলো। নইলে মেজর কাহনসিং যেখানে যেখানে গেছে, সেখানেই সব ঠিক করে দিয়ে এসেছে।

কাজটা সোজা নয়। মেজর কাহানসিংয়ের সৈন্যসংখ্যা অল্পই, কিন্তু কাহনসিং মিলিটারী ক্ষমতার চেয়ে নিজের ক্ষমতাতেই কার্যোদ্ধার করেছে বেশী। তাই ডোগরা সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য কমাণ্ডাররা যে সব জায়গায় ব্যর্থ হয়েছিল, সে সব জায়গার প্রত্যেকটিতেই সফল পদক্ষেপ ফেলে এসেছে কাহনসিং।

এ সময় মেজর কাহনসিং একটি চমৎকার চিতে ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনে মনে গত বাইশ দিনের পর্যটনের পর্যালোচনা করছিল আর ভাবছিল কত ধুমধামের সঙ্গে শহরে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

তার সঙ্গে, একটু পেছনে, দু'জন ডোগরা সৈন্যের পাহারায় রাজা করম আলি একটি ঘোড়ায় চেপে আসছেন। এত কাছে যে, মেজর আড়চোখে দেখতে পাচ্ছে তাকে।

মেজর মৃদু হাসল। সেই রাত্রির পুরো ঘটনাটি মনে পড়ল, যে রাতে সে কাগানের তীরে শিবির গেড়েছিল, বধিয়ানি থেকে সাত মাইল নিচে। রাতের মধ্যেই ওপরে গিয়ে বধিয়ানিতে হামলা চালিয়ে রাজা করম আলি ও জহমত খাঁ-র সমস্ত লোকজনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, বহু শিখ ও হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

মেজর আড়চোখে করম আলির দিকে তাকাল, তাঁর বিমর্ষ মলিন মুখখানিতে চিন্তাভাবনার ছায়া। শিথিল হাতে লাগাম ধরে মাথা হেঁট করে বসে আছেন, যেন তাঁর শরীরে শিরদাঁড়া নেই। ঘোড়া পা ফেলে ফেলে হাঁটছে, সেইসঙ্গে তাঁর শরীর দুলছে, তাঁর মাথাটাও ঘোড়ার মতো নড়ছে, যেন তিনি কোনো ঘোড়সওয়ার নন, ঘোড়ার শরীরেরই একটা অঙ্গ বিশেষ।

মেজর মৃদু হেসে সে রাতের আক্রমণের কথা স্মরণ করল। রাত্রিবেলা বধিয়ানির নিচের সাত মাইল পথ অতিক্রম করে কাগানের নালা পেরিয়েছিল তারা, তারপর শত্রুদের পেছনে এসে উপত্যকায় কামান পেতেছিল। মেজর লক্ষ্য করেছিল, বিদ্রোহীরা ঘুমোচ্ছে, যারা জেগে আছে তারা গল্পগুজবে মত্ত, কেউ কেউ আগুন পোয়াচ্ছে, কেউ-বা পাহারা দিচ্ছে —ওরা ভেবে রেখেছিল, শত্রু সামনে দিয়ে আসবে, কিন্তু শত্রু এসে পড়ল পেছন দিক দিয়ে।

আক্রমণ ছিল একেবারে আচমকা, তার ওপর পেছন থেকে, ফলে বিদ্রোহীদের পক্ষে হামলার কোনো জবাব দেওয়াই সম্ভব হয়নি। প্রাণ নিয়ে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে ব্যস্ত। কাগানের নালা পার হতে গিয়ে অনেকে জলে ভেসে গেলো। জহমত আলি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই হুড়োহুড়ির মধ্যে শত্রুমিত্র চেনা দুষ্কর। কয়েক শো হিন্দু ও শিখ চাষী ছিল, কিন্তু সদ্য ধর্মান্তরিত বলে তাদের বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। বহু বিদ্রোহী

নিজেদের মধ্যে পরস্পরকেই মেরে ফেলল, বহু শিখ ও হিন্দুও এই রকম ভুল বোঝাবুঝির ফলে মরল, কিন্তু সকাল হলে দেখা গেলো লড়াইয়ের ময়দান ডোগরা সেনাবাহিনীর হাতে। সকাল হবার আগেই তারা চারদিকে বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলেছিল।

রাজা করম আলি আত্মসমর্পণ করলেন। জহমত আলি কোথায় যে উধাও হলো তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। রাজা করম আলির তাঁবু থেকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দুটি মেয়েকে উদ্ধার করা হলো। একজন গঙ্গা, আর একজন সরস্বতী। মেজর কাহনসিং তাদের শরীরের বাঁধন খুলে দিয়ে সঙ্গে নিয়ে নিল।

জহমত আলি উধাও হয়ে যাওয়াতে ও রাজা করম আলি ধরা পড়াতে সে অঞ্চলের বিদ্রোহীদের কোমর ভেঙে পড়ল। বধিয়ানি গ্রাম থেকে টিকরী, শাহমুরাদ, তোরাহা, জানোরা ও পড়দারী পর্যন্ত অঞ্চল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাকী জায়গাগুলোতে এক-আধটু বাধা পেয়েছিল তারা, কিন্তু জমাট লড়াই হয়নি কোথাও।

মেজর সারা অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনল ঠিক, কিন্তু এমন একটা সমস্যা দাঁড়াল, যার কোনো সমাধান খুঁজে পেল না সে। তারা যেখানেই যায়, সেখানেই হিন্দু-শিখ চাষী বেনে-ব্যাপারী এসে তাদের সঙ্গে ভিড়ে যায়। নিজেদের ক্ষেত খামারে বাড়িঘরে বসবাস করার জন্যে তাদের অনেক বোঝানো সত্ত্বেও তারা তাতে রাজী নয়। অতএব, সধন উপত্যকায় বাইশ দিন পর্যটনের পর যখন সে শহরের দিকে পা বাড়াল, তখন তার সঙ্গে পাঁচ হাজার শরণার্থী।

মেজর কাহনসিং তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। পেছনে যে সব সেপাইরা গঙ্গা ও সরস্বতীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছিল, তাদের দিকে এগিয়ে গেলো। মেজরকে ফিরে আসতে দেখে সেপাইরা পেছনে সরে গেলো একটু. সে তার ঘোড়া গঙ্গা ও সরস্বতীর ঘোড়ার কাছে নিয়ে এল।

'শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা।' —দুই বোনের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে মেজর বলল। বলতে বলতে তার চোখের দৃষ্টি সরস্বতীর মুখ থেকে সরে গিয়ে গঙ্গার মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে গেলো।

সরস্বতী জিজ্ঞেস করল, 'শহর আর কদ্দূর ঠাকুরজী?'

'আজ বিকেলবেলা আমরা পৌঁছে যাব সেখানে।'

'বাঃ! শহরটা নিশ্চয় খুব বড়। আমি আজ পর্যন্ত শহর দেখিনি।'

'তোমাদের গাঁয়ের চেয়ে নিশ্চয় বড়।'

'শুনেছি সেখানে সমস্তই টিনের চালের বাড়ি!'

'সব নয়, তবে সে রকম বাড়ি অনেক আছে। আমরা কনৌত্তিয়ার পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে যখন পৌঁছাব, তখন সেখান থেকে শহর চোখে পড়বে। ওখান থেকে পুরো শহরটাই দেখা যাবে।'

সরস্বতীর চোখ-মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এইসব কথাবার্তার মধ্যেও গঙ্গা একেবারে চুপচাপ। সে কাহনসিং কিংবা সরস্বতী, কারোর দিকেই তাকাচ্ছিল না।

মেজর তার দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে বলল, 'সামনে বেশ কিছুদূর রাস্তা একেবারে পরিষ্কার, আমার সঙ্গে ঘোড়া দৌড়াবে?'

গঙ্গা কোনো জবাব না দিয়ে ঘোড়ার পেটে এড়ী মেরে এগিয়ে গেলো। এখন ওরা দু'জন পল্টনের আগে আগে বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে আস্তে আস্তে ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।

ওদের সামনে যেতে দেখে একজন সেপাই বলল, 'ভীমসিং, আমাদের মেজর সাহেব আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে নিয়ে এমন বিপদে পড়েনি!'

ভীমসিং বলল, 'হ্যাঁ শামশের, ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু মেয়েটাকেও ত্যাখো, কেমন মারকুটে ঘোড়ী!'

'কিন্তু ভীমসিং, মিলিটারী হয়ে মেয়ের পেছনে এত সময় বরবাদ করা ভালো নয়। আমাদের আগের মেজর সাহেবও এই রকম করতেন। মেয়ে তুলে নিয়ে আসতেন আর মাটিতে পটকাতেন। এখন মেয়ে তুলে নিয়ে এসে মাটিতে পটকানো তো দূরের কথা, মেজর সাহেব নিজেই আর মাথা তুলে উঠছেন না, সেখানেই পায়ের তলায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।' শামশের জোরে জোরেই কথাগুলো বলছিল। —সমস্ত সেপাইরা সশব্দে হেসে উঠল।

* * *

ঘোড়ায় দৌড়াতে দৌড়াতে গঙ্গা ও কাহনসিং বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলো, তবে এমন দূর নয় যে, পেছনের পল্টন দেখা যাচ্ছে না। ওদের দেখা যাচ্ছে ঠিকই, তবে তাদের কথাবার্তা ওদের কানে গিয়ে পৌঁছাবে না।

কাহনসিং পেছন ফিরে দেখে মনে মনে খুশী হলো। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি চুপ করে আছ কেন?'

গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'কি বলব?'

'কথা-টথা বলো কিছু।'

'কথা থাকলে তো বলব!'

'তোমাদের ওখানে তুমি আমার সঙ্গে হাসিমুখে কত কথা বলতে। এখন, যখন আমরা শহরে যাচ্ছি, তখন তোমায় বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'কেন?'

'গাঁয়ের কথা মনে পড়ছে আমার।'

'এখন, গাঁয়ে তোমার কি এমন আছে? তোমার মাকে তো মুসলমানরা মেরে ফেলেছে।'

গঙ্গা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না, ওরা মারেনি। মা নিজেই জলে ডুবে মরেছে।'

'একই কথা। ওরা তাকে ধর্মভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল, সেই ভয়েই সে মরেছে।'

গঙ্গা ঠোঁট কামড়াল। কথাটা মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ভীষণ সত্য, কথাটা বারবার তার মনের মধ্যে উঁকি মারছে। সেই রাতটির কথা সে কখনও ভুলবে না···

ওরা থানায় আটক ছিল। সবেমাত্র তাদের জন্যে খাবার আনা হয়েছে, এমন সময় রাজা করম আলির কয়েকজন সেপাই এসে তাকে, তার মাকে ও তার দিদি সরস্বতীকে থানা থেকে নিয়ে যায় নিচের নদীর চড়ায়।

তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বলছে। তাঁবুর পেছনে কাগানের নালায় জলোচ্ছ্বাসের শব্দ—তাছাড়া চারদিকে গভীর স্তব্ধতা। রাজা করম আলি ও জহমত আলি দু'জনে চেয়ারে বসে বসে এমন দৃষ্টিতে তাদের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে যে, সে দৃষ্টির নোংরামি গঙ্গা এখন বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে। জহমত আলি ওদের মুসলমান হতে বলে—ওরা রাজী হয়নি। ওরা বলে যে ওদের মাথা কেটে ফেললেও ওরা তাতে কিছুতেই রাজী হবে না।

তখন রাজা করম আলি বলেন, 'এদের দু'জনকে দড়িতে বেঁধে আমার তাঁবুতে রাখো।'

জহমত আলি বলে, 'আপনার কষ্ট করার কি দরকার, আমার কথা শুনুন।'

'না-না, এতে আর কষ্ট কি!'

'তাঁবুর ভেতরে চলুন, আপনার সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে চাই।'

ওরা দু'জন তাঁবুর ভেতরে গেলো। একটু পরেই সেপাইরা ওদের দুই বোনকে বেঁধে তাঁবুর ভেতরেই এক পাশে রেখে যায়।

ওদের কাছে দাঁড়িয়েই করম আলি ও জহমত আলি খাঁ কথা বলতে লাগলেন। রাজা করম আলি বললেন, 'আমি ভাই ছোটটাকে নেব।'

জহমত আলি খাঁ বলল, 'ছোটটা আমাকে দিন। আপনি বরং বড়টা নিয়ে নিন।'

'কিন্তু ছোটটাই আমার পছন্দ।'

'আরে বড়টাতেও যা···'

জহমত আলির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে করম আলি বললেন, 'তাহলে বড়টা তুমিই নাও না! বেকার কথা বাড়াচ্ছ কেন?'

জহমত আলি বলল, 'রাজাজী, আমি কথা বাড়াচ্ছিনে। আমি এত কথা বলছি শুধু এই জন্যে যে, আপনি আমার চেয়ে মান-সম্মান-বয়স, সব কিছুতেই বড়, সে জন্যেই বলছি—বড়টা আপনি নিয়ে নিন, ছোটটা আমাকে দিন।'

'যদি আমায় বড় বলে মেনে থাকো, তাহলে পছন্দ করার হকটা আমায় দাও। আমি যাকে ইচ্ছে বেছে নেব।'

'তাহলে লটারী হয়ে যাক।'

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

'তাহলে মেয়ে দুটিকেই জিজ্ঞেস করে নেওয়া হোক।' জহমত আলি দ্বিতীয় প্রস্তাব রাখল।

গঙ্গা সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল, 'আমরা তোমাদের দু'জনের মুখেই থুতু দিই।'

রাজা ও জহমত হাসতে শুরু করলেন।

এমন সময় এক সেপাই দৌড়তে দৌড়তে ভেতরে এল। বলল, 'হুজুর, এই মেয়ে দুটির মা প্রাণ দিয়েছে। কাগানের জলে ডুবে মরেছে।'

রাজাসাহেব মেজাজ গরম করে বললেন, 'কি বাজে বকছ?'

'ঠিক বলছি হুজুর। আমরা এখানে তাঁবুর বাইরে আগুন পোয়াচ্ছিলাম, ওকে বেঁধে রাখিনি, ভেবেছিলাম, বুড়ো মানুষ, পালিয়ে যাবে কোথায়! সে-ও ওখানে বসে বসে আগুন পোয়াচ্ছিল আর কাঁদছিল হুজুর। তারপর সে আচমকা উঠে এমন দৌড়তে শুরু করে যে, আমরা 'থ' হয়ে যাই। দেখতে দেখতে একেবারে নালার ধারে গিয়ে পৌঁছায়। আমরা ডাকাডাকি করি, কিন্তু সে আমাদের কথায় কান দিলো না। আমরা ছুটে গেলাম তার দিকে, তখন সে জলে নামতে শুরু করেছে হাঁটুজল থেকে কোমর জলে, কোমর জল থেকে গলা জলে—তারপর আমাদের চোখের সামনেই ডুবে গেলো হুজুর।'

করম আলি চিৎকার করে বললেন, 'হতভাগা, তোরা ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করলিনে!'

একজন সেপাই বলল, 'হুজুর, ঠাণ্ডা জল আর এই রাত্রিবেলা, ও বুড়ি তো মরতই। আজ না মরলেও কাল মরত। কোথাকার এক কাফেরের জন্যে খামোখা নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া!'

করম আলি রাগে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

সেপাইরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো।

করম আলি মেয়ে দুটির দিকে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে কামান দাগার আওয়াজ শোনা গেলো, আর তার প্রথম গোলাটা এসে ফেটে পড়ল চড়ায়…

* * *

ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সব কথা মনে পড়ছিল গঙ্গার। চড়ার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, করম আলির গ্রেপ্তার হওয়া, কাহনসিংয়ের সেপাই কর্তৃক তাদের বন্ধনমোচন, তারপর তাদের মেজরের সামনে নিয়ে যাওয়া—সব কথা মনে পড়ছিল তার। গত বাইশ দিন ধরে মেজর তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে আসছে যেমন

একজন প্রেমাস্পদ তার প্রেমিকার সঙ্গে করে থাকে। মেজরের মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল, আবেগ-বিহ্বলতাও ছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে নিজেকে সংযত রেখেছে, এমন একটি কথাও উচ্চারণ করেনি, যা গঙ্গার কাছে খারাপ মনে হতে পারে। অথচ উল্টে গঙ্গারই কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা যে, সে এসে তাকে ও তার দিদিকে বেইজ্জতির পঙ্কিল অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে, নইলে সম্ভবত ওরাও ভেলিগুডের মতো এক হাত থেকে আর এক হাতে বিক্রী হয়ে বেড়াত। তার ছোট্ট গণ্ডীবদ্ধ সংসারে এমন ঘটনা কবে ঘটেছে যে, তারা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে, আর তাদের সামনেই দু' জন লোক অমন নির্লজ্জভাবে ঝগড়া করছে, এমনভাবে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে যেন ওরা মেয়ে নয়, মাটির বস্তা। সেই ঘটনাটিই তার মনের কোণে সুপ্ত বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে আরও তীব্র করে তুলেছে— আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার! আসলে পুরুষেরা এ কথাই ভাবে যে, আমরা মেয়েরা মানুষই নই, সারা সংসারটা শুধু তাদের—কথাটা ভাবতে গিয়ে গঙ্গা এমন বিহ্বল হয়ে পড়ল যে, রাগে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। একবার এই রকম রেগে গিয়ে সে কাহনসিংকে তার সেপাইদের সামনেই অপমান করেছিল। তবু কাহনসিং মাথা হেঁট করে সব কথা শুনেছিল—আজ সেই ঘটনার জন্যে মনে মনে অনুতাপ হচ্ছে আবার আনন্দও হচ্ছে। অনুতাপ হচ্ছে এই জন্যে যে, এখন সে মেজর কাহনসিংয়ের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ বোধ করছে। আনন্দ হচ্ছে এই জন্যে যে, সে নারী আর কাহনসিং পুরুষ—এই কষ্টকর চিন্তাভাবনায় তার মন এখনও সমাচ্ছন্ন।

হঠাৎ কাহনসিং তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বলল, 'যেতে যেতে কি সব ভাবছ?'

গঙ্গা যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল। তার দিকে চেয়ে বলল, 'উঁ—কি?'

'আমরা এখন কনৌতিয়ার চূড়োয় এসে পৌঁছেছি। সামনে তাকাও।'

গঙ্গা পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচে তাকাল, বিস্তৃত উপত্যকায় গোলাপের মতো শহরটা ঝলমল করছে। বাগান দিয়ে ঘেরা একটি ছোট্ট শহর, গঙ্গার কাছে তা অনেক বড় বলেই মনে হলো। নদীর জল রূপোর মতো ঝকমক করছে, টিনের চাল রোদ্দুরে তরল আগুনের মতো দেখাচ্ছে, বাড়ির পর বাড়ি বহু দূর পর্যন্ত ছড়ানো—আর একটু দূরে সব কিছু ছাড়িয়ে একপাশে একটি উঁচু দুর্গ, মাথায় ডোগরা পতাকা পৎপত করে উড়ছে।

'এটাই পুঞ্চ শহর?'

'হ্যাঁ।'

ওদের পায়ের তলায় শহর। গলিতে গলিতে খেলনার মতো লোকজনকে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় পতাকা টাঙানো হয়েছে। লাল-নীল-হলুদ, রঙ-বেরঙের পতাকা। কলার গাছ পুঁতে লোকে বাজারে লালসালু

টাঙাচ্ছে। শহরের পুবদিকে জেলখানার সামনে মিলিটারি প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটি পল্টন প্যারেড করছে। সেখানে খুব বড় একটা গেট তৈরী হচ্ছে।

গঙ্গা আশ্চর্য হয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ও সব কি হচ্ছে?'

মেজর কাহনসিং গঙ্গার হাত ধরে বলল, 'ও সব আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে প্রস্তুতি চলছে।'

গঙ্গা তার হাত ছাড়িয়ে নিল না, তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল।

কাহনসিং জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে, গঙ্গা?'

গঙ্গা খুব অবাক হয়ে শহরটা দেখছিল। এই প্রথম শহর দেখছে সে। তার চিন্তা-ভাবনা জুড়ে এক হুলুস্থূলু কাণ্ড বেধেছে। অনেক ব্যাপারই তার কাছে মারাত্মকভাবে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বহু কিছুই তাকে নানা দিকে টেনে ধরছে, যেন তার মনের মধ্যে অনেকগুলি সুতো আটকানো রয়েছে, কোনোটা এ দিকে, কোনোটা ও দিকে টানছে। তারপর অকস্মাৎ যেন তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। অমনি অনেক পুরনো সুতো ছিঁড়ে গেলো, কয়েক শো বছর আগে দৌড়ে এল যেন সে, বুঝতে পারল—এটা শহর আর সেটা গ্রাম। বুঝতে পারল, সড়ক আর পায়ে হাঁটা পথের মধ্যে তফাৎ কি। অরণ্য ও উদ্যান কেন একটি অন্যটি থেকে আলাদা! গোবরে মাখামাখি দেওয়াল ও লাল ইঁট দিয়ে তৈরী দেওয়ালের ঝক্‌ঝকে সাদা চুনকামের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান কেন? বাড়ির গায়ে বাড়ি উঠে কেমন গলি তৈরী হয়েছে! প্রত্যেকটি গলি হৃদয়ের গ্রন্থিবন্ধনে এক-একটি মালা হয়ে উঠেছে—মানুষ কেমন পৃথক পৃথকভাবে বসবাস করেও পরস্পরের কাছে যাওয়া-আসা করে—এ সব মূলতত্ত্ব একেবারে স্পষ্ট নয়, একটা ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা ছবির মতো তার মস্তিষ্কে জেগে ওঠে। তাবপর সে শুনতে পায়, যেন কেউ দূরে কুয়াশার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে, তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে, গঙ্গা?'

আর তখন গঙ্গা শহরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, তারপর কাহনসিংয়ের দিকে ফিরে তাকাল। ঘোড়ার পিঠে বসে শিশুর মতো ধমক দিলো সে, তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের দিকে চলে গেলো।

কাহনসিং খুশী হয়ে পল্টনের দিকে হাতের ইশারা করল, তারপর নিজেও ঘোড়া ছুটিয়ে গঙ্গার পেছনে তেড়ে গেলো। গঙ্গা তখনও মোড় পর্যন্ত পৌঁছায়নি, কাহনসিং গিয়ে তাকে ধরে ফেলল, আচমকা তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে নিয়ে নিজের ঘোড়ার জিনের ওপর বসিয়ে নিল।